প্রাচীন শিল্প-পরিচয়

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

ভূমিকা
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড। কলিকাতা-৯

PRACHIN SILPA-PARICHAYA
by Girish Chandra Vedantatirtha

আষাঢ় ১৩৭৯
(প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

মূল্য ১৫·০০

প্রকাশক
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা । ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীনিমাই দে
দি মডারেট প্রেস । ২১ রাজা লেন । কলিকাতা ৯

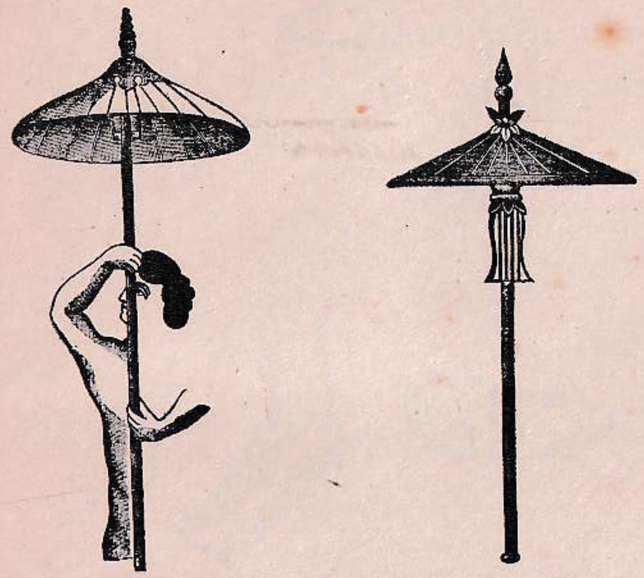
ওঁ

আরাধ্যপাদ
স্বর্গীয় পিতৃদেব রামদাস তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের
শ্রীশ্রীচরণকমল-প্রীতিকামনায়
এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল

পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র

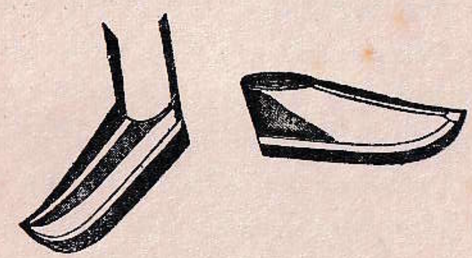
বিষয়		পৃষ্ঠা



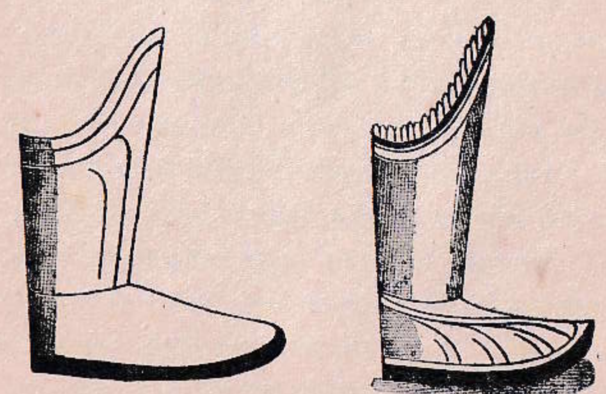
ছত্র



পাদুকা



উপানহ্



আজানুপত্রচরণ

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাচীন-শিল্পপরিচয়ের অধিক সংখ্যক প্রবন্ধই ১৩১৯ সালের প্রথম হইতে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কতক প্রবন্ধ অর্চ্চনা পত্রিকায় এবং 'নৌকা' প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়-গণ তাঁহাদের পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিয়া যে সহায়তা করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত পুস্তকরাশি হইতে এবং প্রস্তরমূর্তি হইতে প্রাচীন শিল্প-পরিচয়ের অধিকাংশ উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে; অতএব সমিতির নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমার মত দরিদ্র লেখকের পক্ষে নিজব্যয়ে পুস্তক মুদ্রণ সর্বতোভাবে অসম্ভব। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (মস্থয়া, ময়মনসিংহ), অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (গৌরীপুর), শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় (দিঘাপতিয়া), শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মৈত্র (রাজসাহী), শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট) এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম-এ, বি-এল (সেরপুর, ময়মনসিংহ) সাহিত্যানুরাগবশতঃ অর্থসাহায্য করাতেই এই পুস্তকের মুদ্রণব্যাপার সম্পন্ন হইল। তাঁহাদের নিকট সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হইয়া স্বদেশের গৌরব বর্ধন করুন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহোদয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সমস্তই পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং ভূমিকা লিখিয়া দিয়া নিরতিশয় সাহায্য করিয়া-ছেন। এই পুস্তক লিখিবার জন্য তিনিই আমাকে প্রথম উৎসাহান্বিত করিয়া-ছিলেন, তন্নিবন্ধন আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিরতিশয় সাহিত্যানুরাগিতা এই পুস্তক মুদ্রণের অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তক মুদ্রণের জন্য তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহদান করিয়াছেন। ভগবৎ-সমীপে সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয়ের প্রমাণ স্বরূপ বচন প্রভৃতি মুদ্রিত অমুদ্রিত যে সকল পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি অনেক

স্থলেই নিরতিশয় অশুদ্ধি-পরিপূর্ণ। সুতরাং অনেক স্থলেই অসঙ্গত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ সঙ্গত পাঠ যোজনা করিতে হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ হওয়া একান্তই সম্ভব। অতএব সবিনয় প্রার্থনা এই যে— সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ অনুকম্পাপরবশ হইয়া আমার ভ্রম দেখাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

ভূমিকা

শিল্প কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে মতভেদের অভাব নাই। তজ্জন্য অতি অল্পদিন পূর্বেও, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রাচ্য-শিল্পের কোনও নিদর্শনই প্রকৃত শিল্প-নিদর্শন বলিয়া মর্যাদালাভ করিত না; তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য ভূমণ্ডলকেই শিল্পের একমাত্র লীলাভূমি বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

সে সঙ্কীর্ণ ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে;— এখন প্রাচ্য-শিল্পও একশ্রেণীর শিল্প বলিয়াই সমাদরলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানব-শিল্পের মূলপ্রকৃতি যতই আলোচিত হইতেছে, পাশ্চাত্ত্য পূর্বসংস্কার ততই পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। এমন কি সৌন্দর্য-বিকাশ-লালসায় শিল্পের মধ্যে মানব-প্রকৃতির যেরূপ একপ্রাণতা দেদীপ্যমান, তাহা ধরিয়া, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রাগানুগা মিলনভূমির তথ্যানুসন্ধানেরও সূত্রপাত হইতেছে।

শিল্প যাহাই হউক, তাহা মানব-চিত্তবৃত্তির ভাব-সম্পদের বাহ্যবিকাশ;— মানব-প্রতিভা-প্রসূত এক অলৌকিক সৃষ্টিকৌশল।

ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে শিল্প-শব্দের ব্যুৎপত্তি যেভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ইহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

শিল্পং কৌশলং শীল্সমাধৌ।

"শীল্সমাধৌ" (উণাদি সূত্রানুসারে ত প্রত্যয়ে)— নিপাতনে শিল্প-শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে সমাধির, চিত্তবৃত্তির একাগ্রতার উল্লেখ করিয়া, শিল্পকে একাগ্রতা-সমুদ্‌ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এই ব্যুৎপত্তি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে— সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন, সে কৌশল মানব-চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা-সমুদ্‌ভাবিত। তাহা অনুকৃতি নহে— সৃষ্টি।

সকল শিল্পের উৎপত্তি-রহস্য এক; কিন্তু সকল শিল্প একরূপ নহে— লক্ষ্যের তারতম্যে দুই ভাগে বিভক্ত। যাহার মুখ্য লক্ষ্য যেন তেন প্রকারেণ অভীষ্ট-সাধন, তাহা এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, তাহা আর এক শ্রেণীর শিল্প। যাহার মুখ্য লক্ষ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি, তাহা অধিক প্রতিভা-ব্যঞ্জক বলিয়া, অধিক সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহা যে পরিমাণে চির-সুন্দরের অসীম সৌন্দর্যের আভাস প্রদান করে, সেই পরিমাণে অনির্বচনীয়;— সেই পরিমাণে সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকট সমাদর-লাভের

অধিকারী। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্প "সুকুমার শিল্প" নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে ইহাই কেবল শিল্প-পদবাচ্য ; এতদতিরিক্ত শিল্প শিল্প নহে, পণ্যদ্রব্য। যতই বিস্ময়োৎপাদক হউক না কেন, তাহা কেবল কল্পনা-কৌতুক ;— যতই মূল্যবান্ হউক না কেন, তাহা কেবল মানব-প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর রচনা-বিলাস।

শিল্প-স্রষ্টার সাধারণ নাম— শিল্পী। কিন্তু শিল্প যেমন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, শিল্পীও সেইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতে দুই শ্রেণীর শিল্পী দুই প্রকার সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। একশ্রেণী "কারু" বা "কারুক" নামে— আর একশ্রেণী "শিল্পী" নামে অভিহিত হইত। "কারুকে"র তুলনায় "শিল্পী" অধিক মর্যাদা লাভ করিত। একালের "কারিকর" শব্দ সেকালের "কারুক" শব্দের অপভ্রংশ। "কারুক" বা "কারিকর" শ্রমজীবী মাত্র— উদ্‌ভাবক নহে। সে কেবল অপরের উদ্‌ভাবিত কৌশল-শিক্ষায় এবং দ্রব্য-নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। "কারুকে"র এবং "শিল্পী"র মধ্যে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, স্মৃতিশাস্ত্রে উভয়ের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

যন্ত্রাকরে কারুক-শিল্পিহস্তে।

বিষ্ণুসংহিতার এই বচনাংশে "কারুক" এবং "শিল্পী" সেই পার্থক্য সূচিত করিতেছে। আপদ্ধর্মকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে জীবনোপায় নির্দেশ করিবার সময়ে, মনুসংহিতায় (১০।১১৬) "শিল্প" একটি উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

বিদ্যা শিল্পং ভৃতি সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবন-হেতবঃ।

এই বচনোক্ত "শিল্প" কারুকার্য নহে, ইহা ইঙ্গিত মাত্রে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, ইহার ব্যাখ্যায়, কুল্লূকভট্ট লিখন প্রভৃতি কর্মকেই "শিল্প" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে "প্রভৃতি"-শব্দ তুল্যশ্রেণীর কর্ম সূচিত করিয়া বলিতেছে— আপদ্ধর্মকালে যাহা দ্বিজাতির অবলম্বনীয়, তাহা কারুশিল্প নহে, কলা-শিল্প। অমরকোষের টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইয়া গিয়াছেন— যাহারা "কারু"-নামে পরিচিত, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি জাতির লোক "শিল্পী" বলিয়াও কথিত হইত। যথা—

তক্ষা চ তন্তুবায়শ্চ নাপিতো রজকস্তথা।
পঞ্চমশ্চর্মকারশ্চ কারবঃ শিল্পিনো মতাঃ॥

এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়— সকল "কারু" সেকালে "শিল্পী" নামে পরিচিত ছিল না। উল্লিখিত পাঁচটি জাতির লোক কেবল শ্রমজীবী ছিল না ; স্ব স্ব শিল্পকর্মে উদ্‌ভাবন-প্রতিভারও পরিচয় দান করিত। তজ্জন্য ইহারা গৌরবাস্পদ "শিল্পী" নামও প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাতিভেদ যে প্রতিভার অনাদরের কারণ হইত না, ইহাতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোষশাস্ত্রে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে "শিল্পং কলাদিকং কর্ম" বলিয়া সাধারণ ভাবে শিল্প শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং অমরসিংহ কারু এবং শিল্পীকে একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র কারুশব্দে শিল্প ও শিল্পীকে তুল্যভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্থলে শিল্প শব্দ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল শিল্পদ্রব্যই সাধারণভাবে শিল্প নামে কথিত হইতে পারে। কিন্তু মর্যাদার তারতম্যে একশ্রেণী কারু-শিল্প, আর এক-শ্রেণী কলা-শিল্প। স্মৃতিশাস্ত্রে সেই পার্থক্য সূচিত হইয়াছে।

শুক্রনীতিসারে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রাসাদ-প্রতিমাদির নির্মাণ-পদ্ধতির শাস্ত্রকে "শিল্পশাস্ত্র" এবং কাচাদির পাত্র-নির্মাণ-পদ্ধতির শাস্ত্রকে "কলাশাস্ত্র" বলা হইয়াছে। ইহাতে কৌশল-বিকাশ কলা নামে, এবং সৌন্দর্য-বিকাশ শিল্প নামে অভিহিত হইয়াছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ পার্থক্য-সূচনার্থ উক্ত হইয়াছে— "এমন কলা নাই, এমন শিল্পও নাই, যাহা নাট্যে প্রকাশিত হয় না।" যথা—

ন সা কলা নতচ্ছিল্পং যন্নাট্যে ন প্রকাশিতম্

প্রধান প্রধান বিদ্যার সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি বলিয়া শুক্রনীতিসারে উল্লিখিত আছে। তাহাতে বিদ্যার এবং কলার পার্থক্য-সূচনার্থ লিখিত হইয়াছে যে— যাহা কেবল বাগ্‌-ব্যাপারসাধ্য, তাহাই "বিদ্যা" ; যাহা মূকব্যক্তিও সম্পাদন করিতে পারে, তাহাই "কলা"। যথা—

যৎ যৎ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্ কর্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞিতং।
শক্তো মূকোঽপি যৎ কর্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎ স্মৃতম্॥

এই লক্ষণানুসারে সঙ্গীত একটি "বিদ্যা" ; বাদ্য "বিদ্যা" নহে ; "কলা"। সুতরাং "কলা" কেবল কৌশল ; "শিল্প" তাহা হইতে পৃথক্ ; তাহা কৌশল নহে "বিদ্যা"। এরূপ শ্রেণী-বিভাগ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

বামন-কৃত "কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি"তে গীত কলা নামে উল্লিখিত থাকায়, শুক্রনীতির সহিত পার্থক্যই সূচিত হয়। গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর বামনের গ্রন্থের

"কাব্যালঙ্কার-কামধেনু" নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে নৃত্যগীতাদি কলা নামে উল্লিখিত এবং কলার সংখ্যা চতুঃষষ্টি, উপকলার সংখ্যা চারিশত বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ভামহের গ্রন্থ হইতে চতুঃষষ্টি কলার যে নামাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রোক্ত অথবা শ্রীধর-স্বামীর ভাগবতের টীকায় (১০।৪৫।৩৫) উদ্ধৃত নামাবলীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীধরস্বামী যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাকে "শৈবতন্ত্রোক্ত" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যাহাকে অবজ্ঞা বশতঃ কৌশলোৎপন্ন "পণ্য" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাকে "কারু-শিল্প", এবং "সুকুমার" শিল্প নামে যাহার সমাদর করিয়া থাকেন, তাহাকে "চারু-শিল্প" নামে নামকরণ করিয়া লইলে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প-বিভাগ কল্পনা বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধা হইতে পারে।

কারু-শিল্পই হউক, আর চারু-শিল্পই হউক, সভ্যতার ইতিহাসের নিকট উভয়েই তুল্য সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। যে জাতির সৌন্দর্যবোধ যে পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে জীবনযাপনের উপকরণগুলিকেও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে— কেবল যেন তেন প্রকারেণ কার্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এই কারণে, পুরাতন মৃদ্‌ভাণ্ডটি পর্যন্ত—পুরাতন মানব সভ্যতার দ্যোতক বলিয়া ইতিহাস লেখকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া তাহার ভগ্নাংশ পর্যন্ত প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল মানবের নিকটেই, শিল্পের লক্ষ্য এক— তাহা সৌন্দর্য-বিকাশ-চেষ্টা। কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির তারতম্যে, সৌন্দর্য-বিকাশক শিল্প-প্রতিভার তারতম্যে, রচনা-সহায়ক উপাদান বস্তুর তারতম্যে, শিল্প-সুষমার তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিভার তারতম্যে যুগভেদে এবং স্থানভেদে একই দেশে বিবিধ রচনা-রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যুগভেদে, দেশভেদে, অথবা উদ্‌ভাবকভেদে শিল্প নানা নামে পরিচিত হয়। মূল লক্ষ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও, সৌন্দর্যানুভূতির তারতম্যে পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রাচ্য যেখানে সৌন্দর্যকে আকার দানের চেষ্টা করিয়াছে, প্রতীচ্য সেখানে আকারকেই সৌন্দর্য-মণ্ডিত করিয়া

তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। ইহা হইতে দুইটি পৃথক্ শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—একটি ভাব-সর্বস্ব, অপরটি আকার-সর্বস্ব। একটিতে নর নর নহে, দেবতা ; অপরটিতে দেবতা দেবতা নহে—নর।

চারু-শিল্পের ন্যায় কারু-শিল্পেও এইরূপ মজ্জাগত পার্থক্য দেদীপ্যমান। তাহাও যুগভেদে, দেশভেদে, এবং দেশ-কাল-পাত্রের রুচিভেদে, বিবিধ রচনা-রীতির পরিচয় প্রদান করে। চারু-শিল্পই হউক, কিংবা কারু-শিল্পই হউক, সকল শিল্পই তাহার উদ্‌ভব-স্থানের বাহিরেও প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে। কোন্ দেশের কোন্ শিল্প কিরূপ ভাবে কতদূর পর্যন্ত ভারত-শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহার চিন্তাই এ পর্যন্ত তথ্যানুসন্ধানকে অবসর-শূন্য করিয়া রাখিয়াছিল। ভারত-শিল্প কোন্ কোন্ দেশের শিল্পের উপর কিরূপ-ভাবে কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তারে কৃতকার্য হইয়াছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা অতি অল্পদিন হইতে আরব্ধ হইয়াছে ; এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক বিস্ময়কর বিবরণ প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষই যে সমগ্র প্রাচ্য-শিল্পের "ভাবের মাতৃভূমি", ওকাকুরা তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবার পর, সভ্যসমাজে ভারত-শিল্প এক নূতন মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় লাভ করিতে হইলে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয় আবশ্যক। তজ্জন্য তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য। কিন্তু তাহা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। স্থায়িত্বের তারতম্যে প্রাচীন শিল্প দুই ভাগে বিভক্ত—বিনশ্বর এবং অবিনশ্বর। উপকরণের পার্থক্যে এই পার্থক্য অনিবার্য। অল্পক্ষণের সাময়িক সৌন্দর্য-সম্ভোগ-লালসা যে সকল সাজসজ্জায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। জনসমাজের রুচি-পরিবর্তনে তাহার রচনা-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার নিদর্শন-দর্শনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল কারু-শিল্প বা চারু-শিল্প অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়িত্বলাভের প্রয়াস প্রকাশে দৃঢ়তর উপাদানে রচিত হয়, তাহাও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না ; এবং রুচি-পরিবর্তনে তাহার নির্মাণ-প্রয়োজন তিরোহিত হইয়া গেলে, তাহার নিদর্শনও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। যাহা সুদৃঢ় উপাদানে গঠিত বলিয়া অবিনশ্বর শিল্প-নিদর্শনরূপে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্থায়িত্বলাভের জন্য স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাও আততায়ীর আক্রমণে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া যায় ; —তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট অসম্যক্ নিদর্শন পূর্বসৌন্দর্যের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। এই সকল কারণে, প্রাচীন শিল্প-পরিচয় প্রাচীন-সাহিত্যের শরণাপন্ন

হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাহার নিদর্শন লুপ্ত অথবা অসম্পূর্ণ, সাহিত্যের মধ্যেই তাহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে হয়। প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যেও অসম্যক্ নিদর্শন; তাহাও অক্ষত কলেবরে কালসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় নাই। যাহা নাই, তাহার তুলনায়, যাহা আছে, তাহা যৎসামান্য; কেবল তাহাই নহে—লিপিকরপ্রমাদে, প্রক্ষিপ্তদোষে, সংক্ষিপ্তানুরাগে বিপর্যস্ত। যাহা এইরূপে কোনও ক্রমে ছিন্নভিন্ন কলেবরে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশ এখনও অমুদ্রিত। তাহা হস্তলিখিত পুথির আকারে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। অসীম অধ্যবসায়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, অপরিসীম অর্থব্যয়ে, তাহা একত্র সংগৃহীত হইতে পারিলেও, সকল সময়ে পাঠোদ্ধার-চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না; অর্থবোধেও বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। তথাপি এই পথই প্রধান পথ, তজ্জন্য এই পথেই সভ্যসমাজ তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। যে সকল শিল্প-নিদর্শন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারও অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে খননকার্যের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে, অতি অল্পসংখ্যক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্য-নিহিত বিবরণ এবং এই সকল নিদর্শন প্রাচীন শিল্পের পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবার অসম্পূর্ণ উপায়। তথাপি তাহার সাহায্যে যাহা কিছু শিল্পতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই একমাত্র সম্বল।

এই সম্বল, লিখিত ইতিহাসের তুলনায়, নিতান্ত দুর্বল বলিয়া কথিত হইলেও, উপেক্ষিত হইবার অযোগ্য। একটি বিষয়ে লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অলিখিত শিল্প-নিদর্শন অধিক অভ্রান্ত পরিচয়ের আধার। লিখিত ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের, অথবা রাজনীতি-বিশেষের, পক্ষপাত-দুষ্ট একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত-স্থাপন-চেষ্টা প্রকৃত সত্যকে বিকৃতি দান করিতে পারে। শিল্প-নিদর্শন সেরূপ নহে। তাহাও একশ্রেণীর ভাষা; কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব অপেক্ষা সমসাময়িক জনসমাজের প্রভাবই অধিক সুব্যক্ত;—তাহাদের যাহা আশা আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান ধারণা, মত ও বিশ্বাস, তাহাই অকপটে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। প্রাচীন শিল্প-পরিচয়ের প্রয়োজন যতই অনুভূত হইতেছে, তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা সভ্যসমাজে ততই আন্তরিকতা লাভ করিতেছে। ইহার আলোচনায় যে দেশ যত অধিক অগ্রসর হইতেছে, সেই দেশ ততই মানবতত্ত্ব অধ্যয়নের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা জ্ঞানের পরিধি

বিস্তৃত করিয়া দিয়া, মানসিক সজীবতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। শিল্পতত্ত্বের আলোচনা এইরূপে উচ্চশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া, সভ্যসমাজের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে অল্পদিনের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে; ইতিহাসকেও আখ্যায়িকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে।

শিল্পতত্ত্ব নৃতত্ত্বের অঙ্গ-বিদ্যা। তাহাতে কল্পনার অধিকার নাই। সমুচিত বিচার-পদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করিতে না পারিলে, সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বিচার-পদ্ধতি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে, শিল্প-পরিচয় সেই প্রমাণ। সুতরাং শিল্প-পরিচয় সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন উত্তরোত্তর অধিক অনুভূত হইতেছে।

অনেকে শিল্পকেই শিল্প-পরিচয়ের একমাত্র নিদান মনে করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা অধ্যয়ন-নিপুণতা অপেক্ষা দর্শন-নিপুণতার অধিক পক্ষপাতী। কিন্তু দর্শন-নিপুণতার অভাব না থাকিলেও, অধ্যয়ন নিপুণতার অভাবে, অনেক শিল্পের মর্ম্মকথা সম্যক্ উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। শিল্প সকলকেই আনন্দ দান করে, কিন্তু সকলকে একশ্রেণীর আনন্দ দান করিতে পারে না। অধিকারিভেদে, চিত্রের এক এক শ্রেণীর সৌন্দর্য এক এক শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে (৩।৪১।১১) লিখিত হইয়াছে—রেখা-বিন্যাস আচার্যগণের নিকট, বর্তনা-বিন্যাস অভিজ্ঞগণের নিকট, অলঙ্কার-বিন্যাস রমণীগণের নিকট, এবং বর্ণ-বিন্যাস জনসাধারণের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। যথা—

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যা বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥

মানব-ভাষা যখন পর্যাপ্ত বিকাশ লাভ করে, তখন তাহার শব্দানুশাসনের জন্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহা অসংযত স্বেচ্ছাচার সুসংযত করিয়া, রচনা-প্রতিভার উন্নতি সাধন করে। শিল্পের অবস্থাও সেইরূপ। তাহার ব্যাকরণের নাম "শিল্প-শাস্ত্র"।

এই সরল সত্যের মর্মানুসন্ধান না করিয়া, অনেক শিল্প-সমালোচক "শিল্পশাস্ত্রে"র প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন;—তাহাকে শিল্পের অধোগতির নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। অনেকের নিকট তাহা অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্খল বলিয়া নিন্দিত; নিতান্ত আধুনিক রচনাশ্রম বলিয়া

উপেক্ষিত। ইতিহাস লেখকের নিকট তাহা অবিচারে উপেক্ষিত হইতে পারে না।

ভারত-শিল্প-শাস্ত্র কত পুরাতন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। অতি পুরাতন বলিয়াই তাহার জন্ম-কথা জনশ্রুতিমাত্রে পর্যবসিত। সে জনশ্রুতি যেমন অলৌকিক, সেইরূপ অসমীচীন; তাহাতে অসংশয়ে আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথমে সূত্রের, তৎপরে বৃত্তির এবং তৎপরে ভাষ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিল্প সম্বন্ধেও এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। পুরা প্রচলিত সূত্র-বৃত্তি-ভাষ্য উত্তর কালে শিল্প-শাস্ত্র নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, শিল্প-শাস্ত্রের রচনা-যুগ শিল্প-সাহিত্যের আদি যুগ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা আরম্ভ নহে—পরিণতি।

ভারত-শিল্প-শাস্ত্রের যে সকল শাস্ত্র বর্তমান আছে, তাহা যে আদি-গ্রন্থ নহে, তাহাতেই তাহা উল্লিখিত আছে। সে শিল্প-শাস্ত্র স্বতন্ত্র শিল্প-শাস্ত্র নহে; তাহা বাস্তুবিদ্যার অন্তর্গত। ইহাতে অতি প্রাচীনত্বেরই ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব-সভ্যতার প্রথম সোপান—বাস্তু-রচনা। গৃহ নির্মাণের কৌশল অধিগত করিয়াই, মানব-সমাজ নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতিলাভের অধিকারী হইয়াছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী করিয়াই মানব-সমাজ নিরস্ত হইতে পারে নাই। তাহাকে সাজসজ্জায় সুশোভিত করিবার আকাঙ্ক্ষা বিবিধ শিল্প উদ্‌ভাবিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বাস্তুবিদ্যাকেই শিল্প-শাস্ত্রের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তথাপি ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে শিল্প-শাস্ত্র বাস্তুবিদ্যার অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; বরং বাস্তুবিদ্যা একশ্রেণীর শিল্প-বিদ্যা বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের ধারণা অধিক বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয়।

ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজক মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদি ঋষিগণের নাম এখনও হিন্দুসমাজে পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র-প্রযোজকগণের নাম হিন্দুর নিকটেও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বিংশ ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজক ঋষিগণের ন্যায়, অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপদেশক ঋষিগণের নামও একসময়ে তুল্য ভাবেই সুপরিচিত ছিল। যথা—

ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্মা ময়স্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এবচ।

বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রবৃহস্পতী ॥
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তু-শাস্ত্রোপদেশকাঃ ॥

মৎস্যপুরাণোক্ত এই অষ্টাদশ বাস্তু-শাস্ত্রোপদেশকের মধ্যে অনেকের গ্রন্থই কাল-ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে "বৃহৎসংহিতা" সঙ্কলিত করিবার সময়ে, বরাহমিহির গর্গ-বিরচিত শাস্ত্রের সারাংশ সংক্ষিপ্ত রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।* তিনি প্রসঙ্গক্রমে নগ্নজিতাদির পৃথক মতও স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্বেও ইংরাজীভাষায় ভারত-স্থাপত্যের গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া রামরাজ দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কোন কোন বাস্তু-শাস্ত্র-প্রযোজকের বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের কিয়দংশের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।†

বাস্তু-শাস্ত্রোপদেশকগণের সকল গ্রন্থ বর্তমান না থাকিলেও, গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলি পুরাকালে অন্যান্য গ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছিল। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে, মৎস্যাদি পুরাণে, হিন্দু বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থে, প্রতিষ্ঠা-নিবন্ধে, শুক্রনীতিসারে, যুক্তিকল্পতরুতে, এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন শিল্প-পরিচয় সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

শ্রব্যকাব্যে, দৃশ্যকাব্যে, আখ্যায়িকায়, এমন কি সকল শ্রেণীর গ্রন্থেই বিবিধ প্রাচীন শিল্পের অল্পাধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের সকল গ্রন্থই অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তৎপক্ষে কোষগ্রন্থ বা প্রচলিত টীকা সকল স্থলে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। এই সকল কারণে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন শিল্প-পরিচয়-সন্ধান-চেষ্টা এখনও উৎসাহ লাভ করিতে পারে নাই। তাহার অভাবে ভারত-শিল্প-সমাচার যে প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা সকল বিষয়ে সংশয়চ্ছেদ করিতে অসমর্থ। যাহা কিছু ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল তাহার সাহায্যেই প্রাচীন শিল্প-পরিচয় সঙ্কলন করিবার চেষ্টা সর্বাংশে সফল হইতে পারে না। প্রাচীন ভাষা বুঝিতে হইলে ব্যাকরণ, এবং প্রাচীন শিল্প-পরিচয় লাভ করিতে হইলে শিল্প-শাস্ত্র তুল্যভাবেই অপরিহার্য।

মানব-শিল্প বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কারণ,

---

* প্রাসাদলক্ষণমিদং কথিতং সমাসাৎ গর্গেণ যদ্বিরচিতং তদিহাস্তি সর্বম্। —বৃ ৫৫।৩১
স্বৈরঙ্গুলপ্রমাণৈর্দ্বাদশ বিস্তীর্ণমায়তং চ মুখং।
নগ্নজিতাতু চতুর্দশ দৈর্ঘ্যেণ দ্রাবিড়ং কথিতম্। —বৃ ৫৭।৪

† Architecture of the Hindus—by Ramraj

সকল দেশের শিল্পের মধ্যেই তদ্দেশ-প্রচলিত বিষয়বিশেষের নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-শিল্প যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করে। তজ্জন্য ভারতবর্ষকেই ভারত-শিল্পের উদ্‌ভব-ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এক সময়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ ইহার প্রতি প্রণিধান না করিয়া, ভারত-শিল্পকে পরানুকরণ-জাত বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্যই প্রয়াস স্বীকার করিতেন। কালক্রমে তাহার গতি ক্রমশঃ মন্থরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন একটি আদি ও অকৃত্রিম ভারত-শিল্পের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশের অভ্যাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন কেবল ভারত-শিল্পে বিদেশীয় প্রভাবের ছায়াপাত লক্ষিত হইতেছে, এবং তাহা যে ভারতীয় ভাবে রূপান্তরিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় আকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। গ্রীক্‌গণ ফিনিসীয়-দিগের নিকট বর্ণমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই বর্ণমালার সাহায্যে তাঁহারা ফিনিসীয় সাহিত্য-রচনা না করিয়া গ্রীক্‌সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষও যদি কোনও বিদেশের নিকট হইতে কোনরূপ শিল্প-কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সাহায্যে ভারত-শিল্পই রচিত হইয়াছে, বিদেশীয় শিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে পারে নাই। সুতরাং ভারত-সাহিত্যের ন্যায় ভারত-শিল্পও ভারতবর্ষের নিজস্ব।

কিরূপ উপাদানে ভারত-শিল্প প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই। তাহা এত পুরাকালের কথা যে, তাহার জনশ্রুতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি পুরাতন সাহিত্যে শিল্পের উল্লেখ দেখিয়া, এবং অতি পুরাতন শিল্প-নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া, স্বতই মনে হয় যেন প্রথমে কেবল ক্ষণভঙ্গুর উপাদানে আত্মপ্রকাশ করিয়া, ভারত-শিল্প ক্রমে ক্রমে স্থায়িত্ব লাভের কামনায় দৃঢ়তর উপাদানের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ভারত-স্থাপত্য এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করে। যাহা ইষ্টক প্রস্তরে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সহসা দারু-গৃহ-রচনা-কৌশল পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অনেক পাষাণ-প্রাচীরে এবং পাষাণ-তোরণে দারুকর্মের সুপরিচিত প্রণালী অভিব্যক্ত হইয়া, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। মূর্তি-শিল্পের ঈষদ্‌ভিন্ন নিদর্শনের মধ্যেও তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবাসীর জীবনযাপন-প্রণালীর সহিত ভারত-শিল্পের যে নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভারতবর্ষকেই ভারত-শিল্পের উদ্‌ভব-ক্ষেত্র

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অনেক শিল্প বিশেষভাবে বিশেষ প্রয়োজনে কেবল ভারতবর্ষেই উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল।

অন্য কোনও দেশে তদনুরূপ শিল্পের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পাধিক শিল্প-চর্চা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রতিদিবসের আহার-বিহারের সহিত, অতিথি-অভ্যাগতের সংবর্ধনা-রীতির সহিত, উৎসব ও আনন্দ-মিলনের সহিত, এবং নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মাচরণের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তাহা গৃহ-প্রাঙ্গণের আলিম্পন-প্রণালীতে বা কামিনীকুন্তলের রচনারীতিতে তুল্যভাবেই অভিব্যক্ত হইত। এইরূপে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত সমাজের নরনারীর পক্ষে চতুঃষষ্টিকলা-জ্ঞান সুশিক্ষার নিদর্শন বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাহা সমাজে মর্যাদাদান করিত; সৌভাগ্যের দিনে সৌভাগ্য বর্ধন করিত—দুঃখদুর্দিনে জীবনোপায় হইত। জীবনযাত্রার পুরাতন প্রণালীর পরিবর্তনে, ধর্মাচরণের অনুষ্ঠান-বিলোপে, কলা-জ্ঞানহীন বিদ্যাদানের আধুনিক পদ্ধতিতে, ভারতবর্ষের চিরপরিচিত চতুঃষষ্টিকলা, উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে, লোকসমাজে অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য কাব্যে নাটকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াও, অনেকে তাহাকে কবি-কল্পনা মনে করিয়া, তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। চতুঃষষ্টিকলার নামগুলি এক এক গ্রন্থে এক এক ভাবে উল্লিখিত থাকায়, প্রথম দৃষ্টিপাতে পার্থক্যের কারণ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। বাৎস্যায়নোক্ত কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চতুঃষষ্টিকলার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রান্তরে তাহা যে ভাবে উল্লিখিত আছে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া, রহস্যভেদ করিয়া গিয়াছেন। চতুঃষষ্টি-কলা অঙ্গবিদ্যা; সুতরাং যে শাস্ত্রের যাহা অঙ্গ, সেই শাস্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

বাৎস্যায়নোক্ত চতুঃষষ্টিকলার সাধারণ নাম "ঔপেয়িকী" তৎসমস্তই উপায়-লভ্য। শাস্ত্রান্তরে অন্যপ্রকার কলাবিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছিল। তদনুসারে চতুর্বিংশতি "কর্মাশ্রয়া", নির্জীব-সজীব-ভেদে বিংশতি "দ্যূতাশ্রয়া", ষোড়শ "উপচারিকা" এবং চারিটি "উত্তরকলা" নামে কথিত। এইগুলি "মূলকলা"—ইহাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট "অন্তরকলা"র সংখ্যা পাঁচশত অষ্টাদশ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-গণের নিকট ইহার সকলগুলি সুকুমারকলা বলিয়া সমাদর লাভ করিবে না; কারণ এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বিভাগ-ব্যবস্থা পাশ্চাত্ত্য কলা-শাস্ত্রে অপরিচিত। কিন্তু ভারত-শিল্প-সমাচার অবগত হইবার পক্ষে, ইহাদিগের আলোচনা অপরি-

হার্য। কোন্ বিশিষ্ট প্রণালীতে ভারত-শিল্প-জ্ঞান বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহারও সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে।

অনেক আধুনিক শিল্প-সমালোচক ভারত-শিল্পকে ধর্মাঙ্গভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। এখনও যে সকল বিচিত্র দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, যে সকল শিল্প-সুষমাসংযুক্ত গিরিগুহা, যে সকল স্তূপবিহারাদির জীর্ণকঙ্কাল, এবং শ্রীমূর্তির ক্ষতাক্ষত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ধর্মের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। কিন্তু তাহাই ভারত-শিল্পের একমাত্র নিদর্শন নহে। অন্যান্য নিদর্শন অপেক্ষাকৃত দুর্লভ, এবং কোন কোন নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে অপ্রাপ্য হইলেও ভারত-শিল্প যে কেবল ধর্মাঙ্গভূত হইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করা যায় না। ভারতবাসী কেবল ধর্মাচরণ লইয়াই, অবসর-শূন্য জীবন যাপন করিয়া, সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন ছিল, এরূপ কল্পনা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নিতান্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীন শিল্প-পরিচয় লোকসমাজে সুপরিচিত হইলে, এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে।

পুরাকালে ভারতবর্ষে পিতৃলোক, দেবলোক, এবং মনুষ্যলোক নামক তিনটি পৃথক্‌লোক ত্রিবিধ বিজয়ক্ষেত্ররূপে সুবিদিত ছিল। শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোক, যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দেবলোক, এবং অধিকার-বিস্তারের দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করিতে হইত। সুতরাং ইহলৌকিক অভ্যুদয় লাভের প্রয়োজন ভারতবর্ষেও অপরিচিত ছিল না; এবং তাহার অনুকূল শিল্পদ্রব্যেরও অসদ্‌ভাব ছিল না। তাহা সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিত বলিয়া, তাহাকে স্থায়িত্বদানের জন্য প্রয়াস প্রকাশিত হইত না। তজ্জন্য তাহার নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন অর্ণবপোত নাই, অতএব মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া দ্বীপান্তরে যাতায়াতের উপায় ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত ছিল, এরূপ অনুমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষের সমগ্র পুরাতন সাহিত্যেই তাহার প্রতিকূল প্রমাণ বর্তমান আছে। সে সাহিত্য শিল্পচর্চাকে ধর্মাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করে নাই, তাহাতে বরং শিল্পবিদ্যা "জন-বিদ্যা"র অন্তর্গত বলিয়াই উল্লিখিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।২) তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদ যে সকল বিদ্যা অধিগত করিয়াছিলেন, সনৎকুমারের প্রশ্নে তাহার পরিচয় প্রদান করিবার সময়ে "সর্প-দেব-জনবিদ্যা"রও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন, "সর্প-বিদ্যা" গারুড়-বিদ্যা, "দেবজনবিদ্যা" নৃত্যগীতশিল্পাদি কলা-বিদ্যা। অতি পুরাকালেই মানব-

সমাজে ধনোপার্জনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন হইতে বাণিজ্যই লক্ষ্মীর নিবাস বলিয়া ভারতীয় জনসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং বিবিধ শিল্পদ্রব্য বাণিজ্য-বিস্তারের সহায়তা সাধন করিয়াছিল। ভারতীয় সূক্ষ্মশিল্প বহু দূরদেশে নীত এবং উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। কি স্বদেশে কি বিদেশে শিল্পদ্রব্য ধনোপার্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, এবং তজ্জন্য শিল্পচর্চা প্রচুর উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। বাণিজ্যব্যপদেশে নানা দেশের সহিত পরিচয় সংস্থাপিত হইবার পর, ভারত-শিল্পের রচনা-কৌশল অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; নানা দেশ হইতে উপাদান সংগ্রহের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-শিল্প প্রতিভা-বিকাশের অনেক নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান লাভ করিয়াছিল। এইরূপে সেকালের বিদেশের সম্পর্ক ভারত-শিল্পের অবনতির পথ উন্মুক্ত না করিয়া উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। এই যুগের ভারত-স্থাপত্যের সাধারণ লক্ষণে যাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত, তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর;—সৌন্দর্য-গাম্ভীর্যের অপূর্ব সম্মিলন। তাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অমিতব্যয়িতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ফার্গুসন্ তাহাকে শিল্প-ব্যসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারত-শিল্পের পক্ষে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক পরিণতি।

যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।

এই ধারণা ভারত-স্থাপত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৃহৎ এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে যে শিল্প-প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা অজ্ঞাতসারে বৃহতের আদর্শেই পরিচালিত হইয়াছিল। বৃহতের আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া, ভারতীয় মূর্তি-শিল্প আর এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাহা দেব-মূর্তিতে দুই বাহুর পরিবর্তে বহু বাহুর, এবং এক মস্তকের পরিবর্তে বহু মস্তকের অবতারণা করিয়া, অলৌকিকত্ব স্থাপিত করিতে গিয়া, অতিশয়োক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেও অতিশয়োক্তি একটি অলঙ্কার, তাহা অলৌকিক হইলেও রচনা-দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সসীম উপাদানে গঠিত, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পরিমাণ-সীমায় সুসংযত, দেবমূর্তির মধ্যে অসীমের আভাস-প্রকাশ-চেষ্টা ভারত-শিল্পকে অতিশয়োক্তির অবতারণা করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহা একদিকে যেমন এইরূপ অতিশয়োক্তির অনুরক্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে সেইরূপ উত্তরোত্তর বেশভূষার বাহুল্য বিস্তার করিয়াছিল।

এইরূপে ক্ষুদ্র বৃহৎ সূক্ষ্ম স্থূল কত চারু-শিল্প কারু-শিল্প ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্দেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন সাহিত্যে

তাহার যে সকল বিবরণ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাও নিঃশেষে সঙ্কলিত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় কতকগুলি প্রধান প্রধান শিল্প দ্রব্যের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থনিবদ্ধ করিতে পারিলে, অল্পলাভ বলিয়া অনাদৃত হইবে না। কিন্তু তাহাও নিতান্ত সহজসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অভিজ্ঞ অধ্যয়নশীল বিচারনিপুণ, তথ্যানুসন্ধান-পরায়ণ সুলেখকের সংখ্যা অল্প। এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, যে সকল মুদ্রিত এবং হস্ত-লিখিত গ্রন্থের, শিল্প-নিদর্শনের এবং নিদর্শন-প্রতিকৃতির পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহাও অল্পস্থানেই একত্র সংগৃহীত অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং প্রাচীন শিল্প-পরিচয় সঙ্কলনের প্রথম চেষ্টা সর্বাংশে সফল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। রাজসাহী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সদস্যরূপে দীর্ঘকাল হইতে এতদ্বিষয়ক তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া আসিতেছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকে উৎসাহ দান করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ ১৩২৬ সালের ১৬ আষাঢ়ের একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের এই প্রবন্ধ পড়িলে, ভারতবর্ষবাসী আর্যজাতি সকলেই আত্মগৌরবে পূর্বস্মৃতির অনুভব করিয়া গর্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকার ক্রোড়ে থাকিয়া, কালান্তরে অযত্নে নষ্ট হইবে, এজন্য বড়ই পরিতাপ হয়।"

ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১৩২৪ সালের ৭ বৈশাখের পত্রে অধুনা পরলোকগত স্বনামখ্যাত সাহিত্যাচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের দেশের অতি প্রাচীনকালের নানাবিধ শিল্পের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় এ পর্যন্ত সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। সাহিত্য পত্রিকায় যতগুলি বাহির হইয়াছে, আমি প্রায় সমস্তই পড়িয়াছি, এবং পণ্ডিত মহাশয়ের গবেষণাপ্রবৃত্তি ও অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। অনেক প্রাচীন শিল্পের নাম মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু এখন তাহা লুপ্ত শিল্প। সেই শিল্পের বিবরণ দিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে অনেক সূক্ষ্ম বিচার বিতর্কে উপস্থিত হইতে হইয়াছে, এবং তিনি সর্বত্র অতি স্থিরভাবে বিচার করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের রচনাগুলি

ছাপিয়া, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে, সেই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে, সন্দেহ নাই।"

সুযোগ্য গ্রন্থকার সংস্কৃত শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া, যখন যে প্রমাণ-রত্নের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য হইয়াছেন, তখনই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সুযোগ দান করিয়া, আমার প্রতি প্রচুর সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রচনাগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমাকে তাহার ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরোধ করায়, সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। গ্রন্থই গ্রন্থপরিচয় প্রদান করিবে, ভূমিকার ত্রুটি বিচ্যুতি অভাব বলিয়া অনুভূত হইবে না, সেই সাহসে ভূমিকা লিখিতে সম্মত হইয়াছিলাম। এখন বুঝিতেছি, এই ভার যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত হইলে ভাল হইত। এই গ্রন্থে যে সকল প্রাচীন শিল্পের পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি কারু-শিল্প, এবং কতকগুলি চারু-শিল্প। যাহা কারু-শিল্প, তাহার মধ্যেও যে চারু-শিল্পের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, গ্রন্থপাঠে তাহা সহজেই প্রতিভাত হইবে। জাতিগত অভ্যুদয়ের পরিচয় একটি মাত্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাণের স্পন্দন সজীবতার পরিচয় প্রদান করিবার সময়ে, সকল বিষয়েই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যতদিন ভারতবর্ষের লোকসমাজের প্রাণের স্পন্দন নিরস্ত হয় নাই, ততদিন ঐশ্বর্যে, বীর্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, সকল বিষয়েই তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। প্রাচীন শিল্প-পরিচয় তাহা কতদূর প্রকাশিত করিতে সমর্থ, পাঠকগণ তাহার বিচার করিতে পারিবেন। সংপ্রতি স্বদেশশিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য ভারত-বর্ষের সকল স্থানে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা আন্তরিক হইলে, এই গ্রন্থ যথাযোগ্য আদর লাভ করিবে, এবং এই শ্রেণীর গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়োজন উত্তরোত্তর অধিক অনুভূত হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

রাজসাহী
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি
ভাদ্র, ১৩২৯

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

প্রাচীন শিল্প-পরিচয় : বস্ত্র

প্রাচীন ভারতবর্ষে যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তথ্যানুসন্ধানের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্বরতা অতিক্রম করিয়া সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবার প্রথম উপক্রম হইতেই বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল এবং দেশভেদে ও অবস্থাভেদে বস্ত্রের উপাদান ও ব্যবহারপ্রণালী ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহার পরিচয় প্রদান করিবার জন্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বস্ত্রের ব্যবহার মানবসভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। যে সকল আধুনিক সভ্যজাতির ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, তাঁহারা ইতিহাসের প্রমাণেই জানিতে পারেন যে, তাঁহারা এক সময়ে অশাসিত অবস্থায় নগ্নপদে অনাবৃতগাত্রে আম-মাংস ভক্ষণ করিয়া বন্যপশুর মত বিচরণ করিতেন। তাঁহারা আত্মতুলনায় পরের উপরেও এই অবস্থার সমারোপ করিয়া আদিম অবস্থার মানুষমাত্রকেই দিগম্বর বিশেষণে ভূষিত করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সভ্যতার উন্মেষ-কালেই বস্ত্র-শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল। সূত্রগ্রন্থসমূহ ভারতবর্ষের আর্য-সভ্যতার প্রধান সাক্ষী। গোভিল প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রে সমাজের যে অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ সভ্যজাতির কার্যকলাপেরই পরিচয় প্রদান করে। তাহা দেখিয়া বোধ হয়, মানুষ যেন সর্বতোভাবে সভ্য-ভূমিকায় সাজিয়াই সংসার নাটকের অভিনেতৃরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সূত্রগ্রন্থে নগ্নাবস্থার কোনরূপ নিদর্শনই পাওয়া যায় না। প্রত্যুত সেই সুপ্রাচীন যুগ হইতেই বস্ত্রের ব্যবহার ও শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গোভিলের গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মচর্যাবস্থায় চারি প্রকার বস্ত্র ব্যবহারের উপদেশ আছে। ঐ সকল বস্ত্রের নাম (১) ক্ষৌম, (২) শাণ, (৩) কার্পাস, এবং (৪) ঔর্ণ।[১]

ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষৌম অথবা শাণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কার্পাস, এবং বৈশ্যের

১ ক্ষৌম-শাণ-কার্পাসৌর্ণান্যেষাং বসনানি ॥—২।১০।৮।

আবিক বা ঔর্ণ।[২] মধ্যযুগের সাহিত্যেও চারি শ্রেণীর বস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

ক্ষৌম-কার্পাস-কৌশেয়-রাঙ্কবাদি-বিভেদতঃ

তাঁহার মতে— ত্বক্‌, ফল, কৃমি ও রোম এই চারিপ্রকার উপাদান হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বলিয়াই বস্ত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—

ত্বক্‌ ফল কৃমি রোমজঃ সম্ভবত্বাচ্চতুর্বিধম্‌

অতসী প্রভৃতি গুল্মজাতীয় গাছের ছাল হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার নাম 'ক্ষৌম'। সম্ভবতঃ এই বস্ত্র পূর্বকালে কেবল 'ক্ষুমা' বা অতসী হইতেই উৎপন্ন হইত বলিয়া 'ক্ষৌম' নাম লাভ করিয়াছিল। বর্তমান সময়ে পাট ও শণ প্রভৃতি হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই ক্ষৌম বস্ত্র [illegible] 'অংশুপট্ট' নামে অভিহিত হইয়াছে[৩]। এই 'অংশুপট্ট' শব্দের অর্থ কি— তাহা টীকাকারগণ [illegible] হইয়াছে[৪]। ক্ষৌম বস্ত্রের নাম 'দুকূল' বা 'দুগূল'।[৫] [illegible] কাপড়ও ত্বক্‌ হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু গোভিলের সময়ে তাহা স্বতন্ত্র নামেই পরিচিত ছিল; 'অংশুপট্ট' বা ক্ষৌম সংজ্ঞা লাভ করে নাই। মহর্ষি মনুও গোভিলের অনুসরণ করিয়াছেন। যথা—

শাণ-ক্ষৌমাবিকানাঞ্চ। —মনু, [illegible]

কৌশেয় বা কৌষিক বস্ত্র (রেশমের কাপড়) 'পট্টবস্ত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন—

কৌশিকং কোশ-প্রভবং তসরী-পট্টাদি

দেবল ঋষির মতে বস্ত্রের ছয় প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে যেন পট্ট ও কৌশেয় স্বতন্ত্র পদার্থ। যথা—

ঊর্ণা-কৌশেয়-কুতপ-পট্ট-ক্ষৌম-দুকূলজাঃ

মেষের লোম হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম 'ঔর্ণ' বা 'আবিক'। কার্পাসের তুলা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম 'কার্পাস' বা 'বাদর'।

স্যাৎ কার্পাসন্তু বাদরম্‌। —হেমচন্দ্র

২ ক্ষৌমং শাণং বা বসনং [illegible] কার্পাসং [illegible] আবিকং [illegible] —[illegible]

৩ স [illegible] ॥ —[illegible]

৪ অংশুপট্টং বল্কল-তন্তুকৃতম্‌।

৫ ক্ষৌমং দুকূলং দুগূলম্‌ ॥ —হেমচন্দ্র।

শণ সুতার বস্ত্রকে ক্ষৌমের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইলে কার্পাস, ক্ষৌম, কৌশেয়, আবিক ও রাঙ্কব (মৃগরোমজাত)— মোটামুটি এই পাঁচ প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকার বস্ত্র 'কুতপ' নামে অভিহিত হইত। বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

কুতপঃ পার্বতীয়চ্ছাগ-রোম-নির্মিতঃ কম্বলঃ

রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত মহোদয়দিগের মতে, নেপালদেশীয় কম্বলের নামই 'কুতপ'। একসময়ে নেপালদেশ কম্বলের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; অন্যান্য প্রদেশের লোক নেপালে গেলেই দুই একখানা কম্বল লইয়া আসিত; সেই কম্বল দেখিয়া কম্বলধারীকে নেপাল হইতে নবাগত বলিয়া অনুমান করা হইত। গৌতমসূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে এই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বিতণ্ডা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—

নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলত্বাৎ

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি বিবিধ স্মৃতি-গ্রন্থেই 'কুতপে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি পূর্বকালে ক্ষৌম ও কৌশেয় বস্ত্র ভদ্রসমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত হইত। রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজ্ঞী ও অন্যান্য রাজমহিলাগণ ক্ষৌমবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, নবোঢ়া সীতা প্রভৃতি বধূবর্গকে মঙ্গলালাপে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।[৬]

রামচন্দ্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত ভরত ইঙ্গুদী-পাদপমূলে উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষশাখা-লগ্ন কৌশেয় তন্তুদর্শনে সীতাদেবীর উত্তরীয় বসনের অনুমান করিয়াছিলেন।[৭]

ব্যাসদেবের লেখনীও ভদ্রমহিলার ক্ষৌমবস্ত্র বর্ণনে উদাসীন নহে—

কৃষ্ণাচ ক্ষৌম সংবীতা কৃতকৌতুক-মঙ্গলা

মধ্যযুগের সাহিত্যেও ক্ষৌমবসনের অপ্রতিহত গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তপোবনলালিতা শকুন্তলার জন্য বৃক্ষ হইতে মহর্ষির তপঃ-প্রভাব-সম্ভূত মাঙ্গল্য ক্ষৌমবসনের আমদানী করিয়া গিয়াছেন। যথা—

৬ কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
কুশধ্বজ সুতে চোভে জগৃহুর্ন্‌প-যোষিতঃ ॥
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌম-বাসসঃ ॥ —বালকাণ্ড, ৭৭।১০

৭ উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথাহ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়-তন্তবঃ। —অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮।১৫

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দু-পাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্

অর্বাচীন সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের প্রতি সমাদরের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে এই বিষয়ে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে—

১। পাটের শাড়ী কর্যাছ পরিধান চলিতে নূপুর বাজে।

২। নৈবেদ্য বিবিধরূপ, গন্ধপুষ্প দীপ ধূপ, পট্টবস্ত্র নানা অলঙ্কার।

৩। পাটনেত বাসপর ; গলে রত্নমালা।

থানের মত কাপড়ে স্বতন্ত্র পাইড় লাগাইয়া 'নেতের শাড়ী' প্রস্তুত হইত। এই 'নেতের শাড়ী' একসময়ে বাঙ্গলায় বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যই এই বিষয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য—

পাইয়া ইমামবাড়ী, বুনে নেত পাটশাড়ী

কি পুরাতন যুগে, কি মধ্যযুগে, সর্বত্রই সাহিত্যে বস্ত্রশিল্পের সূক্ষ্মতার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু-সংহিতায় বর্ণিত পৃথিবীর পরিহিত বসনে 'সুসূক্ষ্ম' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে—

সুসূক্ষ্ম শুক্লবসনাং রত্নোত্তম-বিভূষণাম্

আর্যদের পরিধেয় এক প্রকার বস্ত্র 'আহত' নামে পরিচিত ও পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। সংস্কারতত্ত্ব-ধৃত মৎস্যপুরাণে এই 'আহত' বস্ত্রেও সূক্ষ্ম বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্ন ধারিতম্।
আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্বকর্মসু পাবনম্॥

এই স্থলে রঘুনন্দন 'ঈষৎ' শব্দের 'সূক্ষ্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পাণিনির কাশিকা বৃত্তিতে 'কুশাগ্রীয়ং বস্ত্রম্' এইরূপ সূক্ষ্মতা জ্ঞাপক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে রাজার পরিহিত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড নির্মোকের সহিত তুলিত হইয়াছে। যথা—"এবমনুক্রমেণ নিবর্তিতাভিষেকো বিসতন্তুনির্মোক-পরিলঘুনী ধবলে পরিধায় বাসসী।"

শিশুপালবধে বর্ণিত মহিলাবৃন্দের পরিহিত বস্ত্র সূক্ষ্মতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া কুরুচির পরিচয় প্রদর্শনপূর্বক, একেবারে আকাশের সাম্য ধারণ করিয়াছে যথা—

ছন্নেষপি স্পষ্টতরেষু যত্র স্বচ্ছানি নারী-কুচমণ্ডলেষু।
আকাশ-সাম্যং দধুরম্বরাণি ন নামতঃ কেবলমর্থতোঽপি॥

এই মধ্যযুগের সাহিত্যে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চীনাংশুকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ঐ সময়ে চীনদেশ বস্ত্রশিল্পের নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল ; এবং ভারতবর্ষে সেই চীনাংশুক সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছিল।[৮]

তন্ত্রসাহিত্যেও চীনাংশুকের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরভাবাপন্ন ও দিব্য ভাবাপন্ন সাধকগণ যে সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র ভোগের অধিকারী, পশুগণ তাহাতে সর্বতোভাবে বঞ্চিত। সুতরাং 'চীনাংশুক' পশ্বাচারী সাধকের পক্ষে অপরিধেয়।[৯]

বর্তমানযুগে যেমন পুরুষমহলে শুক্ল বস্ত্রের একাধিপত্য, পূর্বকালে তেমন ছিল না। স্ব স্ব রুচি অনুসারে পুরুষগণও নানারঙের কাপড় পরিধান করিতেন। মহাভারতে এই বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। অর্জুনের সম্মোহন বাণে দ্রোণাচার্য প্রভৃতি বীরগণ সংজ্ঞাবিহীন হইয়া যে সময়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত হইয়াছিলেন, তখন উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া অর্জুন বিরাটপুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে নরপ্রবীর! তুমি আচার্য ও শারদ্বতের শুক্লবর্ণ, কর্ণের পীতবর্ণ, অশ্বত্থামা ও রাজার নীলবর্ণ বস্ত্র গ্রহণ কর।"[১০]

কাপড়ের এই সমস্ত রঙ বিবিধ পুষ্প ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সম্পাদিত হইত।[১১] উপাদানগত পার্থক্য অনুসারে রঙ করা কাপড়ের শুদ্ধি-বিধানের তারতম্য দেখা যায়।

দেবলের মতে—তুলিকা, অর্থাৎ তোষক বালিশ ও 'পুষ্পরক্ত' বস্ত্র সূর্যতাপে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া, হস্তের দ্বারা পুনঃ পুনঃ মর্দন করিলেই শুদ্ধ হয়।[১২] বিজ্ঞানেশ্বর 'পুষ্পরক্ত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

পুষ্পরক্তানি কুঙ্কুম-কুসুম্ভাদি-রক্তানি

কেহ কেহ নিয়ত একরঙের কাপড় ব্যবহার করিতেন বলিয়া, তত্তৎ রঙের কাপড়ের নামানুসারে তাঁহাদিগের নাম প্রসিদ্ধ হইত। ইহার উদাহরণ স্থলে নীলাম্বর নামে ও পীতাম্বর নামে সুপরিচিত রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই উল্লেখযোগ্য।

৮ বিমলচীনাংশুকান্তরিতামিব॥ —কাদম্বরী।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥ —অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

৯ গন্ধমাল্যানি বস্ত্রানি চীনানি প্রভজেন্নহি॥ —কামাখ্যাতন্ত্র, ৫ পটল।

১০ বিরাটপর্ব, ৬৬।১৩

১১ তেন রক্তং রাগাৎ। কষায়েণ রক্তং বস্ত্রং কাষায়ম্। মাঞ্জিষ্ঠম্। —পাণিনি ৪।২।১

১২ তূলিকাচোপধানঞ্চ পুষ্প-রক্তাম্বরাণিচ।
শোষয়িত্বা তপে কিঞ্চিৎ করৈঃ সম্মার্জয়েন্মুহুঃ॥ —মিতাক্ষরা।

ব্রাহ্মণের পক্ষে পরিধানে ও প্রাবরণে শুক্লবস্ত্রই প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। শুক্লবস্ত্রের অভাবে পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা।[১৩] যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও ধৌত বস্ত্রের অভাবে শাণ, ক্ষৌম ও আবিক বস্ত্র পরিধেয়।[১৪] কবিকঙ্কণের সময়ে তসরের আদর বাড়িয়াছিল। গুজরাটের সমৃদ্ধি-বর্ণনে তিনি তসর পরিধান জাঁকজমকের লক্ষণ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

চন্দনে চর্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু
তসর বসন পরিধান।

বর্তমানযুগেও তসর গরদের পরিধান পবিত্রতা মিশ্রিত গৌরবের পরিচায়ক বলিয়া সমাজে বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ধৌত কার্পাস বস্ত্র থাকিতে 'তসর' পরিধান পরিত্যাজ্য; কেবল প্রাবরণে (উড়নীরূপে ব্যবহারে) প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। আশ্বলায়নের সময়ে এই শব্দের তকারে র-ফলা ছিল। বোধ হয় ক্রমে ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া 'তসর' হইয়াছে। এই তসরের ব্যবহারে বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই পবিত্র মনে করিয়া তসর পরিয়া আহার করিয়া থাকেন, এবং সেই পরিহিত তসর অধৌত অবস্থায় সময়ান্তরেও ব্যবহার করেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শাস্ত্রানুসারে তসর পরিধান করিয়া ভোজন অথবা মলত্যাগ করিলে, সেই তসর ধৌত করিয়া শুদ্ধ করিতে হয়।[১৫] সাধারণতঃ পরিধেয় বস্ত্র 'দশাযুক্ত' অর্থাৎ অগ্রভাগে ছিলা-সংযুক্ত হইত; দশা-রহিত অর্থাৎ থান কাপড় আর্যদিগের অপরিধেয় বলিয়া গণ্য হইত। দশাযুক্ত বস্ত্রের অভাবে অগত্যা থানের কাপড় ব্যবহৃত হইত। পুরাণে ও স্মৃতিতে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।[১৬] বর্তমান সময়ে কাপড়ের পাইড়ে গান বা কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস বহু শতাব্দী পূর্বে সুরসুন্দরীদিগের

১৩ পরিধানে সিতং শস্তং বাসঃ প্রাবরণে তথা
পট্টকূলং তথা লাভে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ॥ —লঘ্বাশ্বলায়ন-স্মৃতি, ২৮

১৪ অভাবে ধৌত বস্ত্রাণাং শাণ-ক্ষৌমাবিকানিচ।

১৫ আবিকং ত্রসরঞ্চৈব পরিধানে পরিত্যজেৎ।
শস্তং প্রাবরণে প্রোক্তং স্পর্শদোষো ন বিদ্যতে ॥
ভোজনঞ্চ মলোৎসর্গং কুর্ব্বতে ত্রসরাবৃতাঃ।
প্রক্ষাল্য ত্রসরং শুদ্ধং দুকূলঞ্চ সদা শুচি ॥

১৬ মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জয়েদম্বরং বুধঃ। —নরসিংহপুরাণ।
দশাহীনেন বস্ত্রেন কুর্যাৎ কর্মাণ্যভাবতঃ। —আচাররত্নে ধৃত উশনা।

কল্পলতা-প্রসূত বস্ত্রে দুষ্মন্তের চরিত্র গীতাকারে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।[১৭] আর্যশাস্ত্রে (অবস্থা বিশেষ) ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধি ও নিষেধ দৃষ্ট হয়। সধবা রমণী রক্তবস্ত্র (রঙীন কাপড়) পরিধান করিবেন; বিধবার পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। কুমারীগণ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন না।[১৮] এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে পাপজনক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়া গিয়াছেন,[১৯] নীলবস্ত্র (নীল রঙের কাপড়) পরিধান করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ, তর্পণ ও পঞ্চযজ্ঞ নিষ্ফল হয়। কেবল তাহাই নহে; ইহাতে যে পাপ হয়, তাহা ক্ষালণার্থ অহোরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য-পান রূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর্তব্য। ভবিষ্যপুরাণের এই বচন শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে' উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আপস্তম্বই আবার বলিয়া গিয়াছেন,[২০] "রমণী-দের 'ক্রীড়ার্থ সংযোগে' অর্থাৎ উৎসবাদি সময়ে নীলবস্ত্রের ব্যবহারে দোষ নাই; তাহা শয্যাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে।" অন্যান্য স্মৃতি-পুরাণেও নীলের এইরূপ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিদের এই নীলবিদ্বেষের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রসায়ন-বিজ্ঞানে কৃতবিদ্যগণ ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন কি? নীলের ন্যায় গাঢ় রক্তবর্ণ বস্ত্রও নরসিংহপুরাণে[২১] নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৈধকর্মের অনুষ্ঠান-সময়ে শেলাই করা কাপড়, দগ্ধ বস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র ও মূষিকোৎকীর্ণ জীর্ণ বস্ত্রের ব্যবহার বিশেষ-রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।[২২]

শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সাধারণতঃ একাধিক বস্ত্র ব্যবহার করিবার উপদেশ

১৭ বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
সঞ্চিন্ত্য গীতিক্ষমমর্থ-বন্ধং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ —অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

১৮ ধারয়েদথ রক্তানি নারীচেৎ পতিসংযুতা।
বিধবা চ ন রক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী ॥ —মৎস্যপুরাণ।

১৯ স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
পঞ্চযজ্ঞা বৃথা তস্য নীলী বস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোহঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ —ষষ্ঠ অধ্যায়।

২০ স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থ-সংযোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি।

২১ নরক্তমুল্বনং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।

২২ ন স্যূতেন ন দগ্ধেন পারক্যেন বিশেষতঃ।
মূষিকোৎকীর্ণজীর্ণেন কর্মকুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ —আহ্নিকতত্ত্বে ধৃত ভারত।

দেখিতে পাওয়া যায়।[২৩] পরিণীতা রমণীর পক্ষে বহুবস্ত্র এবং কুমারীর পক্ষে দুইখানি বস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। পুরুষের অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়, মহিলাদিগের এই উভয় ও অবগুণ্ঠন, স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং পুরুষের বস্ত্রে 'বাসসী' দ্বিবচন এবং মহিলার বস্ত্রের বিশেষণে (বস্ত্রাণি) বহুবচন দেখিতে পাওয়া যায়।

অবগুণ্ঠন

আজকাল আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন একখানা কাপড়ের দ্বারা আজানু মস্তক ঢাকিয়া আমাদিগের ব্যয়ভারের লাঘব করিতেছেন, পূর্বকালে তেমন ছিল না। অবগুণ্ঠন-প্রথা আর্যাবর্তের চিরন্তন প্রথা। এই প্রথা দাক্ষিণাত্যে পূর্বেও ছিল না, এখনও প্রচলিত নাই। সুতরাং 'মুসলমানের অত্যাচার ঘোমটার উদ্‌ভাবক' বলিয়া কল্পিত হইতে পারে না। কারণ প্রাচীন স্মৃতিতে[২৪] শ্বশুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মুখে মহিলাবৃন্দের শির-আচ্ছাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আদি কবি বাল্মীকির রচনাতেও ইহার উল্লেখ আছে।[২৫] বীর-কেশরী রাক্ষস-নেতা দশানন দাশরথির বাণে গতায়ু হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, শোকাতুরা মন্দোদরী বিলাপকালে বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ! তুমি আজ এই যুদ্ধভূমিতে আমাকে অবগুণ্ঠনশূন্যা দেখিয়া ক্রোধ করিতেছ না কেন?" মহাকবি মাঘের বর্ণনায়ও মহিলাগণের উত্তমাঙ্গে অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায়।[২৬]

বাণভট্টের 'গাউন-পরা' চাণ্ডাল কন্যকা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া, মস্তকে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল।[২৭]

২৩ জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্যাৎ কেশান্ন ধূনয়েৎ॥ —গোভিলকারিকা।
নার্দ্রং পরিদধীত নৈকং পরিদধীত। —গোভিলপুষ্পসূত্র, [illegible]

২৪ শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাৎ শিরঃ প্রাচ্ছাদন ক্রিয়া।
পুত্রৈর্দর্ভেণ না কার্যা মাতুরুচ্ছাদনাদিভিঃ। —গর্গ।

২৫ দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিমর্থং নাভিভাষসে।
দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মা মিহানবগুণ্ঠিতাং॥ —যুদ্ধকাণ্ড।

২৬ স্রস্তাবগুণ্ঠনপটাঃ ক্ষণলক্ষ্যমাণবক্ত্রশ্রিয়ঃ সভয়কৌতুকমীক্ষিতেন। —মাঘ।

২৭ আগুল্ফাবলম্বিনা নীলকঞ্চুকেনাবচ্ছন্নশরীরাম্ উপরিরক্তাংশুকরচিতাবগুণ্ঠনাম্। —কাদম্বরী।

কালিদাসের তপোবন-লালিতা শকুন্তলার মস্তকেও অবগুণ্ঠন দেখিতে পাই। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যবাসের ফলে যাহারা আর্যাবর্তের ভাষা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মহিলাবৃন্দের মস্তকেও চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটা কাপড়

অনেকে মনে করেন, প্রাচীন কালে ঋষিযুগের ভারতবর্ষে কাটা কাপড়ের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। এই অপসিদ্ধান্তের ফলে কঞ্চুকাবৃত প্রস্তরমূর্তি গ্রীক্-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে কঞ্চুক-ব্যবহারের নিদর্শনের অভাব নাই। আহ্নিক-তত্ত্বে একটি স্মৃতিবচনে (বৈধকর্মের অনুষ্ঠান সময়ে) কঞ্চুক পরিত্যাগের উপদেশ আছে।[২৮] তন্ত্রশাস্ত্রের বিশিষ্ট গ্রন্থ 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থে জপকালে কঞ্চুক ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।[২৯] ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় মহাভারত হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন[৩০] তাহাও এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রদর্শিত প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও আধুনিক অভিধানকার 'কঞ্চুক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মেয়েদের কাঁচলী'। মেয়ে-মহলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সীমন্ত-সিন্দুরের মত ইহাতে মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের অভিধানে কঞ্চুক অর্থে—'চোল, কঞ্চুলিকা,[৩১] কূর্পাসক, অঙ্গিকা, কঞ্চুক,' এই কয়টি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের এতদ্-বিষয়িণী কারিকাটি এইরূপ—

চণ্ডাতকং চলনকং চলনী ত্বিতর-স্ত্রিয়াঃ।
চোলঃ কঞ্চুলিকা কূর্পাসকোঽঙ্গিকা চ কঞ্চুকে।

২৮ ন স্যাৎ কর্মণি কঞ্চুকী।

২৯ উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশোঽপ্যনাবৃতঃ।
অপবিত্রকরোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্নজপেৎ ক্বচিৎ॥

৩০ বিবিশুস্তে সভাং দিব্যাং সোষ্ণীষা ধৃতকঞ্চুকাঃ। —ইণ্ডো-এরিয়ান্।

৩১ কঞ্চুলিকাধারণে কামিনীদিগের সুষমা বর্ধিত হইত, কাব্যপ্রকাশের কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। নায়ক নায়িকাকে বলিতেছেন, "হে মনোহরনেত্রে! কঞ্চুলিকা ব্যতীতই তুমি পরম শোভা ধারণ কর। যথা—

ত্বং মুগ্ধাক্ষি! বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্
লক্ষ্মীমিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকা-সংস্পৃশি।
শয্যোপান্তনিবিষ্ট-সস্মিতমুখো নেত্রোৎসবানন্দিতো
নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাস মালী জনঃ॥

'চণ্ডাতক' শব্দের অর্থ, দিব্যস্ত্রীদিগের 'চলনা' নামে খ্যাত— অধোরু পর্যন্ত ব্যাপ্ত বস্ত্র বিশেষ। সাধারণ স্ত্রীলোকের এই বস্ত্রের নাম চলনী। 'তু' কারের দ্বারা ইতর স্ত্রীকে অন্য হইতে 'ব্যাবৃত্ত' করা হইয়াছে। ঐ কারিকার অপরার্ধে পঠিত চোল হইতে অঙ্গিকা পর্যন্ত শব্দগুলি সাধারণ স্ত্রীলোকের 'কঞ্চুক' অর্থে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা 'কঞ্চুক' যে কেবল স্ত্রীমাত্রেরই ব্যবহার্য, এমন বুঝায় না।

যেমন 'পশ্চান্নিতম্বঃ স্ত্রীকট্যাঃ' এই উক্তিতে স্ত্রীলোকেরই কটির পশ্চাদ্ভাগের নাম 'নিতম্ব'—এইরূপ অর্থ বুঝায়। কিন্তু 'কটি' স্ত্রীশরীরেরই অবয়ব, পুরুষের নহে, এমন বুঝায় না; এই স্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এই শ্রেণীর জামা নির্মাতা 'কঞ্চুক-কার' নামে অভিহিত হইত। উদ্ভটে তাহার প্রমাণ দেখা যায়।[৩২] আজকাল যাহারা বিবিধ কোশগ্রন্থের সঙ্কলনকার্যে ব্যাপৃত, তাঁহারাই এ সকল বিষয়ে অনেক গোলযোগ ঘটাইতেছেন।

—

নীশার

প্রাচীনকালে 'নীশার' নামে একটি পদার্থের ব্যবহার ছিল। এই নীশার শব্দটিকে সাধু করিবার অভিপ্রায়ে, কাত্যায়ন পাণিনির 'ইকঃ' (৬।৩।১২১) এই সূত্রে একটি বার্তিক সূত্রের (শৃবায়ুবর্ণনিবৃতেষু) যোগ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সেকালে 'নীশার' কতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা মনীষিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। হেমচন্দ্র পূর্বোক্ত কারিকার পরেই লিখিয়াছেন— 'শাটী চোট্যথ নীশারো হিমবাতাপহাংশুকে'— কঞ্চুকের পরেই 'শাটী' তৎপরেই 'নীশার' উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে 'নীশার' একটি শরীরধার্য পদার্থ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। অমরসিংহ ইহার পূর্বে এবং কূর্পাসের পরে বরস্ত্রীভোগ্য অর্ধোরুকের পাঠ করিয়াছেন। যথা— 'চোলঃ কূর্পাসকোঽস্ত্রিয়াং নীশারঃ স্যাৎ প্রাবরণে হিমানিলনিবারণে। অর্ধোরুকং বরস্ত্রীণাম্'— তাঁহার এই পাঠের ক্রমানুসারে রমণীদিগের ভোগ্য বস্তুই যেন অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।

৩২ বিমল বিয়াভিযোগ্যে শাস্ত্রে জড়ঃ পিজতি ন মৌর্খ্যে মে।
নিন্দতি কঞ্চুক-কারং প্রায়ঃ শুষ্কস্তনী নারী॥

মহাভাষ্যকার 'নীশার' শব্দের প্রয়োগ দেখাইবার অভিপ্রায়ে উদাহরণ দিয়াছেন— 'গৌরিবাকৃত-নীশারঃ প্রায়েণ শিশিরে কৃশঃ'। অর্থাৎ, শীতকালে গরু যেমন কৃশ হইয়া যায়, 'অকৃত-নীশার' ব্যক্তিও সেইরূপ কৃশ হয়। ইহাতে শীতের সময়ে নীশারের বিশেষরূপ উপযোগিতা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ের বিচার না করিয়া, অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, 'কানাৎ বা মসারীতি খ্যাতে, শীর্যতে শীতমনেন ঘঞ্ হ্রস্বস্য দীর্ঘতা' এতদ্ব্যাখ্যাসূত্রে কানাৎ বা মসারী 'নীশার' নামে কল্পিত হইবার পর, 'শব্দকল্পদ্রুমে' ও 'বিশ্বকোষে'ও তাহাই বিনা বিচারে গৃহীত হইয়াছে। 'নীশার' শব্দের এরূপ অর্থ বিজ্ঞাপক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র, উভয়েই 'নীশার'কে স্ত্রীভোগ্য বস্ত্রের প্রকরণে পাঠ করিয়াছেন, তথাপি (মহাভাষ্যের উদাহরণানুসারে) ইহা সাধারণের উপভোগ্য বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। প্রস্তরমূর্তিতেও এই শ্রেণীর শিল্প পুরুষ প্রতিকৃতির গাত্রেও দেখা যায়।[৩৩] হয়ত অমরসিংহ প্রভৃতির সময়ে স্ত্রী-শরীরেই ইহার ব্যবহার হইত।

—

নিচোল

'নিচোল' নামে মহিলাদিগের ব্যবহার্য আর এক প্রকার কাপড়ের নাম অভিধানে ও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 'বিশ্বকোষ' ইহার অর্থ করিয়াছেন—'আচ্ছাদন বস্ত্র'; 'স্ত্রীলোকদিগের পরিধানবস্ত্র'; চলিত 'পাছুড়ী' 'ঘোমটা' এবং প্রমাণস্থলে হেমচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের কারিকাটি এইরূপ— 'নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচোলশ্চোত্তরচ্ছদে'। অমরকারিকা —'নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ'। টীকাকার রঘুনাথ বলিয়াছেন—'চলনাকারে পরিহিত বস্ত্রে' 'পাছুড়ীতি খ্যাতে'; এবং সমর্থনার্থ ব্যাড়ির কারিকা ('নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচুলঃ প্রচ্ছদশ্চ সঃ') উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্তের পর্যালোচনায় দেখা যায় 'নিচোল, নিচুল, প্রচ্ছদপট, উত্তরচ্ছদ ও প্রচ্ছদ' শব্দ একার্থ। 'পাছুড়ী' কি বুঝিতে পারিলাম না; আরও বুঝিলাম না— 'স্ত্রীলোকদিগের পরিধান বস্ত্র

৩৩ খণ্ডাচণ্ডের দ্বারপাল মূর্তিতে 'নীশার' ব্যবহারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাছুড়ী'—স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্রমাত্রই কি পাছুড়ী ? আর ঘোমটা অর্থই বা কোথা হইতে আসিল ?

টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত বলেন—'নিচোল' পাল্কী প্রভৃতির আবরণ। তিনি আরও বলেন, ইহা (কাহারও মতে) স্ত্রী পিধানপট, 'বুরকা' নামে প্রসিদ্ধ। সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া 'বুরকা' অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মহিলাদিগের অভিসার সময়ে 'নিচোল' ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়াছিল। সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে—'যান্তি নীল-নিচোলিন্যো রজনীষ্বভিসারিকাঃ'। অর্থাৎ 'অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকাগণ নীল নীচোল ধারণ করিয়া গমন করিতেছে।' 'গীতগোবিন্দে' সখীর উপদেশেও এই অর্থেরই সমর্থন হইয়াছে। যথা—'শীলয় নীলনীচোলম্'। 'রাজতরঙ্গিণী'র বর্ণনাও উক্ত অর্থেরই অনুকূল।[৩৪] যথা—"দিক্‌সকল তীব্র শীতে আক্রান্ত, (অতএব) গাঢ় অন্ধকারচ্ছলে যেন নীল-নীচোলাচ্ছাদিত হইয়াই শোভা পাইতেছিল।" ইহার তাৎপর্য এইরূপ, শীতকালে অন্ধকার রাত্রিতে তুষারাবৃত দিঙ্‌মণ্ডলে অন্ধকারব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাতেই কবি 'নীলনিচোলাবরণের' উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, 'নীচোলাবৃতশরীরে'ও নীচোলের বর্ণাদিব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না।

দেশকালের বৈচিত্র্যানুসারে মানব-রুচির পরিবর্তন স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং এক সময়ে যাহা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ান্তরে তাহাই আবার নিতান্ত হেয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। শিশুপালবধে দেখা যায়, সভ্য সমাজের মহিলাবৃন্দের গাত্রে 'কূর্পাসক' স্থান পাইয়াছিল।[৩৫] এমনকি, ঋষিযুগে রমণীদিগের কঞ্চুকধারণ ধর্মকার্যের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছিল। ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা প্রজাপতি কঞ্চুকশূন্যা মহিলাকে শ্রাদ্ধীয় অন্নপাকে অনধিকারিণী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৩৬] কিন্তু আধুনিক পল্লীসমাজে মহিলার কঞ্চুকধারণ ষষ্ঠ মহাপাতকের ন্যায় বিবেচিত ও সমালোচিত হইয়া থাকে।

কুলকামিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে আবরণীয়। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে

৩৪ সন্ততধ্বান্ত-মিষতস্তীব্রশীতবশীকৃতাঃ।
আশাশ্চকাশিরে নীল-নীচোলাচ্ছাদিতাইব॥

৩৫ প্রস্বেদবারিসবিশেষ-বিষক্তমঙ্গে কূর্পাসকং ক্ষতনখক্ষত মুৎক্ষিপন্তী।
আবির্ভবদ্ঘনপয়োধর-বাহুমূলা শাতোদরী যুবদৃশাং ক্ষণমুৎসবোঽভূৎ॥

৩৬ সিতার্দ্রবাসসাযুক্তা মুক্তকেশা বিকঞ্চুকী।
শিরোঽস্নাতা ব্যাধিতা স্ত্রী পাকং কুর্যান্ন পৈতৃকম্॥

কঞ্চুক ধারণ যে কত আবশ্যক, তাহা 'পাংশুলপাদ' হালিকও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বাঙ্গালী পণ্ডিতের গাত্রে জামা দেখিলে, কেহ কেহ তীব্র মন্তব্যপ্রকাশেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে জামা-ব্যবহারের পাপজনকতা কিছুই সমর্থিত হয় না। প্রত্যুত বৈধকর্মের অনুষ্ঠান-সময়ে কঞ্চুক ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ায় সময়ান্তরে ব্যবহারেরই অভ্যনুজ্ঞা বুঝা যায়।

'আত্মানং সততং গোপায়ীত'—এই শ্রুতিবাক্যেও সতত আত্মরক্ষার উপদেশ আছে। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ের দ্বারা দেহরক্ষাই এই বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কঞ্চুকের দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শীতবাতাদির আক্রমণ ও তন্নিবন্ধন ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। তবে যাঁহারা পণ্ডিতের দেহকে অপার্থিব, অথবা তপোময় কিংবা রক্ষার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছু নাই।

ঋতুভেদে
বস্ত্রভেদ

প্রাচীনকালে ঋতুভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিবার রীতি ছিল। সুশ্রুতে[৩৭] শরৎকালে 'অমল লঘু' (পাতলা) বস্ত্র এবং গ্রীষ্মকালে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। বর্ষাকালের জন্য এক-প্রকার বস্ত্র ছিল; তাহা 'বার্ষিক'[৩৮] নামে অভিহিত হইত। হেমন্ত ঋতুতে ব্যবহার্য বস্ত্র 'হৈমন' নামে পরিচিত ছিল।[৩৯] ইহাদের পার্থক্য কিরূপ ছিল, তাহা বর্তমান সময়ে বুঝিবার উপায় নাই। তবে 'বার্ষিক' বস্ত্র বর্তমান 'ওয়াটার-প্রুফ' শ্রেণীর ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ বর্ষাতে 'সাধু-উপযোগী', এই অর্থে তদ্ধিত হইয়াছে; বর্ষার জল নিবারণই মুখ্য উপযোগ।

—

বহ্নি-শৌচ বস্ত্র

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে একপ্রকার 'বহ্নি-শৌচ'[৪০] বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এই 'বহ্নি-শৌচ' বা অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র কি ? গুপ্তবতী টীকার মতে, 'সর্বদা অগ্নির মত

৩৭ সচন্দনং বা কর্পূরং বাসশ্চামলিনং লঘু। উত্তরতন্ত্র। ৬৪। ১৮

৩৮ বর্ষাভ্যষ্ঠক্। —পা. ৪।৩।১৮। বার্ষিকং বাসঃ —কাশিকা।

৩৯ সর্বত্রাণ্ তলোপশ্চ। —পা. ৪।৩।২২। হৈমনং বাসঃ। —কাশিকা।

৪০ বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী।

নির্মল', অথবা, অগ্নি-প্রক্ষেপের দ্বারা যাহার মল দূর করা হয়। চতুর্ধুরী বলেন—'অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাহা নির্মল হয়।' অথবা, অগ্নিই যাহার শৌচকারী অর্থাৎ নির্মলতাকারী। নাগোজীভট্টের মত চতুর্ধুরীর অনুরূপ।

দংশোদ্ধারের মতও প্রায় ইহাদেরই তুল্য। 'অগ্নির দ্বারা শৌচ'—বোধ হয় 'ইস্তিরী করা', তদ্ব্যতীত আর কি শৌচ হইতে পারে? সুতরাং 'ইস্তিরী' করিবার প্রথাও অতি প্রাচীন কালেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

কাপড়ের উপরে সোনালী কাজের নৈপুণ্যও পুরাকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। রাবণের[৪১] বিচিত্র সভার উত্তরচ্ছদে অর্থাৎ আবরণ-বস্ত্রে 'রুক্মপট্ট' এই বিশেষণ দেখিয়া, উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রুক্মপট্ট—স্বর্ণের কাজ করা কাপড়; তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

—

কন্থা

বর্তমান সময়ে কন্থা বা কাঁথা গরিবের শীত নিবারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমৃদ্ধ বিলাসীর সহিত ইহার সম্পর্ক দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের মেয়ে-মহলে প্রসূতির শিশুপোষণে ইহার কতক ব্যবহার দেখা যায়। বঙ্গের কোন কোন স্থানে ভদ্রলোকের ব্যবহারেও ইহার সামান্য উপযোগ ছিল, এবং অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ইহাতে মেয়েদের শিল্প-নৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু অল্প মূল্য কম্বলের আমদানীতে এই শিল্প ক্রমশঃ নামমাত্রে পর্যবসিত হইতেছে। মধ্যযুগের কবিও জীর্ণপটনিবদ্ধ কন্থাকে দরিদ্রের উপকরণ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।[৪২]

কিন্তু পুরাকালে এই জিনিস ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এমন কি, ইহার সম্পর্কে অনেক দেশ পরিচিত হইত। পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র ও কাশিকাবৃত্তি প্রভৃতির উদাহরণ এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উক্ত

৪১ বিরাজমানো বপুষা রুক্মপট্টোত্তরচ্ছদম্॥ —রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১১।১৫

৪২ ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈক-দেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহ-ভারঃ।
বাসশ্চ জীর্ণপটখণ্ড-নিবদ্ধকন্থা
হাহা তথাপি বিষয়ং ন জহাতি চেতঃ॥ —শান্তি শতক।

ব্যাকরণের অনেকগুলি সূত্রের সহিত কন্থার সম্পর্ক রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সূত্রের অর্থ এইরূপ: যদি উশীনর দেশীয় কন্থা বুঝায়, তবে কন্থা শব্দ যাহার পরে আছে এমন তৎপুরুষ সমাস ক্লীবলিঙ্গ হয়। উদাহরণ: 'সৌশমিকন্থং' 'সংজ্ঞায়াং কন্থোশীনরেষু' (পা. ২।৪।২০)। এই স্থলে পাণিনীয় ভাষাবৃত্তিকার সৃষ্টিধরাচার্য লিখিয়াছেন—'সৌশমিকন্থ' শব্দের অর্থ সৌশমি-কর্তৃক কল্পিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত 'কন্থা' (শীতত্রাণ) বিশেষ।[৪৩]

অপর একটি সূত্রে বলা হইয়াছে, কন্থা প্রভৃতি শব্দ যাহার উত্তরপদে রহিয়াছে, দেশবাচক তাদৃশ বৃদ্ধিসংজ্ঞক প্রাতিপদিক হইতে শৈষিক ছ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ: দাক্ষিকন্থীয়ং ইত্যাদি। 'কন্থাপলদ নগর গ্রাম হ্রদোত্তরপদাৎ' (পা. ৪।২।১৪২)।

অন্য একটি সূত্র 'বর্ণৌ বুক্' (পা. ৪।২।১৪৩)। বর্ণু নামক একটি নদী, এই নদীর সমীপবর্তী দেশ বর্ণুনামে অভিহিত হয়। এই বর্ণুদেশের কন্থা বুঝাইলে কন্থা শব্দের পর বুক্ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ: 'তথাহি জাতং হিমবৎসুকান্থম্' (কাশিকা)। ব্যাকরণেও যাহার ভূরি নিদর্শন দেখা যায়, যাহার নামে দেশ পরিচিত, সে জিনিস শিল্পের উন্নত পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। বর্তমানকালে যাহা লেপ নামে পরিচিত, প্রাচীন-কালে হয়ত তাহাও কন্থা নামেই পরিচিত হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে লেপের স্বতন্ত্র নাম দেখা যায় না। অথচ যে দেশে শীতের প্রাচুর্য, তুলা সুপরিচিত এবং সুলভ, সে দেশের লোক লেপের ব্যবহার জানিত না, এইরূপ কল্পনাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান কালে মুর্শিদাবাদের বালাপোশ যেমন নানা দেশে সুপরিচিত; পূর্বকালে সম্ভবতঃ শীত নিবারক এই শ্রেণীর যাবতীয় সূচিবিদ্ধ জিনিসই কন্থা নামে অভিহিত হইয়া শিল্পের নৈপুণ্যবশতঃ নিজের উদ্ভাবক দেশকে সভ্য সমাজে সুপরিচিত করিয়াছিল। মহর্ষি হারীতের একটি বচনেও শীতনিবারণে কন্থার বিশেষ উপযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—'গৃহাশ্রম ছাড়িয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময়ে কোনও ভোগপোকরণ গ্রহণ করিবে না। কেবল আচ্ছাদনার্থ কৌপীন, শীত-নিবারিণী কন্থা এবং পাদুকা এই কয়টি বস্তুর সংগ্রহ করিবে।'[৪৪]

৪৩ শোভনঃ শমঃ সুশমঃ তস্যাপত্যং সৌশমিঃ তৎকল্পিতা কন্থা, সৌশমিকন্থ শব্দেনোচ্যতে।

৪৪ কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে বাপি গৃহ্ণীয়াৎ কুর্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥ —হারীতসংহিতা, ৫৩

কুথ

কুথ নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার আস্তরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আস্তরণ হস্তীর পৃষ্ঠে ব্যবহৃত হইত। অমরকোষে ইহা (হস্তীর) আস্তরণ পর্যায়েই পঠিত হইয়াছে।[৪৫] 'নানার্থধ্বনিমঞ্জরী' নামক অর্বাচীন কোষে 'কুথ' করিকম্বল নামে অভিহিত হইয়াছে।[৪৬] মেদিনীকোষের মতে 'কুথ' শব্দের অর্থ বর্ণকম্বল (চিত্র-কম্বল)।[৪৭] শিশুপালবধে নারদের গাত্রস্থিত বিচিত্র মৃগচর্ম ঐরাবতের আস্তরণ-কুথের সহিত তুলিত হইয়াছে।[৪৮] এই সকল প্রমাণানুসারে বুঝা যায় 'কুথ' নানাবর্ণে রঞ্জিত কম্বলজাতীয় আস্তরণ, ইহা সাধারণতঃ হস্তীর পৃষ্ঠেই ব্যবহৃত হইত, বর্তমান সময়ে হস্তীর পৃষ্ঠে দৃশ্যমান 'ঝুল' নামক আস্তরণে নানাবর্ণের সমাবেশ এবং শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহাতে সর্বত্র কম্বল-জাতীয়তা দেখা যায় না। তাহাতে বোধ হয়, আধুনিক শিল্পীগণ কেবল নানা বর্ণের সমাবেশ বিষয়েই প্রাচীনের অনুকরণ করিয়াছে। এই 'কুথ' পূর্বকালে বিশিষ্ট উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইত। সিংহলদেশের 'কুথ' জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতে তার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীস্থ ভূপতিবৃন্দ যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সিংহলদেশীয় কুথেরও উল্লেখ দেখা যায়।[৪৯] যদিও অভিধানে হস্তীপৃষ্ঠেই কুথের একচেটিয়া ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এই জিনিসটাকে প্রয়োজনান্তরে বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের তথ্য নির্ণয়ে বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ, কবি শিরোমণি বাণভট্ট আহার সময়ে চন্দ্রাপীড়ের জন্য দ্বিগুণীকৃত কুথাসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।[৫০] যদি কোষের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ স্থলের ব্যাখ্যায়

৪৫ প্রবিশ্যাস্তরণং বর্ণঃ পরিস্তোমঃ কুথোদ্বয়োঃ। —ক্ষত্রিয়বর্গ

৪৬ কুথঃ স্যাৎ করিকম্বলঃ।

৪৭ কুথঃ স্ত্রীপুংসয়োর্বর্ণকম্বলে পুংসি বর্হিষি।

৪৮ নিসর্গচিত্রোজ্জ্বল সূক্ষ্ম পক্ষ্মনা,
লসদ্বিসচ্ছেদ সিতাঙ্গ সঙ্গিনা।
চকাসতং চারুচমুরু চর্মণা
কুথেন নাগেন্দ্রমিবেন্দ্র বাহনম্॥ —১।৮

৪৯ শতশশ্চ কুথাং স্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্। —সভাপর্ব্ব, ৫৩।৩৬

৫০ আহারমণ্ডপমগচ্ছৎ। তত্রচ দ্বিগুণীকৃত কুথাসনোবিষ্টঃ···আহারবিধিমকরোৎ। —কাদম্বরী

প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে কবির অভিপ্রায় তিরোহিত হইবে। পক্ষান্তরে অপূর্ব মতের আবির্ভাব হইবে, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

নানার্থধ্বনিমঞ্জরীতে 'কুথা' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ কুথ শব্দ কন্থা অর্থে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, কন্থার প্রয়োজন (শীত নিবারণ) কুথের দ্বারাও সম্পাদিত হইত। অল্পার্থে স্ত্রীত্বনিবন্ধন কুথ হইতে কুথার আবির্ভাব হইতে পারে ; তবেই দেখা যাইতেছে, যে জিনিস হাতির পৃষ্ঠে শোভা পাইত, তাহাই কালান্তরে বা দেশান্তরে— ভোজনাসনে এবং শীতনিবারণেও অধিকার লাভ করিয়াছিল। বর্তমানেও দেখা যায়, শীতকালে যানারূঢ় শ্বেতাঙ্গদিগের চরণাচ্ছাদনে ব্যবহৃত 'রাগ্' কৃষ্ণাঙ্গের শীতনিবারণে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

—

পাণ্ডু-কম্বল

পাণ্ডু-কম্বল নামক আর এক প্রকার রাজাস্তরণ কম্বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডু-কম্বলের দ্বারা আবৃত রথ পাণ্ডুকম্বলী নামে অভিহিত হইত। পাণিনি ব্যাকরণে ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় : 'পাণ্ডুকম্বলাদিনি' (পা. ৪।২।১২)। এই পাণ্ডু-কম্বল শব্দ যে রাজাস্তরণ বর্ণকম্বল অর্থাৎ চিত্রকম্বল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কাশিকা-বৃত্তি-কার তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 'পাণ্ডুকম্বলশব্দো রাজাস্তরণস্য বর্ণকম্বলস্য বাচকঃ'।

—

পটমণ্ডপ

পটমণ্ডপ বা বস্ত্রগৃহ, যাহা বর্তমান কালে তাঁবু নামে পরিচিত, তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সকল জিনিস অর্বাচীন, তাহার নাম প্রায় যোগার্থের অনুসরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মশারির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ প্রাচীন সাহিত্যে মশারির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত মশকনিবারণে ধূমপ্রয়োগের নিদর্শন ব্যাকরণাদিতে প্রসিদ্ধ ('মশকার্থোহয়ং ধূমঃ')।

পটমণ্ডপের যদিও 'বস্ত্র-বেশ্ম' 'বস্ত্রগৃহ' প্রভৃতি যৌগিক নাম দেখা যায়, তথাপি ইহার 'দূষ্য' নামটি খাঁটি রূঢ় তালিকায় গণ্য হইবে। অমরসিংহ ইহার অর্থনির্ণয়ে বলিয়াছেন—'দূষ্যাদ্যং বস্ত্রবেশ্মনি'।

যে কালে যাযাবর শ্রেণীর গৃহস্থের পরিচয় পাওয়া যায়,[৫১] সে কালে পটমণ্ডপের উদ্ভাবন সহজেই অনুমেয়। কারণ, যাযাবরদিগের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। অদ্যাপি যাযাবরদিগকে পুত্রকলত্রাদি সহ পটমণ্ডপেই জীবনযাপন করিতে দেখা যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের ব্যবহারে নিযুক্ত পটমণ্ডপে বায়ু-সঞ্চালনার্থ কাণ্ডপট সন্নিবেশিত হইত। শিশুপালবধে তাহার নিদর্শন দেখা যায়। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে প্রস্থিত কৃষ্ণের সহযাত্রী রাজদারগণ, পথিমধ্যে 'কাণ্ডপটে'র অবকাশে (ফাঁকে) সঞ্চারী মন্দ বায়ুর দ্বারা শ্রমজনিত স্বেদজল নিবৃত্ত হইলে বস্ত্রগৃহমধ্যে সহজ দূর্বাস্তরণে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াছিলেন।[৫২] মল্লিনাথ 'কাণ্ডপটক' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন—'দূষ্যাধোলম্বী বায়ুসঞ্চারার্থঃ পটঃ'। শিশুপালবধেই শুক্লবর্ণ[৫৩] ও তাম্রবর্ণ[৫৪] বস্ত্রে নির্মিত পটমণ্ডপের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাও যে বিলাসোপকরণের সামগ্রীর পর্যায়ে গণ্য হইত, তাহা বলা যাইতে পারে।

—

বিতান

বিতান বা চাঁদোয়ার সহিত আর্যজাতির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিলাসের উপকরণরূপে ও ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে, বিতানের ভূরি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞভূমি বিতানে পরিশোভিত হইত। অদ্যাপি বৃষোৎসর্গাদি কার্যে এই রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তান্ত্রিক উপাসনাতেও বিতানের আবশ্যকতা

৫১ দ্বিবিধো গৃহস্থো যাযাবরঃ শালীনশ্চ। —মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায় ; ১২৮ শ্লোক-টীকা। দেবল।

৫২ উৎক্ষিপ্ত কাণ্ডপটকান্তরলীয়মান-
মন্দানিল-প্রশমিতশ্রমঘর্ম-তোয়ৈঃ।
দূর্বাপ্রতান সহজাস্তরণেষু ভেজে
নিদ্রা-সুখং বসন-সদ্মসু রাজদারৈঃ॥ —৫।২২

৫৩ শুক্লাং শুকোপরচিতানি নিরন্তরাভি-
র্বেশ্মানি রশ্মিবিততানি নরাধিপানাম॥ —৫।৫২

৫৪ উন্নম্রতাম্র পটমণ্ডপমণ্ডিতং তৎ। —৫।৬৮

অনুভূত হইয়াছিল। কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আত্মস্থান, মন্ত্রদ্রব্য ও দেহ, ইহাদের শুদ্ধি না হইলে দেবতার অর্চনা হইতে পারে না। বিতান, ধূপ, দীপ, পুষ্পমালা প্রভৃতির দ্বারা শোভিত স্থানে পঞ্চবর্ণ চূর্ণের দ্বারা বিচিত্র মণ্ডল অঙ্কনের নাম স্থানশুদ্ধি।[৫৫]

বিলাসোপকরণ বিতান ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। কাদম্বরীতে বর্ণিত শূদ্রকনরপতির স্নানভূমিতে সন্নিবেশিত সিত বিতানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৬]

—

বস্ত্রের পরিধান প্রণালী

কিভাবে বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, আর্যশাস্ত্রে তাহারও একটা নিয়ম দেখা যায়। কুলবধূদিগের প্রতি উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা গুল্ফ পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন ; নাভি এবং স্তনদ্বয় সংবৃত করিবেন।[৫৭] পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পুরাকালে রমণীদিগের দুইখানি বস্ত্র ও স্বতন্ত্র অবগুণ্ঠন ধারণের ব্যবস্থা ছিল। তদনুরূপ আচরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু বাঙালী মহিলাগণ একখানা কাপড় পরিধান করিয়া থাকেন। এই একখানা কাপড় পরিধানেও নাভিস্তনাবরণ ও আগুল্ফাচ্ছাদন রূপ প্রাচীন স্মৃতিশাসনের সম্মান রক্ষিত হইতেছে। পুরুষগণের ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধানের উপদেশ আছে।[৫৮] শরীরের বামভাগে, পৃষ্ঠদেশে ও নাভিতে কচ্ছত্রয় নিহিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই নিয়মের অন্যথা হইলে বৈধকার্যে অধিকার

৫৫ আত্মস্থান-মন্ত্রদ্রব্য-দেহশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চনং কুতঃ॥ —১৬
বিতানধূপদীপাদি পুষ্পমালোপশোভিতং।
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থান শুদ্ধিরিতীরিতা॥ —১৯

৫৬ বিততসিত— বিতানাম্।

৫৭ ন নাভিং দর্শয়েৎ কুলবধূরাগুল্ফাভ্যাং বাসঃ পরিদধ্যাৎ।
ন স্তনৌ বিবৃতৌ কুর্যাৎ। —শঙ্খলিখিত আহ্নিকতত্ত্ব।

৫৮ বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ
কক্ষত্রয়মুদাহৃতম্।
এভিঃ কক্ষৈঃ পরীধত্তে
যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ॥ —আহ্নিকতত্ত্বে স্মৃতি

হয় না। প্রাচীনদিগকে এই রীতিতে কাপড় পরিধান করিতে দেখা যাইত। বর্তমান সময়ে এই রীতির অনুসরণ সর্বত্র দেখা যায় না। কেবল জ্ঞাতসারগণ বৈধকর্মের অনুষ্ঠানসময়ে ত্রিকচ্ছ রীতিতে বস্ত্র পরিধান করেন। কাছা খুলিয়া রাখা আসুরী রীতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।[৫৯] কিন্তু বর্তমানকালে যুবকদলে মুক্তকচ্ছতার ক্রমবিকাশ দেখা যাইতেছে।

বস্ত্র পরীক্ষা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে তন্ন তন্ন করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের দোষগুণ বিচার করা হইত। তিনি কৌশেয় বস্ত্রের প্রসঙ্গে প্রথমতঃ কোশকার কৃমিদিগের জাতিবিভাগ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, পত্রোর্ণা অর্থাৎ যে সকল পোকা কোশ (কোয়া) প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহারা মাগধিকা, পৌণ্ড্রকা, এবং সৌবর্ণকুড্যকা, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।[৬০] এই সকল নামের যৌগিকার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মগধ, পুণ্ড্র, ও স্বর্ণকুড্য এই তিন দেশ ইহাদের জন্মভূমি, এবং জন্মভূমির নামানুসারেই উহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাগবৃক্ষ, লিকুচবৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ ও বটবৃক্ষ, এই চারি প্রকার বৃক্ষ ইহাদের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৬১] তন্মধ্যে নাগবৃক্ষজাত কৃমি পীতবর্ণ, লিকুচবৃক্ষজাত গোধূমবর্ণ, বকুলবৃক্ষজাত শ্বেতবর্ণ এবং অবশিষ্ট (অর্থাৎ বটবৃক্ষজাত) নবনীতবর্ণ (মাখমের মত) হইয়া থাকে। এই সমস্ত কৃমির মধ্যে স্বর্ণকুড্য দেশজাত কৃমিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৬২] অতঃপর কথিত হইয়াছে যে, সুবর্ণকুড্যজ

৫৯ বিকক্ষোঽনুত্তরীয়শ্চ
নগ্নশ্চাবস্ত্র এবচ।
শ্রৌতং স্মার্তং তথা কর্ম
ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি ॥ —আহ্নিকতত্ত্বে ভৃগু
বিকক্ষ পরিধানাসংবৃতকচ্ছঃ। —রঘুনন্দন
পরিধানাদ্বহিঃ কক্ষা নিবদ্ধাহ্যাসুরী মতা। —যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

৬০ মাগধিকা, পৌণ্ড্রকা, সৌবর্ণকুড্যকা চ পত্রোর্ণা। —২।১১।৮

৬১ নাগবৃক্ষো লিকুচো বকুলো বটশ্চ যোনয়ঃ। —২।১১।৮

৬২ তাসাং সৌবর্ণকুড্যকা শ্রেষ্ঠা।

পত্রোর্ণার বর্ণনাদ্বারাই সমস্ত কৌশেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনপট্ট অর্থাৎ চীনাংশুকও ব্যাখ্যাত হইল।[৬৩] পত্রোর্ণার সমস্ত বিবরণ বলিয়া সর্বশেষে শ্রেষ্ঠ কৃমির বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, কৃমির বর্ণানুসারেই তৎকৃত তন্তুর বর্ণ ও উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়। সুতরাং সূত্রনির্মিত বস্ত্রের দোষগুণও ইহা হইতেই স্থির করা যায়। চীন-দেশজাত পট্টবস্ত্রের তথ্যও বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে হইবে। নাগবৃক্ষ নাগকেশর অথবা নাগেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। লিকুচ ডহু অর্থাৎ ডেউয়া নামে প্রসিদ্ধ। বকুল ও বট স্বনামপ্রসিদ্ধ। এই চারি জাতীয় বৃক্ষ বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। পুণ্ড্রদেশে (বগুড়া প্রদেশে) নাগবৃক্ষের প্রচুরতা অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শিল্পের উৎকর্ষভূমি সুবর্ণকুড্য কোথায়? বর্তমান কালে উহা কি নামে প্রসিদ্ধ? যুক্তিকল্পতরুতে কৌশেয় বস্ত্রের গুণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—

বেতনা গুরুতা চৈব কৌশেয়ানাং গুণ গ্রহঃ

বেতনা ও গুরুত্বই কৌশেয় বস্ত্রের গুণ জ্ঞাপক। বর্তমান সময়েও কৌশেয়বস্ত্রের গুরুত্ব গুণজ্ঞাপক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অদৃষ্টচর বেতনা শব্দের অর্থ কি? অধুনা সানা, অর্থাৎ বস্ত্রের সূতার সংখ্যাধিক্য গুণরূপে স্বীকৃত হয়। পূর্বকালের বেতনাই কি অধুনা সানা নামে পরিচিত হইয়াছে?

যুক্তিকল্পতরুতে কোশকার কৃমির অন্য প্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারি শ্রেণীতে কৃমিগুলি বিভক্ত হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে সূক্ষ্ম, ঈষৎসূক্ষ্ম, মৃদু ও স্থূল এই চারিপ্রকার তন্তু প্রসব করিয়া থাকে। যে সকল কৃমি দক্ষিণ ও পূর্ব সমুদ্রের কচ্ছপ্রদেশে অথবা বনে বাস করে, এবং অত্যন্ত শুক্লবর্ণ সূত্র প্রসব করে, সেই সমস্ত কৃমি ব্রাহ্মণ জাতীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতঃপর ক্ষত্রিয় জাতীয় কৃমির বর্ণনা থাকা সঙ্গত। কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে যে যুক্তিকল্পতরু আছে, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতীয় কৃমির বর্ণনা নাই। সম্ভবতঃ লেখক-প্রমাদে এই অংশ পুস্তকে লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহাকে আদর্শ করিয়া যে যুক্তিকল্পতরু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ক্ষত্রিয় কৃমির বর্ণনা বাদ পড়িয়াছে। তথাপি আনুমানিক ইহার কতকটা পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। সর্বত্রই ক্ষত্রিয়জাতির বর্ণনায় রক্তবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং ক্ষত্রিয়জাতীয় কৃমিজ-সূত্র রক্তবর্ণ হওয়াই সঙ্গত। বৈশ্যজাতীয় কৃমি পশ্চিম সমুদ্রের কচ্ছপ্রদেশে বনে অথবা জল-বহুল স্থানে সঞ্জাত হয়। ইহারা পীতের আভাযুক্ত শুক্লবর্ণ সূত্র প্রসব করিয়া

৬৩ তয়া কৌশেয়ং চীনপট্টাশ্চ চীনভূমিজা ব্যাখ্যাতাঃ।

থাকে। শূদ্রজাতীয় কৃমি সমস্ত সমুদ্রের কচ্ছভূমিতে বনে অথবা সাধারণ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। ইহারা নানাবর্ণ সূত্র প্রসব করিয়া থাকে। ইহাদের উৎপাদিত সূত্র গুরুত্বযুক্ত হয়, এবং ইহাদের আকৃতিও স্থূল। চতুর্বিধ কৃমি হইতে উৎপন্ন বস্ত্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। একজাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্মিত বস্ত্র উত্তম, দুই জাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্মিত মধ্যম, এবং ত্রিজাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্মিত বস্ত্র অধম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। চতুর্জাতীয় সূত্রের দ্বারা নির্মিত বস্ত্র কখনও ধারণ করিবে না। কারণ ইহাতে বস্ত্র-পরিধান-কর্তার আয়ু, কীর্তি, কুল ও বল বিনষ্ট হইয়া যায়।[৬৪]

—

ক্ষৌ ম ব স্ত্র

অর্থশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় দুকূল অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ (তৈলাক্তের মত)। পৌণ্ড্রক অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশজাত বস্ত্র শ্যামবর্ণ ও মণির মত স্নিগ্ধ। সুবর্ণকুড্যদেশজাত (সৌবর্ণকুড্য) বস্ত্র সূর্যসমানবর্ণ, ইহার বান মণিস্নিগ্ধ জলের মত, অর্থাৎ গলিত বৈদূর্যাদি মণির তুল্য চাকচিক্য যুক্ত। এই বস্ত্রের বান চতুরস্র, অর্থাৎ চতুষ্কোণ হইয়া থাকে। কতক বান ব্যামিশ্র অর্থাৎ নানারূপ হয়।

অত্রত্য বানশব্দের অভিধান সম্মত অর্থ, সীবন কর্ম। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

৬৪ কৃমিকোশ-সমুদ্ভূতং কৌশেয়মিতি গদ্যতে।
ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্‌-শূদ্রাঃ কৃময়স্তু চতুর্বিধাঃ ॥
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মৌ মৃদুস্থূলৌ তন্তবস্তু যথাক্রমম্।
যে জন্তবো দক্ষিণবপুসিন্ধুকচ্ছে বনে বা প্রসবন্তি সূক্ষ্মম্
শুক্লাতিশুক্লং প্রসবন্তি তন্তুং হত ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যতমাঃ প্রদিষ্টাঃ ॥
যে জন্তবঃ পশ্চিমসিন্ধুকচ্ছে বনেহথবাহনূপমহী-প্রদেশে
আপীতশুক্লং প্রসবন্তি তন্তুং তেহমী বিশঃ পুণ্যতমাঃ প্রদিষ্টাঃ ॥
যে জন্তবঃ সর্ব সমুদ্রকচ্ছে বনেহথ সাধারণ ভূপ্রদেশে
নানাকৃতিস্তে প্রসবন্তি তন্তুং গুরুং গরিষ্ঠাকৃতয়ো হি শূদ্রাঃ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয় বিট্‌শূদ্র-সংজ্ঞকানি যথাক্রমম্।
বস্ত্রাণি তেভ্যো জায়ন্তে যথাপূর্বং শিবানি চ ॥
একজাতিভবং বস্ত্রং উত্তমং সং প্রচক্ষতে।
দ্বিজাতি-সম্ভবং মধ্যং ত্রৈজাতমধমং বিদুঃ ॥
চতুর্জাতং হি কৌশেয়ং কদাচিদপি নাচরেৎ
চত্বারি তেষাং নশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিঃ কুলং বলম্ ॥

বানং শুক্ষফলে শুক্ষে সীবনে গমনে কটে।
জলসংপ্লুত-বাতোর্মি-সুরঙ্গ-সৌরভেষু চ ॥

সীব্‌ ধাতুর উত্তর ল্যুট্‌ প্রত্যয় যোগে সীবন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধাতুর অর্থ—'তন্তু-সন্তান'। এই তন্তু-সন্তানের অর্থ— বয়ন (বোনা) অথবা শেলাই করা, এই দুইই হইতে পারে। এই স্থলে বয়ন অর্থ গৃহীত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার বয়নেই চতুরস্র চিহ্ন প্রদর্শিত হইত। পক্ষান্তরে যদি শেলাই অর্থ গৃহীত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহাতে সূচীর দ্বারা চতুষ্কোণ প্রভৃতি বোঁটা উঠানো হইত, অথবা পাইড়ে সূচির দ্বারা চতুষ্কোণাদি কারুকার্য করা হইত।

সৌবর্ণকুড্য বস্ত্রের বয়নকার্যে একাংশুক (একখানা বস্ত্র), দ্ব্যংশুক, ত্র্যংশুক ও চতুরংশুক হইয়া থাকে। অর্থাৎ আধখানা— এবং এক, দুই, তিন, চারিখানা বস্ত্র একসঙ্গে বোনা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই কাশিক, অর্থাৎ কাশীদেশীয় এবং পৌণ্ড্রক ক্ষৌমবস্ত্রও ব্যাখ্যাত হইল;[৬৫] অর্থাৎ তাহাদের লক্ষণও সুবর্ণ-কুড্যজ ক্ষৌমবস্ত্রেরই অনুরূপ। কৌটিল্য কার্পাস বস্ত্রের গুণাগুণ সূচক লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া, সংক্ষেপতঃ কেবল কোন্‌ কোন্‌ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহার উক্তি হইতে জানা যায় যে, মধুরাদেশজ, অপরান্তদেশজ, কলিঙ্গদেশজ, কাশীদেশজ, বঙ্গদেশজ, বৎসদেশজ ও মহিষদেশজ কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস সূতার কাপড় শ্রেষ্ঠ।[৬৬] সেকালের 'মধুরা' বর্তমান সময়ে 'মথুরা' নামে পরিচিত হইয়াছে। এইস্থলে বলা আবশ্যক যে, কৌটিল্যের গ্রন্থে বস্ত্র পরীক্ষার বিবরণ জানা যায় অতএব তাঁহার সময় হইতেই এই পরীক্ষা আরব্ধ হইয়াছে, এমন বুঝিলে বড়ই ভুল করা হইবে। কারণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের উদ্‌ভাবক নহেন। তিনি কেবল বিনেয় চন্দ্রগুপ্তের জন্য প্রাচীন বিবিধ শাস্ত্র হইতে প্রমাণাবলী সংগৃহীত করিয়া সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং স্মরণাতীত কাল হইতেই এই বিদ্যা উদ্‌ভাবিত হইয়াছে, এমন বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক যে, অর্থশাস্ত্রের

৬৫ বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলং, পৌণ্ড্রকং শ্যামং মণিস্নিগ্ধং সৌবর্ণকুড্যকং সূর্যবর্ণং মণিস্নিগ্ধো-দকবানং চতুরস্রবানং ব্যামিশ্রবানং চ। এতেষামেকাংশুকমর্ধং দ্বিত্রিচতুরং শুকমিতি। তেন কাশিকং পৌণ্ড্রকং চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতং।

৬৬ মাধুরমাপরান্তকং কালিঙ্গকং কাশিকং বাঙ্গকং বাৎসকং মাহিষকং চ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠমিতি।

ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর, সাহিত্যিক সমাজে উহার বিশেষ অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু অনুবাদক মহাশয়ের অনুবাদে, মূলের অর্থ কতটুকু বিবৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি শিক্ষিতমণ্ডলীর অবধান একান্ত বাঞ্ছনীয়। ক্ষৌমবস্ত্র সম্বন্ধে তিনি মূলের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে প্রদর্শিত হইল। সুধীগণ উহা পাঠ করিয়া সারবত্তা নির্ণয় করিবেন।[৬৭]

—

জুতা

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে জুতা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ, কোন্ দেশ কতকাল হইতে জুতার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহাই সভ্যতা-লাভের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, জুতাতত্ত্ব উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

কোন্ পুরাকালে ভারতবর্ষে জুতার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই।[৬৮] ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সভ্যতা-বিকাশের প্রথম উদ্যম হইতেই তাহা প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। জুতার জন্মকথা উদ্ঘাটিত করিবার জন্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবলে একটি হাস্য-রসোদ্দীপক কবিতার অবতারণা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে জুতাকে পরম গৌরব

৬৭ From Shama Sastry's English translation. (P. 9) :

"That which is manufactured in the country, Vanga (Vangaka) is a white and soft fabric (dukula) (I) that of pandya manufacture (Paun draka) is black and as soft as the surface of a gem ; and that which is the product of the country, Suvarnakudya, is as red as the sun, as soft (2) as the surface of the gem. Woven while the threads are very wet, and of uniform (chaturasra) or mixed Texture (vyamisra vana), single, half, double, treble and quadruple garments are varieties of the same."

From the Comm. of Bhattasvamin—(1) Dukula is a fine fabric and Kshauma is a little coarse. (2) It is rubbed with a gem and smoothened while being woven.

৬৮ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৪।৪।৪) 'কার্ষ্ণী উপানহা উপমুঞ্চতি' এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জুতার ব্যবহার কত পুরাতন, ইহাতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দান করিয়াছিলেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠির (মহাভারতীয় অনুশাসন-পর্বে ৯৫ অধ্যায়ের প্রারম্ভে) ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যদিদং শ্রাদ্ধকৃত্যেষু দীয়তে ভরতর্ষভ।
ছত্রং চোপনহৌ চৈব কেনৈতৎ সম্প্রবর্তিতম্॥

এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব জমদগ্নির একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে জমদগ্নি ঊর্ধ্বদিকে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার ভার্যা রেণুকা বাণাহরণে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। সূর্যতাপতপ্তা রেণুকা বাণাহরণে অসমর্থা হইলে, কোপনস্বভাব জমদগ্নি মার্তণ্ডদেবের সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য ধনুতে বাণসংযোগ করিলেন। তখন সূর্যদেব জমদগ্নির শরণাগত হইয়া জমদগ্নিকে তাপনিবারক ছত্র ও চর্মপাদুকা প্রদান করিয়াছিলেন। দানকালে সূর্যদেব বলিয়াছিলেন—

মহর্ষে শিরস্ত্রাণং ছত্রং মদ্রশ্মিবারণং।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পদ্ভ্যাঞ্চ ত্রাণার্থং চর্মপাদুকে॥

এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা কত কাল পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই। যুধিষ্ঠিরের সময়ে লোকে ইহা বিস্মৃত হইয়াছিল, কেবল পিতামহ ভীষ্মদেবই ইহার বিষয় অবগত ছিলেন।

জুতার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পর, তাহা ভারতবর্ষে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। নগ্নপদে বিচরণ করিবার নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকারগণ জুতা পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয় অংশে ২১ অধ্যায়ে) তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ।

কালক্রমে জুতার ব্যবহার এত প্রবল হইয়াছিল যে, উপনয়নের পর এবং সমাবর্তনের পূর্বে (ব্রহ্মচর্যাবস্থায়) জুতা ব্যবহৃত হইবে কি না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-শাসনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। গোভিলগৃহ্যসূত্রে (তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের ২৬ সূত্রে) দেখিতে পাওয়া যায়—

অন্তর্গ্রাম উপানহোর্ধারণম্।

ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মাবর্যাবস্থায় ব্রহ্মচারী যে গ্রামে বাস করেন, কেবল সেই গ্রামের মধ্যে বিচরণ করিবার সময়েই জুতা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মচর্যাবস্থাতেও অন্যত্র বিচরণ করিবার

সময়ে জুতার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল না। তবে নিজেরই হউক, আর অপরেরই হউক, জুতা অস্পৃশ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল। কাহারও ব্যবহার্য জুতাই হাতে করিয়া বহন করিবার রীতি ছিল না। গোভিলগৃহ্যসূত্রে (তৃতীয় প্রপাঠকের ৫ খণ্ডের ২২ সূত্রে) তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

নোপানহৌ স্বয়ং হরেৎ।

ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত হইলে, সমাবর্তন করিবার সময়ে উপানৎ ধারণ করিবার মন্ত্র অদ্যাপি সুপরিচিত আছে। পারস্করগৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রটি উল্লিখিত আছে—

প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতম্।

হলায়ুধ (ব্রাহ্মণসর্বস্বে) ইহার ব্যাখ্যা করিবার সময়ে জুতামাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকায় তদীয় পাণ্ডিত্য অভ্রান্তরূপে ব্যক্ত হইতেছে। যথা—'হে উপানহৌ যুবাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ। উপক্রান্ত-গতি-ক্রিয়ায়া অত্যাগঃ প্রতিষ্ঠা; তন্নিমিত্তত্বাৎ যুবামেব প্রতিষ্ঠে স্থো ভবতঃ। ততো মা মাং পাতং রক্ষতম্। কুতঃ? বিশ্বতঃ সর্বস্মাৎ গতিবিরোধিনঃ কণ্টকাদেঃ।'

ইহার অর্থ এই যে—'হে জুতাযুগল! তোমরা প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। আরব্ধ গতিক্রিয়ার অত্যাগের নাম প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বলিয়া তোমাদের নাম প্রতিষ্ঠা, অতএব তোমরা গতিবিরোধী কণ্টকাদি হইতে আমাকে রক্ষা কর।'

জুতা এইরূপে মন্ত্রমধ্যে স্থান লাভ করিয়াও সর্বত্র অব্যাহত গতি লাভ করিতে পারে নাই। সর্বদা জুতা পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবার নিয়ম ছিল না। তাহা সদাচারবিরোধী বলিয়া, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রশাসন প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও জুতা ত্যাগ করিয়া দেবতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহপুরাণের বচনে জানিতে পারা যায়, জুতা পরিধান করিয়া ভগবৎসমীপে গমন করিলে ত্রয়োদশ বর্ষ চর্মকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যথা—

বহন্নুপানহৌ পদ্ভ্যাং য স্তু মামুপচংক্রমেৎ।
চর্মকারস্ত জায়েত বর্ষাণাস্তু ত্রয়োদশ॥

তথাপি সকল শ্রেণীর জুতার পক্ষে এরূপ কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এক শ্রেণীর জুতা পরিধান করিয়া আচমন পর্যন্ত চলিতে পারিত; দেবতার, গুরুজনের ও রাজার সমীপবর্তী হইবারও বাধা ছিল না। ভট্টভায়ধৃত স্মৃতিবচনে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

রাজ্ঞাং গুরূণাং দেবানাং ন দুয়েদন্তিকে চরন্।
আজানুপত্রচরণস্তথাচমনকর্মণি॥

ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির জুতা যেমন একালের সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে, সেকালেও সেইরূপ ছিল বলিয়াই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর জুতার মধ্যে 'আজানুপত্রচরণ' নামক জুতার সম্মান সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। নচেৎ এরূপ স্মৃতি প্রচলিত হইতে পারিত না।

কিরূপ প্রয়োজনে কোন্ কোন্ কার্যে জুতা ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইবার কারণ ছিল না। তজ্জন্য তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কিরূপ প্রয়োজনে কোন্ কোন্ কার্যে, জুতা ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ন সোপানৎকো মূত্র-পুরীষে কুর্যাৎ॥ —আপস্তম্ব

যোভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যশ্চভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানোৎকশ্চ যোভুঙ্‌ক্তে সর্বং বিদ্যাৎ তদাসুরম্। —কূর্মপুরাণ

উপানদ্‌গূঢ়পাদো বা যানশয্যাগতস্তথা।
প্রসার্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এববা॥ —তন্ত্রান্তরতন্ত্র

সেকালে অন্যের জুতা কোনও প্রকারে আত্মসাৎ করিবার প্রলোভন ছিল না। কারণ, অন্যের ব্যবহৃত জুতা ও বস্ত্র ব্যবহার করিবার পক্ষে নিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্য সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল। যথা—

উপানহৌচ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্নধারয়েৎ। —মনু ৪।৬৬

জুতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, শিল্পশাস্ত্রে (বিশ্বকর্মপ্রকাশ, ৪০০-১ সূত্রে) কেবল দুই শ্রেণীর জুতারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর নাম 'পাদুকা', অপর শ্রেণীর নাম 'উপানহ্'। যথা—

উপানহৌ প্রকর্তব্যৌ স্বপাদপ্রমিতৌ তথা।
পাদুকেচ যথাকার্যে অন্যথা দুঃখ-শোকদৌ॥'

অতি পুরাকালে সাহিত্যে 'পাদুকা' শব্দের অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরকালে 'পাদুকা' ও 'উপানহ্' তুল্যার্থে প্রযুক্ত হইত বলিয়াই অমরসিংহ (অমরকোষ, শূদ্রবর্গ, ৮০) এই দুইটি শব্দকে একই পর্যায়ের অন্তর্গত করিয়া থাকিবেন।

'পাদুকা' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, চটিজুতা ও খড়ম। সুতরাং সকল

'পাদুকা'কে উপানৎ বলা যাইতে পারে না। এক শ্রেণীর পাদুকার নাম 'গুরুপাদুকা'— তাহা পাদুকা নহে; 'পাদুকাপ্রতিমা' মাত্র। মণি রত্ন স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, এবং চন্দন দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ 'গুরুপাদুকা' নির্মাণে ব্যবহৃত হইবার নিয়ম আছে। যথা—

মণিরত্নময়ীকার্যা হেম-রূপ্যময়ী পিবা।
চন্দনেনাপি কর্তব্যা পাদুকাপ্রতিমা পিবা।
শ্রীপর্ণা শ্রীক্রমা বাপি দেবদারুময়ী পিবা।
ষড়ঙ্গুলাচ সা কার্যা পাদুকে পূজয়েৎ সদা॥ —দেবীপুরাণ

পদদ্বয়ে ব্যবহার করিবার জন্য যে 'পাদুকা' নির্মিত হইত, তাহা অবশ্যই চরণযুগলের পরিমাণ অনুসারেই নির্মিত হইত।

পাদুকার ন্যায় উপানহেরও প্রকারভেদ ছিল। যাহার দ্বারা পদ 'উপনদ্ধ' (সর্বতোভাবে আবৃত) হয়, (উপ+নহ+ক্বিপ্), তাহারই নাম 'উপানহ্'। সুতরাং তাহা চটিজুতা বা খড়ম হইতে পৃথক্ পদার্থ। তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম 'অনুপদীনা', অপর শ্রেণীর নাম 'আজানুপত্রচরণ'।

অনুপদসর্বান্নায়ানয়ং বদ্ধা ভক্ষয়তি নেয়েষু॥

এই পাণিনিসূত্রে (৫।২।৯) অনুপদীনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশিকাবৃত্তিতে ইহা 'অনু রায়ামে সাদৃশ্যে বা অনুপদং বদ্ধা অনুপদীনা উপানৎ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহা আয়তনে বা সাদৃশ্যে পদের অনুরূপ, সেইরূপ সমস্তপদাবরণকারক জুতার নাম অনুপদীনা; তাহা একালের 'লপেটা' জুতার স্থলাভিষিক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। 'আজানুপত্রচরণ' জানুপর্যন্ত আবরণকারী বুটজুতা।

ঋষভোপানহোর্ঞ্যঃ।

এই পাণিনিসূত্রের (৫।১।১৪) ব্যাখ্যায়, কাশিকাবৃত্তিতে চর্ম ও মুঞ্জ (এক শ্রেণীর তৃণ) উপানহের উপাদানরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মুঞ্জনির্মিত জুতাই হয়ত এক সময়ে 'মোজা' নামে পরিচিত ছিল। উচ্চারণগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে বলিতে হইবে, অনুপদীনা প্রভৃতি উপানহ্, মুঞ্জদ্বারা নির্মিত হইত বলিয়াই 'মোজা' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ভরত মল্লিক লিখিয়া গিয়াছেন— "সৈব উপানৎ পদায়তা পাদায়াম-প্রমাণা চেৎ অনুপদীনা মোজা খ্যাতা স্যাৎ। গুল্ফাদিসহিতমশেষপদং অনুপদং সাকল্যে অব্যয়ীভাবঃ'।

সুপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় (ইন্দো এরিয়ান্ গ্রন্থের প্রথম

ভাগের ২২৬ পৃষ্ঠায়) ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, 'বর্তমান কালের পণ্ডিতগণ মোজা (স্টকিং) অনুপদীনার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।' ডাক্তার মহোদয়ের মতে 'মোজা' শব্দটি পারসীক ভাষা হইতে গৃহীত। কিন্তু মুঞ্জের সহিত উপানহের চিরপুরাতন সম্পর্ক স্মরণ থাকিলে মনে হয়, কালক্রমে অনুপদীনা জুতাই ভারতবর্ষে 'মোজা' নাম লাভ করিয়াছিল; 'মোজা' শব্দ পারসীক ভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই। সন্ন্যাসিগণের ব্যবহার্য জুতা নারিকেল-তন্তুদ্বারা নির্মিত হইত, তাহার পরিচয় কাদম্বরীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

বিশাখিকা শিখরনিবদ্ধনারিকেলফলবল্কলময়ধৌতোপানদ্ যুগোপেতাম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে দেবলোক (সূর্যলোক) হইতেই মর্ত্যলোকে জুতার ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং দেবলোকে (নিতান্ত পক্ষে সূর্যলোকে) জুতার ব্যবহার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও সূর্যমূর্তির পদযুগলে জুতা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্যপদযুগল যে জুতাদ্বারা আবৃত করিতে হইবে, এরূপ কোন বচন দেখিতে না পাইলেও, অসংখ্য প্রস্তরমূর্তিতে তাহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'সূর্যপদে উপানৎ' প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৬শ ভাগের ১৮৫ পৃষ্ঠায়) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সূর্যমূর্তির পদযুগলের আবরণ পদার্থ জুতা কিনা, তদ্বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে সংগৃহীত সূর্যমূর্তির পদযুগলে যে আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে বুট জুতা ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যত্নে বরেন্দ্রভূমির নানাস্থান হইতে সংগৃহীত সূর্যমূর্তিনিচয়ের পদযুগলে যে সকল জুতা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাঁচটি চিত্র প্রদর্শিত হইল। সেকালের ভাস্কর্যে নানাশ্রেণীর জুতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাকে জুতা ভিন্ন আর কিছু মনে করিয়া সংশয়াপন্ন হইবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্তিকেয়ের জুতা এখনও সর্বত্র সুপরিচিত। পাদুকা সংযোগে দেবমূর্তি সুসজ্জিত করিবার প্রথা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত একটি ধ্যানে পাদুকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বর-পঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্বহুরূপাভিরাবৃতাম্॥
শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিকভূষণাম্।
রত্নপাদুকয়োর্ণ্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ॥

গ্রীক্‌সেনা ভারতসীমায় উপনীত হইবার সময় হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচিত হইবার কথা প্রবর্তিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষের লোকে গ্রীক্‌দিগের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে নানাবিষয়ে সভ্যতালাভের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু জুতা সম্বন্ধে এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপায় নাই। গ্রীক্‌গণ ভারতসীমায় পদার্পণ করিয়া ভারতবর্ষের জুতার পরিচয় স্বদেশেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এরিয়ানের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে ভারতবর্ষের কারুকার্যখচিত জুতা শিল্পগৌরবে উল্লেখযোগ্য না হইলে, তাহা এরূপভাবে বিদেশের লেখকের গ্রন্থে স্থানলাভ করিতে পারিত না। তাহা গ্রীক্‌দিগের অনুকরণলব্ধ হইলে, সে কথাও উল্লিখিত হইত।

—

ছাতা

মহাভারতের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে জানা যায়— জুতার ন্যায় ছাতাও সূর্যলোক হইতেই মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রখর সূর্য-কিরণে মানবদেহ উত্তপ্ত হয়, এবং সূর্যপ্রভব-বৃষ্টিধারায় মানবদেহ ভিজিয়া যায়; সুতরাং এইরূপ গ্লানিপ্রতিষেধক ছাতার আবির্ভাব জগৎপূজ্য সূর্যঠাকুর হইতে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। 'শ্রূয়তেহি পুরালোকে বিষস্থ বিষমৌষধম্'।

ছাতা প্রথমতঃ কেবল রৌদ্র-বৃষ্টির উৎপীড়ন হইতে দেহরক্ষার্থই উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কালক্রমে তাহা (সভ্যতার নিদর্শন রূপে) শিল্পোৎকর্ষের সমুন্নত স্থানও অধিকার করিয়াছিল। ভোজরাজের 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে দুই শ্রেণীর ছাতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৬৯] ছাতা দুই প্রকার— 'সামান্য' ও 'বিশেষ'। তন্মধ্যে রাজার ছাতা 'বিশেষ' ছাতা, অন্যের ছাতা 'সামান্য' ছাতা। সেই বিশেষ ছাতা আবার 'সদণ্ড' ও 'নির্দণ্ড' ভেদে দুই প্রকার।[৭০] 'নির্দণ্ডের আকুঞ্চন-প্রসারণ হইত না; তাহা বোধ হয় সেকালেও আধুনিক কৃষক সমাজে সুপরিচিত

৬৯ বিশেষশ্চাথ সামান্যং ছত্রস্য দ্বিবিধা ভিদা।
রাজ্ঞশ্ছত্রং বিশেষাখ্যং সামান্যঞ্চান্যদুচ্যতে॥

৭০ সদণ্ডঞ্চাথ নির্দণ্ডং তজ্‌জ্ঞেয়ং দ্বিবিধং পুনঃ।
সদণ্ডং তত্র বিজ্ঞেয়ং সারণাকুঞ্চনাত্মকং॥

মাথাইলের মত দণ্ডহীন মস্তকাবরণরূপেই ব্যবহৃত হইত। 'সদণ্ড' ছাতা প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করা যাইত। তাহা সভ্য সমাজে ব্যবহৃত আধুনিক ছাতার অনুরূপ ছিল বলিয়াই বোধ হয়। যে দেশে কোনও পদার্থই যুগধর্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, সে দেশে এই অচেতন ছাতা-বেচারীও যুগধর্মের নিয়ম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই; তাহার দণ্ড প্রভৃতি অবয়বগুলি যুগানুসারে ক্রমে হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে।[৭১] যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিযুগে যথাক্রমে ছাতার দণ্ড দশ হইতে আট, আট হইতে ছয়, এবং ছয় হইতে চারি হাতে পরিণত হইয়াছিল। ছাতাকে 'ষড়ঙ্গ' বলা যাইতে পারে। কারণ, (যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে) তাহারও দণ্ড, কন্দ, শলাকা, রজ্জু, বস্ত্র ও কীলক নামক ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৭২] দণ্ডের ন্যায় কন্দের পরিমাণও যুগানুসারে ছয়, পাঁচ, চার, ও তিন বিতস্তিতে পর্যবসিত হইয়াছিল, এবং শলাকার সংখ্যাও যুগধর্মের মাহাত্ম্যরক্ষার্থ যথাক্রমে একশত, অশীতি, ষাট ও চল্লিশ হইয়াছিল।[৭৩] শলাকার পরিমাণ ছয়, পাঁচ, চার ও তিন হাত। ইহাতেও যুগধর্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। নয় তন্তুতে এক-সূত্র, নয় সূত্রে এক গুণ, নয় গুণে এক পাশ, নয় পাশে এক রশ্মি। রজ্জু-পরিমাণও যুগানুসারে নয়, আট, সাত ও ছয় রশ্মি করিবার বিধান আছে।[৭৪] বস্ত্রের পরিমাণ শলাকা অপেক্ষা দ্বিগুণ।[৭৫] কীলকের পরিমাণ যুগানুসারে বার, দশ, আট, ও ছয় অঙ্গুলি।[৭৬]

রাজার ছাতা অপেক্ষা যুবরাজের ছাতা পরিমাণে এক চতুর্থাংশ হীন হইত; এবং অন্যান্যের ছাতার পরিমাণ যুবরাজের ছাতার পরিমাণের অর্ধ হইত।[৭৭]

এইরূপে নিয়মবদ্ধ বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,

৭১ দিগষ্ট-ষট্-চতুর্হস্তদীর্ঘো দণ্ডো যুগক্রমাৎ।

৭২ দণ্ডঃ কন্দঃ শলাকাশ্চরজ্জুর্বস্ত্রঞ্চ কীলকং।
ষড়্‌ভিরেতৈঃ সুসম্লিষ্টৈশ্ছত্রমিত্যভিধীয়তে।

৭৩ শতাস্যশীতিঃ ষষ্টিশ্চ চত্বারিংশদনুক্রমাৎ।

৭৪ নবভিস্তন্তুভিঃ সূত্রং সূত্রৈ স্তৈর্নভভির্গুণঃ।
গুণৈস্তন্নবভিঃ পাশো রশ্মিস্তৈর্নবভির্ভবেৎ।
নবাষ্ট-সপ্ত-ষট্-সংখ্যো রশ্মিভীরজ্জবঃ ক্রমাৎ॥

৭৫ বস্ত্রং শলাকাদ্বিগুণ মায়ামেন প্রতিষ্ঠিতম্।

৭৬ ভানু-দিগ্-গ্রহবসুভিরঙ্গুলীভিশ্চ কীলকঃ।

৭৭ যন্মাং যন্মামনূদিতং তদ্রাজ্ঞামেব ভূতয়ে।
পাদোনং যুবরাজস্য অন্যেষাস্তু তদর্ধতঃ।

সেকালে ছাতার ব্যবহারও রাজশাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল ; ছাতা দেখিয়াই রাজা, যুবরাজ ও সাধারণ লোক অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যাইত।

রাজাদিগের বিবিধ প্রকার ছাতা ছিল ; এবং কার্যবিশেষে তাহা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইত। এই সকল ছাতার উপাদান ও উপাদানের বর্ণ ভিন্ন প্রকার হইবার রীতি ছিল। রাজাদিগের 'প্রসাদচিহ্ন' ছত্রে বিশুদ্ধ বাঁশের শলাকা ও বিশুদ্ধ কাঠের দণ্ড ব্যবহৃত হইত; এই ছাতার রজ্জু ও বস্ত্র রক্তবর্ণ হইবার নিয়ম ছিল।[৭৮] রাজাদিগের এক প্রকার মনোরম ছত্রে চন্দনকাষ্ঠের দণ্ড ও কন্দের ব্যবহার ছিল ; তাহার রজ্জু ও বস্ত্র শুক্লবর্ণ হইত, এবং সেই ছাতার উপরি-ভাগে স্বর্ণকুম্ভ সংযুক্ত হইত।[৭৯] 'কনকদণ্ড' নামক সর্বার্থসাধক আর এক শ্রেণীর ছাতায় শুক্লবর্ণ রজ্জু ও বস্ত্র ব্যবহৃত হইত ; এবং উপরিভাগে স্বর্ণকুম্ভ সংযুক্ত হইত।

অভিষেক কালে ও বিবাহ সময়ে ব্যবহার্য ছাতায় সমধিক জাঁক জমকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রেণীর ছাতার দণ্ড প্রভৃতি অবয়বগুলি বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হইত, এবং বস্ত্রের ও রজ্জুর বর্ণ শুক্লেতর হইত।[৮০] এই ছাতার উপরিভাগে কুম্ভ, হংস অথবা চামর প্রভৃতি চিহ্নস্বরূপ নিহিত হইত।

কুম্ভ-চিহ্নিত অথবা হংস-চিহ্নিত ছত্র (নয়টি রত্নে ও বত্রিশটি মুক্তায় গ্রথিত) বত্রিশটি মালায় খচিত হইত ; সকলের উপরিভাগে ব্রহ্মজাতীয় বিশুদ্ধ হীরক এবং দণ্ডের মূল ভাগে 'কুরুবিন্দ' এবং পদ্মরাগমণি বিন্যস্ত হইত।[৮১] চামর-চিহ্নিত ছাতার চামর শুভ্রবর্ণ এবং ছত্রস্বামীর হাতের এক হাত পরিমাণ হইত।[৮২]

'নবদণ্ড'-সংজ্ঞক এইরূপ ছাতার ব্যবহারে (অভিষেক কার্যে ও বিবাহে)

৭৮ বিশুদ্ধকাষ্ঠস্য তু দণ্ডকন্দৌ তথা শলাকা অপি শুদ্ধবংশজাঃ।
রজ্জুশ্চ রক্তা বসনঞ্চ রক্তং ছত্রং প্রসাদং নৃপতের্বদন্তি॥

৭৯ চান্দনৌ দণ্ড-কন্দৌ চেৎ সুশুক্লে রজ্জু-বাসসী।
ছত্রং মনোহরং রাজ্ঞাং স্বর্ণকুম্ভেন শোভিতম্॥

৮০ দণ্ড-কন্দ-শলাকাশ্চ শুদ্ধস্বর্ণেন নির্মিতাঃ।
কীলকং স্বর্ণঘটিতমশুক্লে রজ্জু-বাসসী॥

৮১ কুম্ভাদি রথ হংসাদিশ্চামরাদির্যথাক্রমম্।
কুম্ভাদ্যা বথ হংসাদৌ নবরত্নানি রক্ষয়েৎ।
দ্বাত্রিংশন্মৌক্তিকী মালা দ্বাত্রিংশত্তত্র দাপয়েৎ।
সর্বোপরি ব্রহ্মজাতিঃ বিশুদ্ধং হীরকং ন্যসেৎ।
দণ্ডান্তে কুরুবিন্দাংশ্চ পদ্মরাগাংশ্চ বিন্যসেৎ।

৮২ স্বামিহস্তৈকমানেন চামরঃ সিত ইষ্যতে।

গ্রহগণ প্রীতিযুক্ত হইতেন।[৮৩] যুবরাজদিগের 'প্রতাপ' নামক ছাতায় নীলবর্ণ বস্ত্র ও দণ্ড ব্যবহৃত হইত, এবং উপরিভাগ স্বর্ণকুম্ভযুক্ত হইবার রীতি ছিল।

এই সকল প্রমাণানুসারে ছাতার শলাকার সংখ্যা ও বস্ত্রের বর্ণ বিভিন্ন হইবার নিয়ম থাকিলেও নানাগ্রন্থে শতশলাকাযুক্ত ও শুভ্রবর্ণ ছত্রেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামের ছাতা না দেখিয়া কৌশল্যা (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২০ সর্গ) বলিয়াছিলেন—

নতে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ।
আবৃতং বদনং বল্গু ছত্রেণাভিবিরাজতে॥

রাবণের শতশলাকাযুক্ত ছত্রের উল্লেখ আছে।[৮৪] রঘুবংশে চন্দ্রের মত শুভ্র-বর্ণ ছত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৮৫] নৈষধচরিত ও শিশুপালবধেও শুভ্র-বর্ণ ছত্রের উল্লেখ আছে।[৮৬] কাদম্বরীতে চন্দ্রাপীড়ের ছাতা অত্যন্ত শুভ্র ও শতশলাকাযুক্ত, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।[৮৭]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শুম্ভাসুরের একটি কাঞ্চনস্রাবী ছত্রের উল্লেখ আছে।[৮৮] 'কাঞ্চনস্রাবী' শব্দটি শুনিয়া, মদস্রাবী বারণের কথা মনে পড়িতে পারে। বারণের যেমন মদজলের স্রাব হয়, সেইরূপ বরুণ দেবতার ছাতা হইতেও কি দ্রবীভূত কাঞ্চনের স্রাব বা বর্ষণ হইত ? একটু প্রণিধান সহকারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়— 'কাঞ্চনস্রাবী' শব্দে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কৌশলে সোনার কারুকার্য বিন্যস্ত হইয়াছিল যে, দেখিবামাত্র দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইত, এবং বোধ হইত, যেন ছাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া স্বর্ণবর্ণ সলিলধারা ধরণীতলে পতিত হইতেছে।

বাজপেয়ী ব্রাহ্মণদিগের বাজপেয়-যজ্ঞে ব্যবহার্থ একপ্রকার ছাতা নির্দিষ্ট

৮৩ ইত্যয়ং নবদণ্ডাখ্যশ্ছত্ররাজো মহীভৃতাম্।
অভিষেকে বিবাহেচ গ্রহাণাং প্রীতিবর্ধনঃ।

৮৪ ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমালোপশোভিতম্।

৮৫ শশিপ্রভচ্ছত্রমুভে চ চামরে।

৮৬ নলঃ সিতচ্ছত্রিত-কীর্তিমণ্ডলঃ।
বিকসৎকলায়কুসুমাসিতদ্যুতেরলঘূড়ু-পাণ্ডু জগতামধিশিতুঃ।
যমুনাহ্রদোপরিগহংসমণ্ডলদ্যুতিজিষ্ণু জিষ্ণুরভূতোষ্ণবারণম্॥

৮৭ অচলরেচকচক্রীকৃতক্ষীরোদাবর্তপাণ্ডুরেণ দশবদনবাহুদণ্ডাবস্থিতকৈলাসকান্তিনা মুক্তাফলজালিনা শতশলাকেন আতপত্রেণ নিরাজমানা।

৮৮ ছত্রংতে বারুণংগেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।

হইয়াছিল, রামায়ণে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বনবাসে প্রস্থিত রামচন্দ্রের অনুগমনকামী ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, আমাদিগের পশ্চাদ্বর্তী বাজপেয়-সমুত্থ (অর্থাৎ বাজপেয়-যজ্ঞে ব্যবহার্য) জলরহিত মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছত্র দর্শন কর, আমরা এই ছত্রদ্বারা তোমার ছায়া বিধান করিব।[৮৯]

কাদম্বরী পাঠে জানা যায়, পূর্বকালে রমণীদিগের মস্তকেও ছত্র ধরিবার রীতি ছিল; এবং ভদ্রমহিলাদিগের নির্দিষ্ট 'ছত্রধারিণী' ছিল। আত্মবৃত্তান্তকথনসময়ে মহাশ্বেতা বলিয়াছিলেন, 'ইত্থম্ভূতে চ ব্যতিকরে ছত্রগ্রাহিণী মামবোচৎ।'

সিদ্ধান্তসংগ্রহোক্ত শ্রীবিদ্যার ধ্যানে ছত্রের উল্লেখ আছে—

কল্পবৃক্ষে গিরেঃ পার্শ্বে ছত্রং তন্মণ্ডলোপরি।

মেরুতন্ত্রোক্ত গঙ্গার ধ্যানে শ্বেতছত্রের উল্লেখ আছে—

চামরৈর্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্।

গৃহদেবতা শালগ্রামচক্রের স্বর্ণ-রজতাদি-নির্মিত ছত্র এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত।

ছত্রের উৎপত্তি ও নির্মাণপ্রণালী যেরূপ হউক না কেন, উহা রাজশক্তির প্রধান চিহ্নরূপে পরিচিত হইয়াছিল; এবং রাজসম্মান যখন চতুর্দিকে সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তখন তাহা 'একচ্ছত্র'-শাসন নামে মর্যাদা লাভ করিত। এক সময়ে গৌড়েশ্বরগণও এইরূপ 'একচ্ছত্র-শাসন' সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল-নরপালগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, মহা-রাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের ভ্রাতা বাক্‌পাল দিক্‌সকলকে শত্রুপতাকিনীশূন্য করিয়া দশদিক্ একাতপত্রা করিয়াছিলেন। যথা—

রামস্যেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্ নয়-বিক্রমৈকবসতিঃ ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ॥

এখন সে দিন নাই। এখনকার সাহিত্য পর্যন্ত 'ছত্রভঙ্গ'! বোধ হয়, আধুনিক রচনাসৌন্দর্যের অভিরুচি ছত্রের ন্যায় কদাকার পদার্থকে সাহিত্যসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অল্পদিন পূর্বেও ছত্রের ও ছত্রধারের বর্ণনা

৮৯ বাজপেয়সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রয়াতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বৈশ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ। —রামায়ণ, অযোধ্যা, ৪৫।২৩

পরিত্যাগ করিলে রাজসভার বর্ণনা সম্পূর্ণতা লাভ করিত না। প্রমাণ, মেঘনাদ-বধ কাব্য। সেকালে ছত্রধারের মর্যাদা নিতান্ত অল্প ছিল না। পঞ্চতন্ত্রে (৩।৬৭) দেখিতে পাওয়া যায়, ছত্রধারও একজন উল্লেখযোগ্য রাজ কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ছত্রের ব্যবহার যে কেবল ঐহিক সুখের সম্পাদক, তাহা নহে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে[৯০] ও বিবিধ ব্রতাদিকর্মের অঙ্গরূপে[৯১] ছত্রদান-বিধায়ক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্গাপূজার সময়ে দেবীর উদ্দেশে ছত্রদানের বিধান ও তাঁহার মন্ত্র 'পদ্ধতি'তে উক্ত হইয়াছে।[৯২] সেকালের ছত্র কিরূপ ছিল ভাস্কর্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন বর্তমান আছে। যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরে প্রস্তরশিল্পনিদর্শনের মধ্যে যে সকল ছত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তদবলম্বনে দুইটি চিত্র সংযুক্ত হইল। প্রথম চিত্রে ছত্রের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে নিম্ন হইতে যথাক্রমে দণ্ড, কন্দ, বস্ত্র ও শলাকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেকালের দেবমূর্তির মস্তকেও ছত্র সংযুক্ত হইত। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক এইরূপ একটি ধাতুময়ী শ্রীমূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে।

বৃহৎসংহিতায় নৃপতি প্রভৃতির ছত্রের বিশেষ বিবরণ দেখা যায়। ইহাতে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, হংস কুক্কুট ময়ূর ও সারস, এই সকল পক্ষীর মধ্যে যে কোন পক্ষীর পক্ষের দ্বারা রাজার ছত্র ব্যাপ্ত হইবে, অর্থাৎ শোভাসম্পাদনার্থ ছত্রাবরণবস্ত্রের উপরে উক্ত পক্ষীর পালক বিন্যস্ত করিতে হইবে। এই ছত্রের আবরণরূপে নূতন শুভ্রবস্ত্র ব্যবহৃত হইবে, এবং ইহাতে মুক্তা খচিত হইবে। মুক্তার মালা এই ছত্রের সর্বদিকে ঝুলাইয়া দিতে হইবে। এই ছত্রের মূল স্ফটিকময় হইবে, এবং ইহার দণ্ড ছয়হস্তপরিমিত এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে। একজাতীয় বৃক্ষের দ্বারা দণ্ড নির্মিত হইবে, এবং দণ্ডের পর্ব অর্থাৎ গ্রন্থি নবসংখ্যক অথবা সপ্তসংখ্যক হওয়া আবশ্যক। এই ছত্রের

৯০ আবরণার্থং তচ্ছত্রং ব্রাহ্মণায় প্রদীয়তে। —শুদ্ধিতত্ত্বে বরাহপুরাণ।

৯১ ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বূলমেবচ।
গন্ধশ্ছত্রং পাদুকাচ শয্যা শৃঙ্গীচ দ্বাদশ।
মতান্তরে— ভূমিরন্নং জলং হেম রজতং বস্ত্রমেবচ।
গন্ধো মাল্যং ফলং ছত্রং তাম্বূলমাসনং তথা।
দ্বাদশৈতানি দানানি কর্মাঙ্গানি বিদো বিদুঃ। —ব্রতপ্রতিষ্ঠা পদ্ধতি।

৯২ ওঁ ছত্রং সুনির্মিতং দেবি বৃষ্টি-রৌদ্রনিবারকম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা ছত্রঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্।

পরিমাণ দণ্ডার্ধ অর্থাৎ তিন হাত হইবে। ছত্রের সন্ধিগুলি দৃঢ় করিতে হইবে, এবং ইহার নানা স্থানে রত্ন খচিত হইবে। রাজার ঈদৃশ শ্রেষ্ঠ ছত্র কল্যাণকর এবং বিজয়প্রদ।[৯৩]

বরাহমিহিরের মতে যুবরাজ, রাজভার্যা, সেনাপতি ও দণ্ডাধিপতি অর্থাৎ বিচারক, ইহাদের ছত্রদণ্ডের পরিমাণ সাড়ে চারি হাত, এবং ছত্রের পরিমাণ আড়াই হাত। অন্যান্য বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলা হয় নাই।

অন্যান্য রাজপুরুষদিগের ছত্রে ময়ূরপক্ষ নিচিত হওয়া আবশ্যক। এই শ্রেণীর ছত্রের উপরিভাগে প্রসাদপট্টের (রেশমি কাপড় বিশেষের) দ্বারা বিভূষিত করিবার উপদেশ আছে।[৯৪]

অন্যান্য মানবদিগের শীতাতপবারণার্থ ছত্র চতুষ্কোণ এবং ব্রাহ্মণদিগের গোলাকার এবং দণ্ডযুক্ত হইবে।[৯৫]

বরাহমিহিরের এই উপদেশে চতুষ্কোণ ছত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যত্র চতুরস্র বা চতুষ্কোণ ছত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। লিপিভঙ্গিতে মনে হয়, চতুরস্র ছত্রে দণ্ডের যেন ব্যবস্থা নাই। বরাহমিহিরের সময়ে রাজপরিবার এবং ব্রাহ্মণদিগের জন্যই সদণ্ড গোলাকার ছত্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

—

৯৩ নিচিতন্ত্ব হংসপক্ষৈঃ কৃকবাকু-ময়ূর-সারসানাং বা।
দৌকূল্যেন নবেন তু সমন্ততশ্ছাদিতং শুক্লম্॥
মুক্তাফলৈরুপচিতং প্রলম্বমালাবিনং স্ফটিকমূলম্।
ষড়্‌হস্তশুদ্ধহৈমং নব পর্ব নগৈকদণ্ডন্তু॥
দণ্ডার্ধ বিস্তৃতং তৎ সমাবৃতং রত্নভূষিতমুদগ্রম্।
নৃপতেস্তদাতপত্রং কল্যাণপরং বিজয়দঞ্চ॥

ভট্টোৎপলের ব্যাখ্যানুসারে এই সকল শ্লোকের অনুবাদ করা হইল। টীকাকার মূলের অভিপ্রায় বিশদ করিয়া বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এইস্থলে অনেকগুলি গর্গের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সেইগুলি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

৯৪ যুবরাজ-নৃপতিপত্ন্যোঃ সেনাপতি-দণ্ডনায়কানাঞ্চ।
দণ্ডেঽর্ধপঞ্চহস্তঃ সমপঞ্চকৃতোঽর্ধবিস্তারঃ॥ ৪
অন্যেষামুষ্ণঘ্নং প্রসাদপট্টৈর্বিভূষিতশিরস্কম্।
ব্যালম্বিরত্নমালং ছত্রং কার্যন্তু মায়ূরম্॥ ৫

৯৫ অন্যেষান্তু নরাণাং শীতাতপবারণন্তু চতুরস্রম্।
সমাবৃত্তদণ্ডযুক্তং ছত্রং কার্যন্তু বিপ্রাণাম্॥ ৬

উ ষ্ণী ষ

দেহের ঘটক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে মস্তক উত্তমাঙ্গ নামে অভিহিত। এই উত্তমাঙ্গ সুস্থ থাকিলেই মানব নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়া বিবিধ সূক্ষ্মতত্ত্বের নির্ণয়ে অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং শীতোষ্ণাদির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এই কর্তব্যপালনের একটি উপকরণ উষ্ণীষ। সম্ভবতঃ সভ্যতার উন্মেষকালেই সভ্যসমাজে উষ্ণীষের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল। 'উষ্ণং ঈষতে হিনস্তি— ঈষ+ক, শকন্ধ্বাদি পররূপ' উষ্ণকে হিংসা অর্থাৎ নিবারণ করে, এই অর্থে উষ্ণীষ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। শব্দের এই নিরুক্তির উপর নির্ভর করিলে বোধ হয়, প্রথমতঃ যেন উষ্ণের আক্রমণ হইতে উত্তমাঙ্গের রক্ষণই উষ্ণীষধারণের প্রয়োজন রূপে অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং উষ্ণপ্রধান দেশই যেন ইহার জন্মভূমি। পরবর্তীকালে শীত-বাতাদির আক্রমণ-নিবৃত্তিও ইহার প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রয়োজন আয়ুর্বেদে উষ্ণীষের গুণকীর্তনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে।[৯৬] শিরোবেষ্টন ও মুকুট, এই উভয় অর্থেই উষ্ণীষ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরাতন সাহিত্যে কেবল শিরোবেষ্টন অর্থেই ইহার ব্যবহার ছিল, তাহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্বলায়নগৃহ্যে এক স্থলে[৯৭] 'উষ্ণীষং কৃত্বা' এইরূপ একটি বাক্য আছে; বৃত্তিকার নারায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছে 'আহতবাসসা শিরোভিবেষ্টয়্যতার্থঃ' (বস্ত্রের দ্বারা মস্তক বন্ধন করিয়া)। পরবর্তী সাহিত্যে মুকুট অর্থেও প্রয়োগ দেখিয়াই বোধ হয় অভিধানকার[৯৮] অমর ইহাকে উভয়ার্থকশব্দরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

সুতরাং বর্তমান সময়ে উষ্ণীষ বলিলে মুকুট ও পাগ্‌ড়ী এই উভয়কেই আপাততঃ বুঝিতে হয়, অতএব ছাতার ন্যায় ইহাকেও সামান্য-বিশেষরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে।

রাজার ও যুবরাজ প্রভৃতি রাজপরিবারের ব্যবহার্য শিরোবেষ্টন মুকুট, এবং

৯৬ পবিত্রং কেশ্যমুষ্ণীষং বাতাতপ রজোপহম্।
বর্ষানিল-রজো-ঘর্ম-হিমাদীনাং নিবারণম্॥ —সুশ্রুতসংহিতা, নিদানস্থান, ২৪ অধ্যায়।

৯৭ আয়ুষ্যমিতি সূক্তেন মনিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্যোষ্ণীষং কৃত্বা
তিষ্ঠন্ সমিধোঽভ্যাদধ্যাৎ। —৩।৮।১৬

৯৮ উষ্ণীষঃ শিরোবেষ্ট-কিরীটয়োঃ।

সাধারণের ব্যবহার্য পাগ্‌ড়ী। রাজার ও রাজপরিবারের মুকুটগত পার্থক্য ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠে জানা যায়, রাজার মাথায় মুকুট ও যুবরাজ প্রভৃতির মাথায় অর্ধ-মুকুট ধৃত হইত।[৯৯]

সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে রাজ-দর্শন ঘটিয়া উঠে না, সম্রাটপ্রদত্ত রাজা-মহারাজ-উপাধিধারী বাঙ্গালী ভূম্যধিকারিগণ বিলাতি ধরণের উষ্ণীষই ধারণ করেন, সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে মুকুট চেনা একেবারে অসম্ভব হইত, কেবল রাজসজ্জার অনুকারী বিবাহের বর সেই অভাবটি অদ্যাপি দূর করিতেছে। উষ্ণীষ যে এক সময়ে সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, প্রাচীন সাহিত্যে এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় গুরুকুলে বাস করিবার সময়ে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ, সমাবর্তনের সময়ে গুরুর আজ্ঞানুসারে সমাবৃত্তগণ সেই সকল দ্রব্য মন্ত্রপূর্বক প্রথম ব্যবহার করিবে, গৃহ্য-গ্রন্থে তাহা কথিত হইয়াছে। ঐ সময়ে যে সকল দ্রব্য উপন্যস্ত করিবার বিধান আছে, তাহার মধ্যে ছত্র পাতুকা প্রভৃতির ন্যায় উষ্ণীষও স্থান পাইয়াছে।[১০০]

উষ্ণীষব্যবহার ধর্মকর্মের অঙ্গরূপেও নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কার্য বিশেষে শাস্ত্রানুসারে নানা বর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহার হইত। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে ঋত্বিক্‌দিগের রক্তবর্ণ উষ্ণীষ বিহিত হইয়াছে।[১০১] এই ব্যবস্থার মূলে শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়, 'লোহিতোষ্ণীষ ঋত্বিজশ্চরন্তি'। প্রয়োজনানুসারে বিভিন্নরূপ উষ্ণীষ ব্যবহারের রীতি ছিল। স্নানের পর মাথার জল নিঃশেষ করিবার অভিপ্রায়ে এক প্রকার অতি-ধবলবর্ণ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। বড় লোকের ব্যবহার্য এই শ্রেণীর উষ্ণীষ ক্ষৌমবস্ত্র ও পট্টবস্ত্রের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইত। কাদম্বরীতে বর্ণিত স্নাত শূদ্রক নৃপতির এইরূপ উষ্ণীষ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। (অতিধবলজলধরচ্ছেদশুচিনা 'দুকূলপট্টপল্লবেন' কৃতশিরোবেষ্টনঃ)। পুরাকালের এই জাতীয় উষ্ণীষ রাজহংসের সহিত উপমিত হইয়াছে।[১০২] এই

৯৯ নরাধিপানাং কর্তব্যং মস্তকে মুকুটং বুধৈঃ।
সেনাপতেঃ পুনশ্চাপি যুবরাজস্য চৈবহি।
যোজয়েদর্ধমুকুটং কূটমাত্রাশ্চ যে নরাঃ।

১০০ অথৈতান্যুপকল্পয়তি সমাবর্ত্যমানে মণি-কুণ্ডলে বস্ত্রযুগং ছত্রমুপানদ্‌যুগং দণ্ডং স্রজমুন্মর্দন-মনুলেপন মঞ্জনমুষ্ণীষ'মিত্যাত্মনে আচার্যায়চ। —আশ্বলায়ন গৃহ্য, ৩।৮।৪

১০১ সন্নদ্ধা লোহিতোষ্ণীষা নিস্ত্রিংশিনো যাজয়েযু। —আশ্বলায়ন শ্রৌত, ৯।৭।৩

১০২ আপ্লুতঃ সাধিবাসেন জলেনচ সুগন্ধিনা।

উপমার প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, এই উষ্ণীষ বর্তমান সময়ে ব্যবহার্য তোয়ালের মত কাপড়ের দ্বারা নির্মিত হইত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর উষ্ণীষ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বঙ্গের ধর্মকর্মের ব্যবস্থাপক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় স্নানের পর ব্যতীত অন্য সময়ে উষ্ণীষ ব্যবহারের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত 'ধারণ করিবে না' এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। (উষ্ণীষধারণং শিরোজলাপনয়নায়, তেন তদনন্তরং ন ধার্যম্ —আহ্নিকতত্ত্ব)। তিনি স্বমতসমর্থনের জন্য মহাভারত হইতে স্নানের পর রাজহংসনিভ উষ্ণীষ ধারণের পরিচায়ক বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে কি অন্য উষ্ণীষ ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে? স্নানের পরক্ষণেই উষ্ণীষ ধারণেই কি শীতোষ্ণের আক্রমণ বিদূরিত হইয়া যায়? তাঁহার সময়ে বাঙ্গলায় উষ্ণীষ ব্যবহারের প্রথা ছিল না, এমতও বলা যায় না; কারণ, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম ভণ্ডচূড়ামণি ভাঁড়ুদত্তের মাথায় গরীবের উপযুক্ত উষ্ণীষ পরাইয়া তাহাকে দরবারে পাঠাইয়াছেন।[১০৩]

বাঙ্গলার পুরোহিতঠাকুরগণ হোম করিতে হইলে, অদ্যাপি যজমানের কাছে উষ্ণীষের দাবী করিয়া থাকেন, সুতরাং স্মার্তমহোদয়ের এই ব্যবস্থার মূল কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বিশেষতঃ, এই উষ্ণীষব্যবহার এক সময়ে রাজকীয় নিয়মের অধীন হইয়াছিল। মহর্ষি বৃহস্পতির একটি বচন-পাঠে জানা যায়, বিচারালয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবার সময়ে, পাতুকা ও উষ্ণীষপরিত্যাগপূর্বক হস্ত উত্তোলন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবার রীতি ছিল।[১০৪] অথচ আদালতে যাইয়া স্নানের ব্যবস্থা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। উষ্ণীষ লঘুত্ব ও গুরুত্বানুসারে ভিন্ন গুণ সম্পাদন করে। রাজবল্লভের মতে লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা উষ্ণীষ কেশের হিতকর, কান্তিজনক, রজোবাত ও কফের নিবারক। গুরু উষ্ণীষ পিত্তজনক ও চক্ষু-রোগকারক।[১০৫]

রাজহংসনিভং প্রাপ্য উষ্ণীষং শিথিলার্জিতম্।
জলক্ষয়নিমিত্তং বৈ বেষ্টয়ামাস মূর্বনি॥ —আহ্নিকতত্ত্বে মহাভারত

১০৩ পাগ্‌খানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ। —কবিকঙ্কণ চণ্ডী

১০৪ বিহায়োপানহূষ্ণীষৌ দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরন্।
হিরণ্যং গোশকৃর্দভান্ সমাদায় ঋতং বদেৎ॥ —পরাশর মাধব ব্যবহার কাণ্ডে

১০৫ উষ্ণীষং কান্তিকৃৎ কেশ্যং রজোবাতকফাপহম্।
লঘু তচ্চেষ্যতে যস্মাদ্ গুরু পিত্তাক্ষিরোগকৃৎ।

বর্তমান সময়ে উষ্ণীষের আকার দেখিয়া মৈথিল, মারহাট্টা, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানি প্রভৃতিকে চিনিতে পারা যায়। দেশভেদে উষ্ণীষের আকারভেদ কত কাল হইতে চলিতেছে, তাহার নিশ্চয় নাই। এইরূপ আকারভেদ দেখিয়াই বোধ হয় মেদিনীকোষকার উষ্ণীষকে চিহ্নবিশেষ রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।[১০৬] পুরাতন প্রস্তরমূর্তির মস্তকে মুকুট ও সাধারণ উষ্ণীষের অনেক রকম আকার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ও রানীর মস্তকে ভিন্নরূপ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। বর্তমান সময়ে রাজা ও রানীর সাজসজ্জার অনুকারী বিবাহের বর-কন্যার মস্তকে ধার্য শোলার শিল্প সেই প্রাচীন রীতির অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রী-পুরুষ সাধারণের মস্তকেই উষ্ণীষ ব্যবহারের রীতি আছে।

দেবতার প্রাচীন প্রস্তরমূর্তিতে স্ত্রী-পুরুষ সাধারণের মস্তকেই মুকুটের ছটা বিদ্যমান। দুর্গা কালী প্রভৃতির ইদানীন্তন মৃন্ময়ী মূর্তিও মুকুট-শোভায় বঞ্চিত নহে। বর-কন্যার মস্তকে অদ্যাপি মুকুট ও অর্ধমুকুট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নাট্যাচার্য ভরতের মতে রমণীমহলে মুকুটধারণের ব্যবস্থা নাই। ইহার মূলে কি রহস্য আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাচীন কালে মুকুট স্বর্ণোপাদানে নির্মিত হইত, এবং তাহাতে সুষমাসম্পাদনার্থ নৈপুণ্যের সহিত হীরক খচিত হইত। প্রমাণস্বরূপ হরিবংশের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

মুকুটশ্চাপতত্তস্য কাঞ্চনো বজ্রভূষিতঃ।

মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মণিভূষিত মুকুটের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে মুকুটে স্বর্ণের অপেক্ষা মণির অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে বর্ণিত চন্দ্রাপীড়ের অনুগামী সমস্ত নৃপতিবৃন্দের মস্তক মণিমুকুটে শোভিত ছিল।[১০৭] কবিপ্রবর মাঘ শিশুপালের মস্তক মণিমুকুটের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।[১০৮] বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসাম দেশবাসী এই তিন জাতিকেই নিরাবরণমস্তক রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলে কোনও রহস্য আছে কিনা, তাহা বলিতে পারা যায় না।

—

১০৬ উষ্ণীষস্তু শিরোবেষ্টে কিরীটে লক্ষণান্তরে।

১০৭ আদরাবনতমৌলিশিথিলমণিমুকুটপঙ্‌ক্তিভিঃ।

১০৮ লোলমুকুটমণিরশ্মিগণৈরশনৈঃ প্রকম্পিতজগত্রয়ং শিরঃ। —২৫।৩

অলঙ্কার

রুচিবৈচিত্র্যের প্রভাবে, দেশভেদে ও কালভেদে, বিলাসোপকরণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। তাহার নিদর্শন শাস্ত্রে ও প্রাচীন মূর্তিগাত্রে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশে যুবকের গাত্রে আজকাল ঘড়ি, চেন, চশমা ও অঙ্গুরীয় ভিন্ন অলঙ্কারের সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু মাড়োয়ারী মহলে যুবক হইতে প্রৌঢ়ের দেহ পর্যন্ত হার-বলয়-কটিসূত্রে এখনও বিভূষিত হইতে দেখা যায়।

পূর্বকালে কতকগুলি আভরণ স্ত্রী-শরীরে এবং পুরুষ-শরীরে সমভাবে ব্যবহৃত হইত; এবং কতকগুলি কেবল স্ত্রী-শরীরেই শোভা পাইত। ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, দেহের আভরণ সাধারণতঃ আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য, এবং আরোপ্য এই চারি প্রকার। তন্মধ্যে কুণ্ডল প্রভৃতি কর্ণাভরণ 'আবেধ্য'। কটিসূত্র অঙ্গদ প্রভৃতি 'বন্ধনীয়', নূপুর এবং বস্ত্রাভরণ 'ক্ষেপ্য', স্বর্ণ-সূত্র ও বিবিধ হার 'আরোপ্য' নামে অভিহিত।[১০৯]

চূড়ামণি ও মুকুট মস্তকের আভরণ, মুক্তাবলী (মুক্তাহার) হর্ষক এবং সূত্র কণ্ঠের আভরণ, কুণ্ডল কর্ণের আভরণ, বটিকা এবং অঙ্গুলিমুদ্রা অঙ্গুলির আভরণ, কেয়ূর ও অঙ্গদ কূর্পরের (কনুইয়ের উপরিভাগের) আভরণ, ত্রিসর এবং হার গ্রীবার ও স্তনমণ্ডলের আভরণ; লম্বমান মুক্তাহার ও মালা প্রভৃতি দেহের আভরণ; তরল ও সূত্রক কটির আভরণ। এই সকল আভরণ পুরুষশরীরেও ধৃত হইত।[১১০]

১০৯ চতুর্বিধন্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকস্তথা॥
আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎস্যাচ্ছ্রবণভূষণম্‌।
শ্রোণীসূত্রাঙ্গদৈবর্মুক্তা বন্ধনীয়া বিনির্দিশেৎ॥
প্রক্ষেপ্যং নূপুরং বিদ্যাদ্বস্ত্রাভরণ মেবচ।
আরোপ্যং হেমসূত্রাণি হারাশ্চ বিবিধাশ্রয়াঃ॥ —২১।১১-১৩

১১০ চূড়ামণিঃ সমুকুটঃ শিরসো ভূষণং স্মৃতম্‌।
কুণ্ডলং কর্ণমেবৈকং কলাকরণমিষ্যতে॥ —২১।১৫
মুক্তাবলী হর্ষকঞ্চ সসূত্রং কণ্ঠভূষণম্‌।
বটিকাঙ্গুলিমুদ্রাচ স্যাদঙ্গুলিবিভূষণম্‌॥
কেয়ূরাবঙ্গদেচৈব কূর্পরোপরিভূষণম্‌।
ত্রিসরশ্চৈব হারশ্চ গ্রীবা-বক্ষোজভূষণম্‌॥
তরলং সূত্রকঞ্চৈব ভবেৎ কটিবিভূষণম্‌।
অয়ং পুরুষনির্যোগঃ কার্যস্ত্বাভরণাশ্রয়ঃ॥
ব্যালম্বিমুক্তিকা হারা মালাস্তা দেহভূষণম্‌॥ —২১।১৫-১৯

অতঃপর দেবতার এবং পার্থিব রমণীদিগের আভরণ কথিত হইয়াছে। শিখাপাশ, শিখাজাল, খণ্ডপত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষি, কুণ্ডল, খড়্গপত্র, বেণীগুচ্ছ, দারক, ললাটতিলক, ভ্রূর এবং কক্ষের উপরিভাগে ধারণীয় গুচ্ছ, নানাপ্রকার ফুলের অনুকরণ, অর্থাৎ স্বর্ণাদির দ্বারা নির্মিত বিবিধ ফুল।

কর্ণের আভরণ কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, অপেশ্রুক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, নানাবিধ রত্নখচিত দন্তপত্র ও কর্ণপূর এবং গণ্ডস্থলের ভূষণ তিলক ও পত্রলেখা।[১১১]

মেঘদূতের টীকায় মল্লিনাথ 'রসাকর' নামক গ্রন্থ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রমণীদিগের সাধারণতঃ চারিপ্রকার ভূষণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা 'কচধার্য' 'দেহধার্য' 'পরিধেয়' এবং 'বিলেপন' নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং অন্যান্য আভরণ 'দেশিক' (দেশ বিশেষে প্রসিদ্ধ) বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[১১২]

এইস্থানে কেশে ধারণীয় পুষ্প প্রভৃতি, শরীরে লেপনীয় চন্দন কুঙ্কুম অলক্ত কস্তুরী প্রভৃতি ও পরিধেয় বস্ত্র, এই ত্রিবিধ বস্তুর অতিরিক্ত যাবতীয় অলঙ্কারই 'দেহধার্য' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অলঙ্কারের নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোষগ্রন্থে তাহাদের কতকগুলির শ্রেণীবিভাগের ও উপাদানভেদে নামবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ণাভরণ প্রভৃতির যত প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে, বর্তমান সময়ে তাহাদের আকৃতিনির্ণয়ের উপায় নাই। যদিও বিভিন্নকালের প্রস্তরমূর্তিগাত্রে দেদীপ্যমান আভরণ সমূহ অতীত যুগের শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাপি তাহা হইতে অলঙ্কারের আকৃতির পরিচয় পাওয়া গেলেও নামের

১১১ দেবানাং পার্থিবানাঞ্চ পুনর্বক্ষ্যামি যোষিতাম্।
শিখাপাশং শিখাজালং খণ্ডপত্রং তথৈবচ॥
চূড়ামণিং মকরিকাং মুক্তাজালং গবাক্ষি (কং)।
কুণ্ডলং খড়্গপত্রঞ্চ বেণীগুচ্ছ সদারকঃ॥
ললাটতিলকশ্চৈব নানাশিল্পপ্রযোজিতঃ।
ভ্রূ-কক্ষোপরি গুচ্ছশ্চ কুসুমানুকৃতি স্তথা।
কর্ণিকা কর্ণবলয়ং তথা স্যাৎ পত্রকর্ণিকা।
আপেশ্রুকঃ কর্ণমুদ্রা কর্ণোৎপলকমেবচ॥
নানারত্নবিচিত্রাণি দন্তপত্রাণি চৈবহি।
তিলকাঃ পত্রলেখাশ্চ ভবেদ্ গণ্ডবিভূষণম্॥ —২১।১৯-২৪

১১২ কচধার্যং দেহধার্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্।
তুচর্বা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দেশিকং॥ —উত্তরমেঘ, ১৩, টীকা

পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যাকরণের সাহায্যে যতদূর অর্থ বাহির করা যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না। তথাপি উপায়ান্তরের অভাবে তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়।

রামায়ণে হার, হেমসূত্র, রশনা, অঙ্গদ, কুণ্ডল ও বলয়, এই কয়টি প্রধান অলঙ্কারের উল্লেখ উপলক্ষে অঙ্গদের 'বিচিত্র' বিশেষণ ও কেয়ূরের 'শুভ' বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অঙ্গদ ও কুণ্ডল যে স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হইত তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।[১১৩]

মস্তকাভরণ

মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চরণ পর্যন্ত যে সকল আভরণ ধারণ করা যায়, তাহাদের তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ উত্তমাঙ্গ-ধার্য আভরণের উল্লেখই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কোষকার অমরসিংহও মুকুট হইতেই অলঙ্কারের নাম কথনে প্রয়াসী হইয়াছেন।[১১৪] তাঁহার গ্রন্থে সীমন্তে ধার্য আভরণ 'বালপাশ্যা' এবং 'পরিতথ্যা' নামে অভিহিত হইয়াছে।[১১৫] বালপাশে অর্থাৎ সীমন্তাকারে নিবদ্ধ কেশ সমূহে 'সাধু' এই অর্থে যৎ প্রত্যয়ের দ্বারা বালপাশ্যা এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। এই অলঙ্কার বর্তমান সময়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বাঙ্গলা দেশে স্বর্ণের দ্বারাই সাধারণতঃ ইহা নির্মিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুস্থানী নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মস্তকে রূপ্যনির্মিত এই আভরণ দেখা যায়। টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত স্বর্ণাতিরিক্ত উপাদানেরও উল্লেখ করিয়াছেন।[১১৬] প্রাচীন প্রস্তরমূর্তির মস্তকে এই শ্রেণীর আভরণের প্রভূত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়,

১১৩ হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ ভার্যায়ৈ সৌম্য হারয়।
রসনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী॥
অঙ্গদানি বিচিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ।
জাতরূপময়ৈর্মু খৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ॥
সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি॥ —অযোধ্যাকাণ্ড, ৩২।৭।৮।৫২
তিলকটীকাকার বলেন— 'হেমসূত্র' বক্ষঃস্থলের আভরণ।

১১৪ অথ মুকুটং কিরীটং পুংনপুংসকম্। —মনুষ্যবর্গ, ১০১

১১৫ মনুষ্য বর্গ; ১০৩

১১৬ সীমন্তস্থিতায়াঃ স্বর্ণাদিনির্মিতায়াঃ পট্টিকায়াঃ।

এবং ইহাতে শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা দেখিয়া উপাদান নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই।

ললাটের আভরণ 'পত্রপাশ্যা' এবং 'ললাটিকা' নামে পরিচিত।[১১৭] কর্ণের এবং ললাটের আভরণ বুঝাইলে, কর্ণ এবং ললাট এই উভয় শব্দের উত্তর 'কণ্' প্রত্যয় হয়।[১১৮]

পাণিনির এই সূত্রের অর্থানুসারে, ইহার আকারের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু 'পত্রপাশ্যা' শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহা যেন বৃক্ষের পত্রসমূহের আকারে নির্মিত হইত; অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রসমূহের বৃন্তকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ নানাদিকে বিন্যস্ত করিলে, একটি সুন্দর আকৃতি সংঘটিত হয়। পত্রের পাশ (সমূহ) তাহার তুল্য এই অর্থে তদ্ধিত হইলে, 'পত্রপাশ্যা' শব্দের পূর্বোক্ত অর্থ হইতে পারে।

—

কর্ণাভরণ

আমাদের মতে কর্ণের আভরণ সাধারণতঃ কুণ্ডল ও কর্ণিকা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'কর্ণিকা'র অপর নাম 'তালপত্র' ইহা কর্ণের উপরিভাগে ধার্য আভরণের নাম বলিয়া বোধ হয়। কারণ কুণ্ডলের ব্যবহার কর্ণের নিম্ন ভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য হেমচন্দ্র যেন 'তালপত্র' ও 'তাটঙ্ক'কে কুণ্ডলস্থানের আভরণ বলিয়াছেন; এবং কর্ণের পৃষ্ঠভাগে ধারণীয় অলঙ্কারকে 'উৎক্ষিপ্তিকা' 'কর্ণান্দু' ও 'বালীকা' এই তিন নামে নির্দেশ করিয়াছেন।[১১৯]

প্রাচীন সময়ে এক এক কর্ণে এক এক রূপ অলঙ্কার ধারণেরও নিদর্শন দেখা যায়। কাদম্বরীতে বর্ণিত চাণ্ডালকন্যকার এক কর্ণে দন্তনির্মিত পত্র ধারণের উল্লেখ আছে।[১২০] এই রীতি অনুসারে এককর্ণে 'তাটঙ্ক' ও অপর কর্ণে কুণ্ডল অথবা

---

১১৭ মনুষ্যবর্গ, ১০৩

১১৮ কর্ণললাটাৎ কর্ণালঙ্কারে। —৪।৩।৬৫

১১৯ তাটঙ্কস্তু তাড়পত্রং কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টনম্।
উৎক্ষিপ্তিকা তু কর্ণান্দুর্বালীকা কর্ণপৃষ্ঠগা॥

১২০ এককর্ণা মুক্তদন্তপত্রপ্রভাধবলিতকপোলমণ্ডলাম্।

রুচিভেদে একস্থানে বিবিধশ্রেণীর আভরণের সমাবেশ হইতে পারে। বাসবদত্তাতে তাটঙ্কাভরণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা যে রজত ও রত্ন প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা নির্মিত হইত, তাহা কথিত হইয়াছে। অস্তগমনোন্মুখ শশাঙ্কদেব পশ্চিমপর্বতরূপ উপাধানে সুখনিহিতমস্তক পশ্চিমদিগ্‌বধূর রাজততাটঙ্করূপে কথিত হইয়াছেন।[১২১]

রাজা শৃঙ্গারশেখরের বাহুদণ্ড সুপ্তসীমন্তিনীর রত্নতাটঙ্করূপ মুদ্রার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে।[১২২] অতি প্রাচীন কাল হইতেই কুণ্ডলজাতীয় আভরণের সহিত কর্ণের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, শরীর-রক্ষক ঔষধ ধারণ এবং অলঙ্কারধারণ, এই উভয় উদ্দেশ্যেই বালকের কর্ণবেধ করিতে হয়।[১২৩]

কবিপ্রবর বাণভট্ট দধীচের কর্ণে 'ত্রিকণ্টক' নামক একপ্রকার আভরণ সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। কদম্ব-কোরকসদৃশ স্থূল মুক্তাফলদ্বয় এবং তদুভয়ের মধ্যস্থিত মরকতমণি, বর্ণিত ত্রিকণ্টকের উপাদানরূপে কীর্তিত হইয়াছে।[১২৪] ইহার 'প্রেঙ্খৎ' বিশেষণ দেখিয়া বোধ হয়, মধ্যযুগের আবিষ্কৃত এই আভরণটি কুণ্ডলের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণাভিসরণপ্রবৃত্ত গোপীবৃন্দের 'জবলোলকুণ্ডলা' বিশেষণ[১২৫] দেখিয়া বোধ হয়, আধুনিক মাকড়ি দুল্ প্রভৃতি যেমন কর্ণে ঝুলিয়া থাকে, পূর্বকালে কুণ্ডলের ব্যবহারও এই রীতিতেই সম্পন্ন হইত। পুরাতন দেবমূর্তির কর্ণে যে সকল কুণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকার গোল; এবং উপরে নানা-প্রকার কারুকার্যের সমাবেশ লক্ষিত হয়। কুণ্ডলে বিভিন্নজাতীয় মণিসন্নিবেশের উল্লেখ দেখা যায়। শিশুপালবধ কাব্যে কৃষ্ণের কুণ্ডলে নিহিত গারুত্মতমণির উল্লেখ আছে। যথা— সেই হরির বক্ষঃস্থল স্বর্ণময় কুণ্ডলাগ্রনিহিত মরকত মণির দীপ্তির দ্বারা বাল্যকালে অভ্যস্ত ময়ূরপিচ্ছমালার সম্পর্কই যেন পাইয়াছিল।[১২৬]

---

১২১ পশ্চিমাচলোপাধানসুখবিলীনশিরসো রাজততাটঙ্কইব। —৪৪ পৃ

১২২ যত্র চ সুরতভরখিন্নসুপ্তসীমন্তিনীরত্নতাটঙ্কমুদ্রাঙ্কিতবাহুদণ্ডঃ। —১২১ পৃ

১২৩ রক্ষা-ভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যেত। —সূত্রস্থান, ১৬ অধ্যায়

১২৪ কদম্বমুকুলস্থূলমুক্তাফলযুগলমধ্যাধ্যাসিতমরকতস্য ত্রিকণ্টককর্ণাভরণস্য প্রেঙ্খতঃ প্রভয়া।
—হর্ষচরিত (বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত)। ২১ পৃ

১২৫ আজগ্মু, রন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ সর্বত্র কান্তো জব-লোল-কুণ্ডলা। —দশমস্কন্ধ ২৯।৪

১২৬ তস্যোল্লসৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাগ্র-প্রত্যুপ্তগারুত্মতরত্নভাসা।
অবাপ বাল্যোচিত-নীলকণ্ঠ-পিচ্ছাবচূড়া-কলনা মিবোরঃ॥ —২য় সং। ৩৩

রামায়ণে লঙ্কাপুরবাসী মহিলাবৃন্দের কর্ণান্তে পরিহিত হিরণ্ময় কুণ্ডলে হীরকের ও বৈদূর্যমণির সন্নিবেশ বর্ণিত হইয়াছে।[১২৭]

শিশুপালবধ কাব্যের স্থানান্তরে বিবিধ শ্রেণীর প্রস্তর নির্মিত কুণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—ধনুর্বাণধারী মেঘের বিচিত্রবর্ণ নানাপ্রকার মণিনির্মিত কুণ্ডল-দ্যুতিপুঞ্জের সহিত মিলিত কৃষ্ণের দেহকান্তির অনুকরণ করিয়াছিল।[১২৮]

কাদম্বরীতে পত্রলেখার মণিময় কুণ্ডলে মরকতমণিনির্মিত 'মকরপত্রভঙ্গে'র সন্নিবেশ দেখা যায়।[১২৯]

আমাদের নিত্যপূজ্য নারায়ণ ঠাকুরের কনককুণ্ডলধারী দেহ ধ্যেয়রূপে কীর্তিত হইয়াছে।[১৩০] জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীও শোভমান রত্ন কুণ্ডল ধারণ করিয়া সাধকের চিত্তপটে দর্শন প্রদান করেন।[১৩১] দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় সমাগত নৃপতিবৃন্দের কর্ণযুগল পরিষ্কৃত মণিকুণ্ডলে শোভিত হইয়াছিল।[১৩২] আজন্ম-বনবাসী সরলচেতা ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার নিকট নবাগত মুনিকুমারের (বেশ্যার) কর্ণদ্বয়ে ধৃত অলঙ্কারকে চক্রবাকের ন্যায় বিচিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু, এই আভরণ সুরূপযুক্ত, এবং ইহার দ্বারা কর্ণদ্বয় সমাবৃত, এইরূপও কীর্তন করিয়াছেন।[১৩৩] ঋষ্যশৃঙ্গবর্ণিত এই আভরণ কর্ণপৃষ্ঠগত 'উৎক্ষিপ্তিকা'দির অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়।

—

কণ্ঠাভরণ

কণ্ঠলগ্ন আভরণ (কণ্ঠী, তাবিজ প্রভৃতি) 'গ্রৈবেয়ক' নামে অভিহিত।[১৩৪] বর্তমান কালের 'ঠিক', 'গোঁপহার' প্রভৃতিও গ্রৈবেয়কের অন্তর্গত। কিঙ্কিল্লম্বমান

১২৭ বজ্র-বৈদূর্য-গর্ভাণি শ্রবণান্তেষু যোষিতাম্।
দদর্শ তাপনীয়ানি কুণ্ডলান্যঙ্গদানিচ॥ —সুন্দরকাণ্ড। ২য় সং। ৬

১২৮ অনুযোযৌ বিবিধোপল কুণ্ডল-দ্যুতি বিতানকসংবলিতাং শুকম্।
ধৃতধনুর্বলয়স্য পয়োমুচঃ শবলিমা বলিমানমুষোবপুঃ॥ —৬।২৭

১২৯ মণিময়-কুণ্ডল-মরক-পত্রভঙ্গকোটিকিরণাতপাহত-কপোলতয়া।

১৩০ কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী।

১৩১ দুর্গা দুর্গতি-হারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা।

১৩২ সুরভি স্রগ্ধরাঃ সর্বে প্রমৃষ্ট-মণিকুণ্ডলাঃ। —মহাভারত ; বনপর্ব।৫৭

১৩৩ কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ সমাবৃতৌ তস্য সুরূপবদ্ভিঃ। —মহাভারত। বনপর্ব। ১১২।৯

১৩৪ ১০৪ কারিকা। অমরকোষ। মনুষ্যবর্গ।

কণ্ঠাভরণ 'ললন্তিকা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১৩৫] উক্ত ললন্তিকা স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হইলে 'প্রালম্বিকা' নামে অভিহিত হইত ; এবং মুক্তার দ্বারা নির্মিত হইলে, তাহাই 'উরঃসূত্রিকা' নামে খ্যাতি লাভ করিত।[১৩৬] কণ্ঠের কিঞ্চিন্নিম্ন ভাগে ধৃত হাঁসুলি নামক একশ্রেণীর আভরণ দেখা যায়। বর্তমান সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য ইহার উপাদানরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার নামটি দেশ্য এবং সংস্কৃত গন্ধরহিত বলিয়া বোধ হয়। এই আভরণ 'ললন্তিকা' শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। কতদিন হইতে ইহার উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু প্রাচীন প্রস্তরমূর্তির গাত্রে ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, মধ্যযুগে ভদ্রমহলে ইহার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল ; নতুবা আরাধ্য দেবতার অঙ্গে ইহা স্থান পাইতে পারিত না। প্রস্তরমূর্তিস্থ সেকালের এই শ্রেণীর আভরণে কারুকার্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায় ; চিত্রের সাহায্য ব্যতীত সেই সমস্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ আভরণ পাঠকের দৃষ্টিপথে উপন্যস্ত করিবার উপায় নাই। কি উপাদানে এই আভরণ নির্মিত হইত, পাথরের পুতুল দেখিয়া তাহাও নির্ণীত হইতে পারে না।

বর্তমান সময়ে গলদেশেই মালাধারণ করিবার প্রথা দেখা যায়, এবং এই মালা কাষ্ঠ, পুষ্প, স্বর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি বিবিধ উপাদানে নির্মিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অমরসিংহ 'মালা' ও তৎসমানার্থক মাল্য ও 'স্রক্' এই কয়টি শব্দকে মস্তকে ধার্য আভরণের বাচক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১৩৭] ইহার উপাদান সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মেদিনীকোষে পুষ্পই মাল্যের উপাদান রূপে কীর্তিত হইয়াছে।[১৩৮] হেমচন্দ্র 'আদি' শব্দের দ্বারা পুষ্পাতিরিক্ত পদার্থেরও আভাস প্রদান করিয়াছেন।[১৩৯] বৈদিকগ্রন্থে স্বর্ণনির্মিত স্রকেরও উল্লেখ দেখা যায়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে যজ্ঞে ব্যাপৃত ঋত্বিগ্‌বর্গের প্রতি দেয় দ্রব্য-সমূহের নির্দেশপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, উদ্‌গাতাকে 'স্বর্ণনির্মিত স্রক্' দান করিবে।

সূর্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশ করিয়া থাকেন, উদ্‌গাতাও সেইরূপ

১৩৫ ঐ

১৩৬ ঐ

১৩৭ মাল্যং মালা স্রজো মূর্দ্ধ্নি।

১৩৮ মাল্যং কুসুমতৎস্রজোঃ।

১৩৯ মালা তু পুষ্পাদি-দামনি।

সামবেদের অর্থ প্রকাশ করেন; অতএব, উদ্‌গাতা সৌর্য স্বুবর্ণ স্রগ্‌ধারণের পূর্বে, 'উষঃকাল' (প্রভাত) সম্পন্ন হয় না; স্রগ্‌ধারণের পর, সূর্য বিশেষ রূপে 'উষঃকাল' সম্পাদন করেন।[১৪০]

এস্থলে স্রকের ধারণ-স্থান কথিত হয় নাই। পক্ষান্তরে হোতার প্রতিদেয় 'রুক্ম' নামক স্বুবর্ণাভরণের বর্ণনায় বুঝা যায়, এই আভরণ উপরিভাগে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করা হইত। হোতা আগ্নেয়; অতএব প্রকাশ স্বরূপ 'রুক্ম' তাঁহার যোগ্য; অপিচ, এই হোতার জন্য উক্ত 'রুক্ম'-রূপ আদিত্যকে উন্নয়ন করে, অর্থাৎ হোতার ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করে।[১৪১]

গোভিলের গৃহ্যসূত্রে হিরণ্য-স্রকের অতিরিক্ত গন্ধরহিত স্রক্ স্নাতক-ব্রতীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এবং সমাবৃত্ত-ব্যক্তি-কর্তৃক স্রকধারণ বিহিত হইয়াছে।[১৪২] সমাবৃত্ত ধার্য এই স্রক পুষ্পমাল্য এবং মস্তকে ধারণীয়। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার এইরূপ স্থির করিয়াছেন[১৪৩] স্বতরাং গোভিলের সময়ে শিরোধার্য পুষ্পমালাও কণ্ঠধার্য স্বর্ণাদিমালা, এই উভয়ে, সমভাবে স্রক শব্দের প্রয়োগ হইত।

বিদ্যাকর-ধৃত বচনে তুলসীকাষ্ঠনির্মিত মালাধারণের উপদেশ পাওয়া যায়।[১৪৪] বৈষ্ণব সমাজে নানা শ্রেণীর কাষ্ঠমালার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, গোভিলের সময়ে যাহা কেবল শোভা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে তাহাই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপেও পরিগণিত হইয়াছিল।

নিষ্ক-হার

বৈদিক যুগে 'নিষ্ক' নামক একপ্রকার আভরণের পরিচয় পাওয়া যায়, এই

---

১৪০ স্রগুদ্‌গাতু স সৌর্য উদ্‌গাতা নবৈ তস্মৈ ব্যোচ্ছদ-
-থোব্যেবাস্মৈ বাসয়তি। —১৮।৯।৮

১৪১ রুক্মো হোতু রাগ্নেয়ো হোতা থো অমুমেবাস্মা আদিত্যমুন্নময়তি। —১৩।৯।৯

১৪২ নাগন্ধাং স্রজং ধারয়েৎ। (৪।৫।১৫)। অন্যাং হিরণ্য স্রজঃ। (৩।৫।১৬)

১৪৩ স্নাত্বালঙ্ক্‌ত্যাহতে বাসসী পরিধায় স্রজমাবধ্নীত,
"শ্রীরসি ময়িরমস্বেতি"। —৩।৪।২৫
স্রজং পুষ্পমালাং শিরঃ প্রধানত্বাদঙ্গানাং শিরস্যাবধ্নীত। —ভাষ্য।

১৪৪ নধারয়ন্তি যে মালাং তুলসী-কাষ্ঠ-নির্মিতাম্।
নরকান্ন নিবর্তন্তে দগ্ধাঃ ক্রোধাগ্নিনা হরেঃ। —একাদশীতত্ত্ব।

আভরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করা হইত। রাজা জানশ্রুতি ঋষিপ্রবর রৈককে ছয়শত গরু, একটি নিষ্ক ও অশ্বতরী-যুক্ত রথ দান করিয়াছিলেন। নিষ্কের আকার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। অমরসিংহ নানার্থবর্গে নিষ্ককে 'উরোভূষণ' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।[১৪৫] মেদিনীও অমর-মতের অনুসরণ করিয়া ইহাকে 'বক্ষোঽলঙ্কার' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই উভয় কোষকার 'নিষ্ক'কে হার নামে নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত রৈকজানশ্রুতিবৃত্তান্তে অবজ্ঞাকারী রৈক জানশ্রুতিপ্রদত্ত নিষ্ককে হার নামেই নির্দেশ করিয়াছেন।

যথা— 'হে শূদ্র! এই হার যুক্ত গন্ত্রী এবং গো সকল তোমারই থাক।'[১৪৬] বৈদিকযুগের হার মধ্যযুগের হারের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইল কেন, তাহা বুঝা গেল না। বৈদিকযুগেই 'সৃঙ্কা' নামক আর একপ্রকার হারজাতীয় আভরণের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্মরাজ যম নচিকেতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে একটি 'সৃঙ্কা' উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।[১৪৭] এই সৃঙ্কাতে বহুরূপের সমাবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

হার

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ, সাহিত্যে যত প্রকার আভরণের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হারের মত শ্রেণীবিভাগ আর কুত্রাপি প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। এই হার সাধারণতঃ মুক্তার দ্বারা নির্মিত হইত; সেইজন্য হারের অপর নাম 'মুক্তাবলী'।

হারের লহরগুলির নাম যষ্টি, লতা, সর ও সরি। লহরের সংখ্যানুসারে হারের বিশেষ নাম দেখা যায়। শতলহর হার 'দেবচ্ছন্দক' নামে অভিহিত, দ্বাত্রিংশৎ-লহর 'গুৎস', চতুর্বিংশতি লহর গুৎসার্ধ, চতুস্ত্রিংশৎলহর 'গোস্তন', বিংশতিলহর 'মানবক' একলহর 'একাবলী'। যদি একাবলী হারে সাতাশটি মুক্তা সন্নিবেশিত

---

১৪৫ সাষ্টেশতে স্বুবর্ণানাং হেম্ন্যুরোভূষণে পলে।
দীনারেঽপিচ নিষ্কোঽস্ত্রী।

১৪৬ রৈক্কেমানি ষট্‌শতানি গবাময়মশ্বতরীরথোঽনুমত্রতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতা-মুপাস্মইতি। তমুহপরঃ প্রত্যুবাচাহহারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্ব। —৪র্থ অধ্যায়।

১৪৭ তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ। —কঠ,১।১৫

হয়, তবে তাহার নাম নক্ষত্রমালা।[১৪৮] যদিও অমরসিংহ অল্পেই হারপর্ব সমাপ্ত করিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে ইহার প্রভৃত বিবরণ জানিতে পারা যায়। অর্বাচীন সাহিত্যেও 'দেবচ্ছন্দক হার' শতেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছে।

গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার,
করে শঙ্খ শোভে তালবালা।[১৪৯]

যুক্তিকল্পতরুতে 'মুক্তা-রচিতাভরণ-সংজ্ঞা' নামক একটি প্রকরণ আছে, তাহাতে হারের নানাবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। দেবতার ভূষণ 'ইন্দুচ্ছন্দ' নামক হারে একশত আটটি লহর, এবং 'বিজয়চ্ছন্দ' হারে তাহার অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশত চারিটি মুক্তালহরের সমাবেশ থাকিবে। ইন্দুচ্ছন্দের পরিমাণ চারিহস্ত, অর্থাৎ লহরগুলি চারিহাত প্রমাণ হইবে। বিজয়চ্ছন্দের পরিমাণ দ্বিহস্ত। একশত আটটি মুক্তালহরের দ্বারা এবং একাশীতি মুক্তালহরের দ্বারা নির্মিত দ্বিহস্ত পরিমিত হার 'দেবচ্ছন্দ' নামে অভিহিত। চতুঃষষ্টি মুক্তালহরের দ্বারা নির্মিত হার 'রশ্মিকলাপ' নামে পরিচিত। বত্রিশলহর মুক্তাহার 'গুৎস', ও বিংশতি লহর 'গুৎসার্ধ', ষোড়শলহর মুক্তাহার 'মানবক' দ্বাদশলহর 'অর্ধমানবক' নামে পরিচিত। অর্ধহার হইতে অর্ধমানবক পর্যন্ত প্রত্যেক হারেই লহর দ্বিহস্ত পরিমিত হইবে।[১৫০]

আটলহর হার 'মন্দর', পাঁচলহর হার 'হারফলক', সপ্তবিংশতি-মুক্তানির্মিত হস্তপরিমিত হারের নাম 'নক্ষত্রমালা', হস্তপ্রমাণ হারমধ্যে যদি মণি অথবা স্বুর্বর্ণগুলিকা খচিত হয়, তবে তাহার নাম 'মণিসোপান'। এই মণিসোপানের মধ্যভাগে যদি 'তরলক' অর্থাৎ স্বুর্বর্ণনিবদ্ধ মণি সন্নিবেশিত হয়, তবে তাহার নাম 'চাটুকার'। নির্দিষ্টসংখ্যা রহিত মুক্তার দ্বারা নির্মিত হস্তপ্রমাণ হার (যাহার

১৪৮ হারের বিবরণ সম্বন্ধে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ১০৫।১০৬, সংখ্যককারিকা ও তত্রত্য ভানুজীদীক্ষিতের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, খুল্লনার রূপ।

১৫০ সুরভূষণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দুচ্ছন্দো নাম্না বিজয়চ্ছন্দস্তদর্ধেন। —৩১
শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দোহশীতি রেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোহর্ধহারো রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্‌কঃ। —৩২
দ্বাত্রিংশতাতু গুচ্ছো * বিংশত্যা কীর্তিতোহর্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্মানবকো দ্বাদশভিশ্চার্ধমানবকঃ, (৩৩।৮০)। গুৎসও গুচ্ছ, এই উভয় রূপই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে অমরকোষের ১০৫ শ্লোকের ভানুজীদীক্ষিতের টীকা দ্রষ্টব্য।

* ভট্টোৎপলের বিবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

মধ্যে মণি সন্নিবেশিত হয় নাই) তাহার নাম 'একাবলী' এবং যাহার মধ্যে মণির সন্নিবেশ হয়, তাহার নাম 'যষ্টি'।[১৫১] বিক্রমোর্বশী নাটকে উর্বশীর একাবলীতে 'বৈজয়ন্তিকা' বিশেষণ দেখা যায়।[১৫২] ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণের 'বৈজয়ন্তী' মালার উল্লেখ দেখা যায়।[১৫৩] উর্বশীর একাবলী 'বৈজয়ন্তী' এবং ভগবানের মালা 'বৈজয়ন্তী' এই উভয় একজাতীয় কিনা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

—

অঙ্গুরীয়

হস্তাভরণ কঙ্কণের পরেই অঙ্গুলির আভরণ উল্লেখযোগ্য। অঙ্গুলিতে ধার্য আভরণ অঙ্গুলীয় এবং ঊর্মিকা নামে কথিত হয়। 'ভব' অর্থাৎ থাকে, এই অর্থে অঙ্গুলি শব্দের উত্তর 'ছ' প্রত্যয়ের দ্বারা[১৫৪] অঙ্গুলীয় এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উত্তর স্বার্থে 'কন্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'অঙ্গুলীয়ক' হইয়াছে,। ঊর্মির অর্থাৎ তরঙ্গের তুল্য, এই অর্থে 'কন্' প্রত্যয়ের দ্বারা ঊর্মিকা শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে,— সুতরাং সাধারণতঃ ইহার আকারে তরঙ্গ-চিহ্ন প্রদর্শিত হইত বলিয়া বোধ হয়। এই ঊর্মিকাতে অক্ষর লিখিত হইলে, 'অঙ্গুলিমুদ্রা' নাম হইয়া থাকে। (সাক্ষরাঙ্গুলিমুদ্রা স্যাৎ। অমরকোষ মনুষ্যবর্গ; ১০৭)। এই অঙ্গুলিমুদ্রা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলেই চাণক্য-প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে যেমন দলিলপত্রে নামের মোহর অঙ্কিত হয়, পূর্বকালেও এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু সেকালে হস্তাঙ্গুলিতে অলঙ্কারার্থ ধৃত অঙ্গুলীয়কের দ্বারাই এই কার্য সম্পন্ন হইত।

১৫১ মন্দর সংজ্ঞোহষ্টাভিঃ পঞ্চলতা হারফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তবিংশতিমুক্তাহস্তো নক্ষত্রমালেতি॥
অন্তরমণিসংযুক্তা মণিসোপানং সুবর্ণগুলিকৈর্বা।
তরলকমণিমধ্যং তদ্বিজ্ঞেয়ং চাটুকারমিতি॥
একাবলী নাম যথেষ্টসংখ্যা হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা।
সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে যষ্টিতি সা ভূষণবিদ্ভিরুক্তা। —৮০ অধ্যায়। ৩০-৩৪

১৫২ উর্বশী। অম্মো! দলাবিড়বে এআবলী বৈজঅন্তিআ মে লগ্গা। —১ম অ।

১৫৩ উপগীয়মান উদ্‌গায়ন্ বনিতা-শতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্ মণ্ডয়ন্ বনম্। —১০স্কন্দ। ২৯অ। ৪৪

১৫৪ জিহ্বামূলাঙ্গুলেশ্ছঃ। —৪।৩।৬২

[illegible] অঙ্গুলিমুদ্রা হারাইয়াই শকুন্তলাকে অশেষ দুঃখ অনুভব করিতে হইয়াছিল।[১৫৫] এই শ্রেণীর আংটিতে বিষাপহারক মণিও সন্নিবেশিত হইত, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকপাঠে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দাসী কৌমুদিকা শিল্পগৃহ হইতে আনীত দেবীর নাগচিহ্নিত মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুলীয় দেখিতে দেখিতে বকুলাবলিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল,[১৫৬] এবং এই মুদ্রার প্রভাবে বিদূষকের কৃত্রিম বিষবিকার নিবৃত্ত হইয়াছিল।

—

কটিসূত্র

দেহধার্য অলঙ্কারপ্রসঙ্গে হারের পরেই কটিধার্য আভরণ উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী-কটিতে ধার্য এই আভরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেখা যায়। তন্মধ্যে স্ত্রীকটিতে ধারণীয় মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, রশনা ও সারসন নামে অভিহিত হয় (স্ত্রীকট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রশনা তথা ক্লীবে সারসনং বা)। অমরসিংহ পাঁচটি শব্দকেই এক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থান্তরে ইহাদের বিশেষ পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

যথা, একযষ্টি অর্থাৎ একলহর কটিভূষণ কাঞ্চী, অষ্টযষ্টি কটিভূষণ মেখলা, ষোড়শযষ্টি রশনা, এবং পঞ্চবিংশতিযষ্টি কলাপনামে পরিচিত।[১৫৭] পুরুষের কটিস্থ এই আভরণ শৃঙ্খল নামে অভিহিত হইয়াছে। যদিও অমরসিংহ স্ত্রীকটির আভরণকেই 'সারসন' নামে নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি সাহিত্যে পুরুষ কটির আভরণেও সারসন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'শিশুপালবধে' এই আভরণে নিহিত মুক্তাময় পাদাগ্রপর্যন্ত ব্যাপ্ত মালার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা,— 'ইহার (কৃষ্ণের) সারসনে লম্বমান আপ্রপদীন মুক্তাময় দাম (মালা) শোভা পাইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইত যেন অঙ্গুষ্ঠ-নির্গত গঙ্গাজল বিস্তৃত-ধারাকারে ঊর্ধ্বদিকে

১৫৫ একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে! মদবরোধ-নিদেশবর্তী নেতা জন স্তব সমীপমুপেষ্যতীতি। —শকুন্তলা.৬।৪।৮৪

১৫৬ আক্কোবউলাবলিআ, সহি! দেবী এ ইদং শিপ্পি স আসাদো
আনীদং নাগমুদ্দাসনাহং অঙ্গুলী অ অং সিনিদ্ধং নিভালঅন্তী
তুহ উবালম্ভে পড়িদহ্ম। —১ম অঙ্ক।

১৫৭ একা যষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলাত্বষ্টযষ্টিকা।
রশনা ষোড়শজ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ। —ভানুজী।

ছুটিতেছে।'[১৫৮] কাদম্বরীতেও মেখলাভরণে শব্দায়মান রত্নমালার সমাবেশ দেখা যায়। যথা,— 'সঞ্চরণকারী বেশ্যাজনের জঘনস্থলের আস্ফালনবশতঃ কণিত ক্ষুদ্র রত্নমালাযুক্ত মেখলার মনোহারী ঝঙ্কারের দ্বারা।'

সুবন্ধুর বাসবদত্তাতেও রশনায় রত্নমালা নিধানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৫৯] কালিদাসের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সূত্রগ্রথিত কেবল মণির দ্বারাও মেখলা নির্মিত হইত। যথা,— 'রসভরে সত্বর উত্থিত কোনও রমণীর অর্ধগ্রথিত মেখলা হইতে রত্নগুলি ক্রমে গলিত হইয়া পড়ায়, সেই রশনা অঙ্গুষ্ঠার্পিত সূত্রমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছিল।[১৬০] কবিকঙ্কণের বর্ণনায় শরীরে মধ্যভাগে কিঙ্কিণী ধারণের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬১] প্রস্তরমূর্তির গাত্রেও এই আভরণের বড় ছড়াছড়ি।

—

পাদাভরণ

চরণে ধারণীয় আভরণ পাদাঙ্গদ, তুলাকোটি, মঞ্জীর, নূপুর, হংসক ও পাদকটক, এই কয়টি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল শব্দের অর্থগত কোনও বিশেষ আছে কিনা, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা না। যদিও ছয়টি শব্দ সমভাবে পঠিত হইয়াছে, তথাপি সাধারণের নিকট নূপুর বিশেষরূপে পরিচিত।

—

নূপুর

সাহিত্যে নূপুরের বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু কি উপাদানে নূপুর নির্মিত হইত, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাণভট্টবর্ণিত চাণ্ডাল-কন্যকার নূপুরে মণির উৎসর্পিকিরণজালের বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু ইহাতেও মণিমাত্রকে নূপুরের

১৫৮ মুক্তাময়ং সারসনাবলম্বি ভাতিস্ম দামাপ্রপদীনমস্য।
অঙ্গুষ্ঠ-নিষ্ঠ্যূতমিবোর্ধমুচ্চৈস্ত্রিস্রোতসঃ সন্ততধারমম্ভঃ। —৩।৮

১৫৯ গগনলক্ষ্মীরত্নরসনা মালেব। —২৮২ পৃঃ

১৬০ অর্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠ-মূলার্পিত-সূত্রশেষা। —রঘুবংশ ৭-১০

১৬১ ত্রিবলি বলিত মাঝে, কনক কিঙ্কিণী সাজে, উরুযুগ রম্ভার সমান।

উপাদান রূপে স্থির করা যায় না। কারণ, উপাদানান্তরে নির্মিত নূপুরেও মণি-নিবেশ সম্ভব হয়। মণিমঞ্জীরপ্রভৃতি শব্দেও মধ্যপদলোপানুসারে এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে। পরযুগের সাহিত্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বর্ণনায় দর্শিত মতেরই অনুকূলতা দেখা যায়। কবিপ্রবর জগদম্বার চরণ-পঙ্কজে মণিময় কাঞ্চননূপুরের সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন।[১৬২] ইহার আকৃতি কিরূপ ছিল, স্পষ্টতঃ তাহার কোনই উল্লেখ নাই। তবে 'হংসক' এই শব্দের নিরুক্তি অনুসারে বোধ হয়, ইহার আকার কতক অংশে যেন হাঁসের মত হইতে পারে। কারণ, 'হংস ইব' এই অর্থে কন্ প্রত্যয়ের দ্বারা হংসক রূপ সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু এই নিরুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ, 'হংস ইব কায়তি শব্দায়তে', অর্থাৎ হাঁসের মত শব্দ করে, এই অর্থে হংসোপপদ কৈ ধাতুর পর ড প্রত্যয়ের দ্বারাও এইরূপ সিদ্ধ হইতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনাও পরবর্তী মতের অনুকূল। কাদম্বরীতে নূপুর শব্দে হংসের আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের কল্পনাও দময়ন্তীর চরণযুগলে বিধির বাহন হংসযুগলকে প্রেরণ করিয়া, চরণদ্বয়ের সহংসকতা সম্পাদন করিয়াছে।[১৬৩]

—

কেয়ূর

কেয়ূর এবং অঙ্গদ, এই উভয়শব্দ বাচ্য অলঙ্কার, বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ব্যবহৃত হইত। বর্তমান কালের বাজু, অনন্ত প্রভৃতি এই স্থানে পরিহিত হয়। কবিপ্রবর বাণভট্ট রাজা শূদ্রকের বাহুশিখর অর্থাৎ বাহুর ঊর্ধ্বভাগ, কেয়ূরের দ্বারা পরিশোভিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে কেয়ূর বাজু নামে পরিচিত হইতেছে, কিন্তু বাণভট্টের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, সেকালের কেয়ূরের সহিত একালের কেয়ূরের কিছুমাত্র জ্ঞাতিত্ব নাই। কারণ, সেকালের কেয়ূর নিগড়-শঙ্কা জন্মাইত, সেই কেয়ূর দেখিয়া লোকে তাহাকে সর্প বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিত, অতএব জিনিসটা যে গোলাকার হইত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং বর্তমান কালের অনন্তকে কেয়ূরের বংশধর বলা যাইতে পারে।

---

১৬২ সুচারু নিতম্ব সাজে চরণ পঙ্কজে রাজে মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।

১৬৩ জলজে রবি সেবয়েব যে পদমেতৎ পদতা মবাপতুঃ।
ধ্রুবমেত্য রুতঃ সহংসকী-কুরুত স্তে বিধিপত্র-দম্পতী ॥ —নৈষধ ২।৩৮

বলয়

প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ কনুইয়ের নিম্নভাগে ধারণীয় অলঙ্কার আবাপক, পারিহার্য, কটক ও বলয়, এই চারি নামে অভিহিত হইয়াছে। কালিদাসের বর্ণিত বিরহী যক্ষের প্রকোষ্ঠ বিরহজনিত কৃশতাবশতঃ স্বর্ণবলয়রহিত হইয়াছিল।[১৬৪] মাঘের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের বলয়ে পদ্মরাগমণি নিধানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৬৫] বাণভট্টের লেখনী চাণ্ডাল কন্যকার হস্তে রত্ননির্মিত বলয় সন্নিবেশিত করিয়াছে। (প্রচলিত রত্ন বলয়েন)।

—

কঙ্কণ

বলয়ের অধোদেশেই কঙ্কণের অধিকার। এই আভরণ করভূষণ নামেও কথিত হইয়াছে। (কঙ্কণং করভূষণং। — অমরকোষ, মনুষ্যবর্গ; ১০৮) মধ্যযুগের সাহিত্যে কঙ্কণের বড়ই ছড়াছড়ি দেখা যায়। ভবভূতি জানকীর হস্তে কমনীয় কঙ্কণ সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। (অয়মাগৃহীত-কমনীয় কঙ্কণঃ।— উত্তর-চরিত) তিনিই আবার সীতার পরিণয়সময়ে ভার্গবের সহিত সংলাপপ্রবৃত্ত রামচন্দ্রকে কঙ্কণ মোচনার্থ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া এই প্রসঙ্গে সেকালের একটা স্ত্রী-আচারেরও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[১৬৬]

—

---

১৬৪ কনকবলয়-ভ্রংশ রিক্ত প্রকোষ্ঠঃ। —মেঘদূত, ২

১৬৫ নিসর্গরক্তৈর্বলয়াবনদ্ধ তাম্রাশ্মরশ্মিস্থুরিতৈর্নখাগ্রৈঃ। —শিশুপালবধ, ৩।৬

১৬৬ প্রবিশ্য চ কঞ্চুকী। দেবাঃ কঙ্কণ মোক্ষণায় মিলিতা রাজন্
বরঃ প্রেষ্যতাম্। —মহাবীরচরিত

অত্রত্য কঙ্কণ শব্দ অলঙ্কার অর্থে অথবা করসূত্রার্থে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। মেদিনীকোষে কঙ্কণশব্দ করভূষা, সূত্র ও মণ্ডন, এই তিন অর্থে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে সূত্র ও মণ্ডন দুইটি জিনিস কি, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। পাঠ ('কঙ্কণং করভূষায়াং সূত্র মণ্ডনয়োরপি' এইরূপ)। রভসের মতে, 'ক্লীবং মণ্ডনে সূত্রে কঙ্কণং করভূষণং'। ইহাতেও বিশদ হইল না, কারণ মণ্ডনে সূত্রে এই দুইটি পদ বিশেষ্য বিশেষণও হইতে পারে। কিন্তু রত্নকোশকার হস্তমণ্ডন সূত্রকে কঙ্কণ নামে নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মণ্ডন ও সূত্র বিশেষ্য বিশেষণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, (হস্তমণ্ডন সূত্রে স্যাৎ কঙ্কণো না প্রতী সরঃ) এই হস্তমণ্ডন সূত্র বর্তমানকালীন কাঁঠি পোয়ালো বলিয়া বোধ হয়।

চুড়ি

শেষ যুগের সাহিত্যে শঙ্খবলয়ের মধ্যবর্তী চুড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কবিকঙ্কণ কালকেতুকে গালাহাটে জিনিস কিনিতে পাঠাইয়া, তথা হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গৃহিণীর জন্য সোনার চুড়িও ক্রয় করাইয়াছেন। যথা— 'হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা, কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।' কবিকঙ্কণের উক্তিতে কুলপিয়া অর্থাৎ খিল দেওয়া শঙ্খের উল্লেখ দেখা যায়।[১৬৭] ইহাতে বোধ হয়, তাহার সময় কুলপিয়া শঙ্খ ধারণ জাঁক-জমকের পরিচয় ছিল।

—

—

১৬৭ পরি দিব্য পাটশাড়ি, কনক রচিত চুড়ি, দুই করে কুলপিয়াশঙ্খ।

রত্ন

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পদে পদে রত্নের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নৃপতিদিগের সিংহাসন প্রভৃতির উপকরণ রূপে, সাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারোপযোগী বস্তুবিশেষের উপাদান রূপে, এবং অনেক বস্তুর শোভা-সম্পাদকরূপে ব্যবহার্য, রত্ননিচয়ের প্রভূত শ্রেণী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়, আবার ধর্মকর্মের অঙ্গরূপেও বিভিন্ন জাতীয় রত্নের উপযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহদোষ প্রশমনার্থ রত্নবিশেষ ধারণের ব্যবস্থা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার রোগ দূরীকরণেও রত্নের অচিন্ত্যপ্রভাব শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং রত্ন সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পক্ষে বিবিধ শাস্ত্রের অনেক স্থলই বিশদভাবে বুঝিবার উপায় নাই। রত্ন পরিচয় সাহিত্যানুশীলনরত মানবমাত্রেরই আবশ্যক; অতএব আমরা এই স্থলে রত্ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রত্নের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতায় দুই প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পৌরাণিকগণ বলেন— ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বলনামক দৈত্যের অস্থি প্রভৃতি হইতে রত্ন সম্ভূত হইয়াছে। কাহারও মতে দধীচিমুনির অস্থি হইতে রত্নের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ মনীষিগণ বলেন— পৃথিবীর স্বভাববশতই প্রস্তরের বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে[১], সুতরাং প্রস্তরবিশেষই রত্ননামে অভিহিত হয়।

যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে রত্নের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক বচন প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে; অতএব ইহাতেও দৈত্যেন্দ্রের শরীরস্থ পদার্থ হইতেই রত্নের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। পৌরাণিক-মতে নয়টি মণির নাম সুপ্রসিদ্ধ, যথা— বজ্র (হীরক), গারুত্মত, পুষ্পরাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য, মুক্তা এবং প্রবাল।[২]

১ রত্নানি বলাদ্দৈত্যাদ্দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবা দ্বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্। —বৃ. সং ৭৯।৩

২ রত্নং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ
ইন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্যমিত্যপি।
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈনব॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে মুক্তা প্রভৃতি নয়টি মহামণি নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা— মুক্তা, হীরক, বৈদূর্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীল, গারুত্মত এবং প্রবাল, এই নয়টি মহারত্ন।[৩]

শারদা-তিলকে নব-রত্নের উল্লেখ আছে, তাহাতে মাণিক্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—মাণিক্য, গোমেদ, হীরক, মরকত, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য, নীলমণি এবং পুষ্পরাগ। বরাহমিহির রত্নের যে সমস্ত নাম নির্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে বাইশ প্রকার রত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—১ বজ্র (হীরক), ২ ইন্দ্রনীল, ৩ মরকত, ৪ কর্কেতর, ৫ পদ্মরাগ, ৬ রুধিরাখ্য, ৭ বৈদূর্য, ৮ পুলক, ৯ বিমলক, ১০ রাজমণি, ১১ স্ফটিক, ১২ চন্দ্রকান্ত, ১৩ সৌগন্ধিক, ১৪ গোমেদক, ১৫ শঙ্খ, ১৬ মহানীল, ১৭ পুষ্পরাগ, ১৮ ব্রহ্মমণি, ১৯ জ্যোতীরস, ২০ সম্যক্, ২১ মুক্তা, ও ২২ প্রবাল।[৪]

পূর্বে রত্ন মাত্রেরই উপলত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, অত্রত্য শঙ্খ ও মুক্তা এই দুইটি মণিতে প্রস্তরত্ব নাই, ইহারা জান্তব পদার্থ। বোধহয় অধিক সংখ্যক রত্নের প্রস্তরত্ব দেখিয়া বরাহমিহির রত্ন মাত্রকেই উপল নামে নির্দেশ করিয়াছেন।

তিনি উল্লিখিত রত্নের মধ্যে কেবল বজ্র মুক্তা পদ্মরাগ ও মরকত, এই চারিপ্রকার রত্নেরই লক্ষণাদি লিখিয়াছেন। টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন—রত্ন-সমূহের মধ্যে উক্ত চারিপ্রকার রত্নই উৎকৃষ্ট, আচার্য এই চারিপ্রকার রত্নেরই লক্ষণ করিয়াছেন।[৫]

যুক্তিকল্পতরুতে আরও অনেকগুলি রত্নের নাম কথিত হইয়াছে। যথা— বজ্র, মরকত, পদ্মরাগ, মৌক্তিক, ইন্দ্রনীল, মহানীল, বৈদূর্য, গন্ধ, চন্দ্রকান্ত, সূর্যকান্ত, স্ফটিক, বলক, কর্কেতর, পুষ্পরাগ, জ্যোতীরস, স্ফটিক, রাজবর্ত, রাজমত, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, ব্রহ্মময়, গোমেদ, রুধিরাখ্য, ভল্লাতক, ধূলীমরকত,

৩ মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদূর্যং পদ্মরাগকং
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা।
প্রবাল-যুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈনব॥

৪ বজ্রেন্দ্রনীলমরকতকর্কেতর-পদ্মরাগ-রুধিরাখ্যাঃ।
বৈদূর্যপুলকবিমলক-রাজমণি-স্ফটিক-শশিকান্তাঃ॥
সৌগন্ধিক-গোমেদ শঙ্খ-মহানীল-পুষ্পরাগাখ্যাঃ।
ব্রহ্মমণি-জ্যোতীরস-সম্যক্-মুক্তাফলক-প্রবালানি॥ —১২।৪।৫

৫ উৎকৃষ্টানি চত্বারি, বজ্র-মুক্তা-পদ্মরাগ-মরকতাখ্যানি,
তেষামেব লক্ষণমাচার্যঃ করোতীতি সম্বন্ধঃ।

তুত্থক, সীস, পীলু, প্রবাল, গিরিবজ্র, ভুজঙ্গমামণি, বজ্রমণি, তিত্তিভ, পিত্ত, ভ্রামর, এবং উৎপল।[৬]

যুক্তিকল্পতরুতে বজ্র, পদ্মরাগ, প্রবাল, গোমেদ, মুক্তা, বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল এবং মরকত, এই আটটি মুখ্য রত্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। মরকত পরীক্ষার অনন্তর গ্রন্থকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অষ্টপ্রকার মুখ্যরত্নের লক্ষণ প্রভৃতি নিরূপণানন্তর যথাক্রমে অমুখ্য রত্নসকলের লক্ষণ কথিত হইবে।[৭]

—

হীরক

এই গ্রন্থে হীরক প্রভৃতি রত্নের ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ কথিত হইয়াছে, যথা — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-ভেদে হীরক চারি প্রকার। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়জাতি রক্তবর্ণ, বৈশ্যজাতি পীতবর্ণ, এবং শূদ্রজাতি কৃষ্ণবর্ণ।[৮] বিভিন্ন জাতীয় মণি-ধারণের অধিকারগত পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

যুক্তিকল্পতরুতে পদ্মরাগ পরীক্ষা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার যে পদ্মরাগ কথিত হইয়াছে, সেইগুলি ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি রাজগণ-কর্তৃক যথাক্রমে ধারণীয়। ইহাতে সম্পত্তি লাভ হয়। অন্যথা করিলে অর্থাৎ এক জাতির ধার্যরত্ন অপর জাতি ধারণ করিলে রোগ-শোক-ভয়

৬ বজ্রং মরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকং।
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্যং গন্ধসংজ্ঞকম্॥
চন্দ্রকান্তং সূর্যকান্তং স্ফটিকং বলকস্তথা।
কর্কেতরং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ॥
স্ফটিকং রাজবর্তঞ্চ তথা রাজমতং শুভম্।
সৌগন্ধিকং তথাগঞ্জং শঙ্খং ব্রহ্মময়স্তথা॥
গোমেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজ।
ধূলীমরকতঞ্চৈব তুত্থকং সীসমেবচ॥
পীলু প্রবালকঞ্চৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব।
ভুজঙ্গমামণিশ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ॥
তিত্তিভঞ্চ তথা পিত্তং ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলম্।
রত্নান্যেতানি সর্বাণি ধার্যাণ্যেব মহীভৃতা॥

৭ অষ্টানাং মুখ্য-রত্নানাং লক্ষণানি নিরূপ্য চ
বক্ষ্যন্তে চান্য-রত্নানাং লক্ষণানি যথাক্রমম্॥

৮ শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা ছায়াশ্চতুর্বিধাঃ
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্র-জাতের্বজ্রস্য চ ক্রমাৎ॥

এবং ক্ষয় হয়।[৯] অনেকগুলি মণিতেই জাতিবিভাগ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বরাহমিহির জাতি বিভাগের কোনও উল্লেখ না করিয়া, কেবল শ্রেণী বিভাগ এবং মূল্যাদির তারতম্য দেখাইয়াছেন। তিনি হীরক প্রভৃতির আকরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশানুসারে জানা যায়, বেনানদীর তট, কোশল, সৌরাষ্ট্র, সৌপরিক, হিমালয়, মতঙ্গ, কলিঙ্গ, ও পৌণ্ড্র এই আটটি দেশ হীরকের আকর।[১০]

গরুড়পুরাণেও বজ্রের আটটি আকর কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সৌপরিকের পরিবর্তে সৌবীরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

হৈম-মাতঙ্গ-সৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্র-কালিঙ্গ-কোশলাঃ
বেনাতটাঃ সসৌবীরা বজ্রস্যাষ্টাবিহাকরাঃ॥

পৌণ্ড্রদেশে হীরক-খনির উল্লেখ সকল প্রমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে পৌণ্ড্রের হীরক কোথায় লুকাইল? এই প্রশ্নের উত্তর যুক্তিকল্পতরুতে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের মতে সত্যযুগে এবং কলিযুগে কোশলদেশে হীরক জন্মিত, হিমালয়ে এবং মতঙ্গপর্বতে ত্রেতাযুগে হীরক উৎপন্ন হইত, পৌণ্ড্রদেশে এবং সুরাষ্ট্রে দ্বাপরযুগে হীরক হইত।[১১]

বরাহমিহির এই সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি হীরকের দেবতাবিশেষ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং কোন্ জাতির পক্ষে কোন্ বর্ণের হীরক ধারণীয়, তাহাও বলিয়াছেন।

তাঁহার মতে শুক্লবর্ণ ষট্‌কোণ হীরক ঐন্দ্র, অর্থাৎ এই জাতীয় হীরকে ইন্দ্রদেবতার অধিষ্ঠান আছে। সর্পমুখাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ হীরক যাম্য (যম ইহার দেবতা); যে হীরক সর্বসংস্থান, অর্থাৎ সমস্ত আকারযুক্ত এবং কদলীকাণ্ডের ন্যায় নীল-পীতবর্ণ, সেই হীরক বৈষ্ণব (বিষ্ণুদৈবত); স্ত্রীলোকের গুহ্যাঙ্গসদৃশ কর্ণিকার পুষ্পসদৃশ বারুণ (বরুণ ইহার দেবতা); ত্রিকোণ অথচ ব্যাঘ্রনেত্রসদৃশবর্ণ হীরক আগ্নেয় (অগ্নি ইহার দেবতা); এবং যবসদৃশাকার অশোক পুষ্প সমানবর্ণ হীরক বায়ব্য অর্থাৎ বায়ু ইহার দেবতা।[১২]

বরাহমিহির হীরকের তিনপ্রকার আকরের উল্লেখ করিয়াছেন—'স্রোত, খনি ও প্রকীর্ণক, বজ্রের এই তিন প্রকার আকর সম্ভব।'[১৩]

টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যেস্থান হইতে জল স্রুত হয়, তাহা 'স্রোত', খনি শব্দে 'খাত', এবং 'প্রকীর্ণক', যে ভূমিতে মণি জন্মে, যেমন সমুদ্র।[১৪]

বরাহমিহিরের মতে রক্ত এবং পীতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়ের, শুভ্র হীরক ব্রাহ্মণের, শিরীষপুষ্প-সদৃশ হীরক বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (বৃহৎসংহিতা ৭৯।১১)

বরাহমিহির এবং যুক্তিকল্পতরুকার পৌরাণিক মতের অনুসরণ করিয়া হীরক প্রভৃতি রত্নের মূল্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে তাহা এইস্থলে উপেক্ষিত হইল। যুক্তিকল্পতরুতে যে সমস্ত রত্নের নামোদ্দেশ করা হইয়াছে, তদতিরিক্ত ভীষ্মমণি প্রভৃতির বিবরণও উক্তগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহমিহির মোটামুটি হীরকের শুভাশুভ লক্ষণ প্রভৃতি নির্দেশ করিয়াছেন। যুক্তিকল্পতরুতে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

—

মুক্তা

বৃহৎসংহিতায় হীরকের পরেই মুক্তার লক্ষণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তার সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তা-প্রসঙ্গেই মুক্তা-রচিত ভূষণের সংজ্ঞা বৃহৎসংহিতায় কথিত হইয়াছে।

বৃহৎসংহিতোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হস্তী, সর্প, শুক্তি (ঝিনুক),

৯ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্যান্ত্যাশ্চতুর্ধা যে প্রকীর্তিতাঃ
চতুর্বিধৈর্ণৃপতিভি র্ধার্যাঃ সম্পত্তিহেতবে।

১০ বেনাতটে বিশুদ্ধং শিরীষ-কুসুম-প্রভঞ্চ কৌশলজম্
সৌরাষ্ট্রকমাতাম্রং কৃষ্ণং সৌপরিকং বজ্রম্॥
ঈষত্তাম্রং হিমবতি মতঙ্গজং বল্লপুষ্প-সকাশম্।
আপীতঞ্চ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ্ড্রেষু সম্ভূতম্॥ —বৃ. সং।৭৯

১১ কৃতযুগে কলিযুগে কোশলে বজ্র-সম্ভবঃ
হিমালয়ে মতঙ্গাদ্রৌ ত্রেতায়াং কুলিশোদ্ভবঃ।
পৌণ্ড্রকে চ সুরাষ্ট্রে চ দ্বাপরে পবি-সম্ভবঃ॥

১২ ঐন্দ্রংষড়স্রি শুক্লং যাম্যং সর্পাস্যরূপ মসিতম্।
(ঐন্দ্রং ষড়স্রি শুক্লং যাম্যং সর্পাস্য সদৃশমসিতঞ্চ)
কদলীকাণ্ডনিকাশং বৈষ্ণব মিতি সর্বসংস্থানম্
বারুণমবলাগুহ্যোপমং ভবেৎ কর্ণিকার-পুষ্প-নিভম্।
শৃঙ্গাটক-সংস্থানং ব্যাঘ্রাক্ষিনিভঞ্চ হৌতভুজম্।
বায়ব্যঞ্চ যবোপমমশোক-কুসুম-প্রভং সমুদ্দিষ্টম্॥ বৃ. সং।৭৯।৮।১০

১৩ স্রোতঃ খনিঃ প্রকীর্ণকমিত্যাকর-সম্ভবস্ত্রিবিধিঃ।

১৪ স্রোতো যতো জলং স্রবতি। খনি খন্যতে ইতি খনিঃ খাতম্। প্রকীর্ণকং যস্যা ভূমৌ মণয়ো ভবন্তি। সমুদ্রো যথা।

শঙ্খ, মেঘ, বাঁশ, তিমি, ও শূকর, এই সপ্তপদার্থ হইতে মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শুক্তি-জাত মুক্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সিংহল, পরলোকদেশ, সুরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণী নদী, পারশবদেশ, কৌবের দেশ, পাণ্ড্যবাটকদেশ ও হৈম, এই আটটি দেশ মুক্তার আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ।[১৫]

ভাবপ্রকাশে মৎস্য এবং ভেক, এই দুই জন্তু হইতেও মুক্তার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।[১৬]

পরীক্ষকগণ বিচারপূর্বক মুক্তার আটটি গুণ স্থির করিয়াছেন, যথা— সুতার, সুবৃত্ত, স্বচ্ছ, নির্মল, ঘন, স্নিগ্ধ, সচ্ছায় ও অস্ফুটিত। যাহা নক্ষত্রের দ্যুতির মত ঝক্ ঝক্ করে, তাহা সুতার। যাহা সর্বদিকে গোলাকার তাহা সুবৃত্ত। যাহাতে কোন প্রকার দোষ নাই, তাহা স্বচ্ছ। যাহা মলসম্পর্করহিত তাহা নির্মল। তুলনায় যাহার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা ঘন। যাহা তৈলাদি স্নেহপদার্থের দ্বারা লিপ্তের মত প্রতিভাত হয়, তাহা স্নিগ্ধ। যাহা ছায়া-সমন্বিত অর্থাৎ প্রতিবিম্বযুক্ত তাহা সচ্ছায়। যাহাতে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন নাই, তাহা অস্ফুটিত।[১৭]

মুক্তার দশপ্রকার দোষের পরিচয় পাওয়া, যথা— যাহার একদেশে শুক্তিখণ্ড লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা শুক্তিলগ্ন নামে কথিত। সেই দোষ কুষ্ঠরোগকারক। মুক্তাতে মাছের চক্ষুর মত যে চিহ্ন দেখা যায়, সেই দোষ মৎস্যাক্ষ নামে কথিত এবং পুত্র বিনাশকর। দীপ্তি-রহিত এবং ছায়া-শূন্য মৌক্তিক

১৫ দ্বিজ-ভুজগ-শুক্তি-শঙ্খাভ্র-বেণু-তিমি-শূকর-প্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥
সিংহলক-পারলৌকিক-তাম্রপর্ণা-পারশবাঃ।
কৌবের পাণ্ড্যবাটক হৈমা ইত্যাকরাস্ত্বষ্টৌ॥ বৃ. সং ৮০।১-২

১৬ শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দুরঃ
বেণুরেতে সমাখ্যতা তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।

১৭ সুতারঞ্চ সুবৃত্তঞ্চ স্বচ্ছঞ্চ নির্মলং তথা
ঘনং স্নিগ্ধঞ্চ সচ্ছায়ং তথাস্ফুটিতমেবচ॥
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ
তারকা-দ্যুতি-সঙ্কাশং সুতারমিতি গদ্যতে॥
সর্বতো বর্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে।
স্বচ্ছং দোষ-বিনির্মুক্তং নির্মলং মল-বর্জিতম্॥
গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্‌ঘনং মৌক্তিকং বরম্
স্নেহেনেব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে॥
ছায়া-সমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে
ব্রণরেখাবিহীনঃ যত্তৎস্যাদস্ফুটিতঃ শুভম্॥

জঠর নামে কথিত, এই মৌক্তিক ধারণ করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রবালের আভাযুক্ত মৌক্তিক অতিরক্ত নামে অভিহিত, উহা দারিদ্র্যজনক; অতএব পরিত্যাজ্য। যে মুক্তাতে উপর্যুপরি রেখা বিদ্যমান থাকে, সেই মুক্তা ত্রিবৃত্ত নামে কথিত হয়, তাহা ধারণ করিলে সৌভাগ্যক্ষয় হয়। যে মুক্তা গোলাকার নহে, সেই মুক্তা চিপিট নামে অভিহিত, তাহা ধারণ করিলে কীর্তিনাশ হয়। ত্রিকোণ মৌক্তিক ত্র্যস্রনামে কথিত, তাহা ধারণ করিলে সৌভাগ্যনাশ হয়। দীর্ঘাকার মুক্তা কৃশ নামে কথিত, ইহা ধারণ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়। যে মুক্তার একদিক্ ভুগ্ন সে কৃশপার্শ্ব নামে কথিত। দোষযুক্ত মুক্তা নিন্দনীয় এবং উদ্যমনাশকর।[১৮]

মুক্তার কান্তি সাধারণতঃ চারিপ্রকার, হীরকাদির ন্যায় ইহারও জাতিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তিকল্পতরুতে কথিত হইয়াছে যে, রত্নতত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ কর্তৃক মুক্তার পীতা, মধুরা, সিতা ও নীলা, এই চারি প্রকার ছায়া অর্থাৎ কান্তি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পীতচ্ছায়া লক্ষ্মীপ্রদানসমর্থা, মধুরচ্ছায়া বুদ্ধি-বৃদ্ধিকরী, শুক্লচ্ছায়া যশস্করী এবং নীলচ্ছায়া সৌভাগ্যদায়িনী। শুক্লচ্ছায় মৌক্তিক ব্রাহ্মণ, সূর্যের মত রক্তচ্ছায় মৌক্তিক ক্ষত্রিয়, পীতচ্ছায় মৌক্তিক বৈশ্য এবং কৃষ্ণচ্ছায় মৌক্তিক শূদ্র বলিয়া পরিচিত।[১৯]

১৮ যত্রৈকদেশে সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে।
শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ স দোষঃ কুষ্ঠকারক॥
মীনলোচন-সঙ্কাশো দৃশ্যতে মৌক্তিকে তু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ স্যাৎ পুত্রনাশ-করো ধ্রুবঃ॥
দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠরং তদ্বিদুর্বুধাঃ
তস্মিন্ সংধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্রসংশয়॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায়মতিরক্তং বিদুর্বুধাঃ
দারিদ্র্য-জননং যস্মাত্তস্মাত্তৎপরিবর্জয়েৎ॥
উপর্যুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়ো যত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তস্যোক্তং সৌভাগ্যক্ষয়-কারকম্॥
অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ চিপিটং তন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন তস্যাকীর্তির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
ত্রিকোণং ত্র্যস্রমাখ্যাতং সৌভাগ্য-ক্ষয়কারকম্
দীর্ঘং যত্তৎকৃশং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবিধ্বংস-কারকম্॥
নির্ভুগ্নমেকতো যচ্চ কৃশপার্শ্বং তদুচ্যতে
সদোষং মৌক্তিকং নিন্দ্যং নিরুদ্যোগ-করং পরম্॥

১৯ চতুর্ধা মৌক্তিকেচ্ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্ব-পরীক্ষকৈঃ॥
পীতা লক্ষ্মী-প্রদাচ্ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্ধিনী
শুক্লা যশস্করীচ্ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥

মুক্তার বিবরণ অতি বিস্তৃত ; তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে গেলে কেবল মুক্তার বিবরণেই এক গ্রন্থ হইতে পারে। বরাহমিহিরও বিস্তৃতির দিকে না যাইয়া সাধারণতঃ দোষগুণাদির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ; আমরাও সেই রীতির অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপতঃ মুক্তার বিষয় এইখানেই সমাপ্ত করিলাম।

—

পদ্মরাগ

পদ্মরাগ শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, ইহার বর্ণ পদ্মের মত। কিন্তু বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পদ্মরাগের ভিন্ন ভিন্ন কান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আকরের প্রভেদানুসারে উহার দ্যুতিগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

সৌগন্ধিক এবং কুরুবিন্দ এই দুই প্রকার ধাতু ও স্ফটিক প্রস্তর—এই তিন বস্তু হইতে অর্থাৎ ইহাদের খনি হইতে পদ্মরাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৌগন্ধিকজাত পদ্মরাগ ভ্রমরবর্ণ, অঞ্জনবর্ণ, পদ্মবর্ণ এবং জম্বুরসবর্ণ হইয়া থাকে। কুরুবিন্দোৎপন্ন পদ্মরাগ শবল অর্থাৎ মিশ্রবর্ণ, ইহাদের দ্যুতি অল্প, এবং ইহাদের সহিত গৈরিক প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। স্ফটিকোৎপন্ন পদ্মরাগ অত্যন্ত দ্যুতিশালী, নানাবর্ণ এবং নির্মল হইয়া থাকে।[২০]

—

মরকত

যুক্তিকল্পতরুতে মণির পৌরাণিক উৎপত্তি-বিবরণ এবং জাতিভেদ ও দোষগুণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সিতচ্ছায়ো ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চার্করশ্মিমান্
পীতচ্ছায়ো ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণরুচির্মতঃ।

২০ সৌগন্ধিক-কুরুবিন্দ-স্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগ-সম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরাঞ্জনাব্জ-জম্বুরসদ্যুতয়ঃ॥
কুরুবিন্দভবাঃ শবলা মন্দদ্যুতয়শ্চ ধাতুভির্বিদ্ধা।
স্ফটিকভবা দ্যুতিমন্তো নানাবর্ণা বিশুদ্ধাশ্চ॥ —বৃহৎসংহিত ৮১

টীকাকার ভট্টোৎপল অব্জশব্দের উৎপলার্থও গ্রহণ করিয়াছেন॥ 'অব্জবর্ণা, উৎপলবর্ণা বা তত্তুল্যকান্তয়ঃ' জম্বুরসসমানকান্তি বলায়, ভট্টোৎপলের মতে লোহিতবর্ণ অভিপ্রেত হইয়াছে। 'জম্বু বৃক্ষবিশেষঃ তদ্রসসমানকান্তয়ো লোহিতবর্ণাঃ।'

বৃহৎসংহিতায় কেবল ইহার চারি প্রকার বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে কেবল শুভলক্ষণ মরকতেরই বর্ণ কথিত হইয়াছে। যথা—

শুকবংশ-পত্রকদলী-শিরীষকুসুম-প্রভং গুণোপেতম্
সুরপিতৃকার্যে মরকতমতীব-শুভদং নৃণাং বিহিতম্। —৮২।১।১

ইহার অর্থ— যে মরকতমণি শুকপক্ষীর পক্ষের সমানবর্ণ, অথবা বংশপত্রের মত বর্ণযুক্ত, অথবা কদলীর ন্যায় বর্ণান্বিত কিংবা শিরীষ পুষ্পের সমানবর্ণ অর্থাৎ শ্বেত পীতবর্ণ, সেইরূপ মরকত মানবদিগের দেবপিতৃকার্যে অত্যন্ত শুভফল প্রদান করে।

যুক্তিকল্পতরুতে উহার আট প্রকার ছায়ার উল্লেখ আছে। এই আটপ্রকার ছায়া ময়ূরপিচ্ছতুল্য, চাসপক্ষীর পক্ষতুল্য, হরিকোচ তুল্য (হরিৎকাচ-তুল্য) শৈবালতুল্য, খদ্যোতপৃষ্ঠতুল্য, শুকশিশুর তুল্য, নূতন তৃণাবৃত ভূমির তুল্য এবং শিরীষ পুষ্পের সমান বর্ণ।[২১]

যে মরকত মণি হস্তন্যস্ত হইয়া সূর্যকিরণসংস্পর্শে নিজ রশ্মির দ্বারা (হস্তকে) রঞ্জিত করে, সেই মণি মহামরকত নামে অভিহিত হয়।[২২]

—

বৈদূর্যমণি

বৈদূর্যমণির উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, প্রলয়কালে ক্ষুভিত সমুদ্রনাদ-সদৃশ দৈত্যাধিপতির ভীষণ শব্দ হইতে নানাবর্ণ বৈদূর্যমণির উৎপত্তি হইয়াছে।

২১ ভবেদষ্টবিধচ্ছায়া মণের্মরকতস্য চ।
বর্হিপিচ্ছ-সমাভাসা চাসপক্ষ-সমাপরা॥
হরিকোচ (হরিৎকাচ)-নিভাচান্যা তথাশৈবাল-সন্নিভা
খদ্যোতপৃষ্ঠ-সঙ্কাশা বালকীর-সমা তথা॥
নবশাদ্বল-সচ্ছায়া শিরীষ-কুসুমোপমা
এবমষ্টৌ সমাখ্যাতাশ্ছায়া মরকতস্যচ॥

(চাসপক্ষী স্বর্ণচাতক বা স্বর্ণচূড় নামে প্রসিদ্ধ।)

যুক্তিকল্পতরুতে এবং শব্দকল্পদ্রুমে 'হরিকোচ' শব্দ লিখিত হইয়াছে, ইহা লেখকের প্রমাদসম্ভূত বলিয়া মনে হয়। হয়ত 'হরিৎ' শব্দের খণ্ড তকার 'কাচ' শব্দের ক-কারের পশ্চাতে যুক্ত হইয়া এই অভিনব শব্দের আবিষ্কার করিয়াছে। যুক্তিকল্পতরুতে বিভিন্নবর্ণ কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

২২ যস্তু ভাস্কর-সংস্পর্শাৎ হস্তন্যস্তো মহামণিঃ
রঞ্জয়েদাত্ম-পাদৈস্তু মহামরকতং হি তৎ॥

পদ্মরাগমণিতে যে সমস্ত বর্ণ সম্ভব হয়, বৈদূর্যমণিতেও সেই সমস্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ময়ূরকণ্ঠের মত নীলবর্ণ অথবা বিল্বপত্রের সমান বর্ণ বৈদূর্যই প্রধান, চাসপক্ষীর পক্ষাগ্রতুল্যবর্ণ বৈদূর্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বর্ণ-ভেদে ইহারও ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ বিবেচিত হইয়াছে।

স্থতার ঘন অত্যচ্ছ কলিল ও ব্যঙ্গ, বৈদূর্যের এই পাঁচটি মহাগুণ কথিত হইয়াছে। যাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন দীপ্তি উদ্‌গিরণ করিতেছে, তাহা স্থতার নামে অভিহিত হয়। যাহা পরিমাণে অল্প হইয়াও গুরুত্ব-যুক্ত, তাহা ঘন নামে অভিহিত হয়। যাহা কলঙ্কাদি দোষরহিত তাহা অত্যচ্ছ নামে কথিত হয়। যাহাতে ব্রহ্মশস্ত্রশলাকাকার চঞ্চল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কলিল নামে পরিচিত, এবং রাজার সমস্ত সম্পত্তি-কারক। যে বৈদূর্যের অঙ্গ বিশ্লিষ্ট তাহা ব্যঙ্গ নামে কথিত হয়।[২৩]

—

২৩ কল্পান্তকাল-ক্ষুভিতাম্বুরাশি-নির্হ্রাদতুল্যাদ্দিতিজস্য নাদাৎ।
বৈদূর্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং শোভাভিরামদ্যুতিবর্ণবীজম্ ॥
পদ্মরাগমুপাদায় মণিবর্ণাহি যে ক্ষিতৌ
সর্বাং স্তান্ বর্ণশোভাভির্বৈদূর্যমনুগচ্ছতি ॥
তত্র প্রধানং শিতিকণ্ঠনীলং
যদ্বাভবেদ্ বিল্বদলকাশম্
চাসাগ্রপক্ষপ্রতিমশ্রিয়ো যে
নতে প্রশস্তা মণিশাস্ত্রবিদ্ভিঃ ॥
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রজাতিভেদাচ্চতুর্বিধং
সিতনীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতরক্তস্তু বাহুজঃ
পীতনীলস্তু বৈশ্যঃ স্যান্নীল এবহি শূদ্রকঃ
মার্জারনয়ন-প্রখ্যং রসোনপ্রতিমং হিবা
কলিলং নির্মলং ব্যঙ্গং বৈদূর্যং দেবভূষণম্ ॥
স্থতারং ঘনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেব চ
বৈদূর্যাণাং সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ ॥
উদ্‌গিরন্নিব দীপ্তিং যোহসৌ স্থতার ইতীর্যতে
প্রমাণতোহল্পং গুরু যদ্ ঘনমিত্যভিধীয়তে ॥
কলঙ্কাদি-বিহীনং যদত্যচ্ছমিতি কীর্তিতম্
ব্রহ্মশস্ত্রশলাকারশ্চঞ্চলো যত্র দৃশ্যতে
কলিলং নাম তদ্রাজ্ঞঃ সর্ব সম্পত্তিকারম্
বিশ্লিষ্টাঙ্গস্তু বৈদূর্যং ব্যঙ্গমিত্যভিধীয়তে ॥ —যুক্তিকল্পতরু

ইন্দ্রনীল

পৌরাণিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বলনামক দৈত্যের নেত্রদ্বয় সিংহলদেশে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইন্দ্রনীলমণির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার বর্ণ নীলপদ্মের সদৃশ, ভগবান বলদেবের বসনের মত, ইন্দ্রধনুর মত, মহাদেবের কণ্ঠের মত, কলায় পুষ্পের মত, এবং কৃষ্ণবর্ণ গিরিকর্ণিকা পুষ্পের মত হইয়া থাকে। কতকগুলি বর্ণ ময়ূরের কণ্ঠের মত, এবং একপ্রকার ইন্দ্রনীলের বর্ণ নীলরসোৎপন্ন বুদ্‌বুদের মত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার সুস্পষ্ট বর্ণ-শোভান্বিত ইন্দ্রনীল-মণি মহাগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ইহার বর্ণানুসারে জাতি বিভাগ বিবেচিত হইয়াছে। ইন্দ্রনীলেরই এক শ্রেণী মহানীল নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা— যে নীলমণির মধ্যে ইন্দ্রধনুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা ইন্দ্রনীল নামে এবং যে মণি বর্ণের বাহুল্যনিবন্ধন শতগুণ দুগ্ধে নিহিত হইয়া সমস্ত দুগ্ধকে নীলবর্ণ করিতে সমর্থ হয়, সেই মণি মহানীল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[২৪]

২৪ তত্রৈব সিংহলবধূকর-পল্লবাগ্র-ব্যালূন-বাললবলী-কুসুমপ্রবালে
পততি দিতিজস্য নিতান্তকান্তং প্রোৎফুল্ল-নীরজসমদ্যুতি নেত্রযুগ্মম্।
তৎ প্রত্যয়াদুভয়-শোভন-বীচি-ভাসা
বিস্তারিণী জলনিধেরুপকচ্ছভূমিঃ।
প্রোদ্‌ভিন্ন-কেতকবন-প্রতিবদ্ধ-রেখা-
সান্দ্রেন্দ্র-নীলমণিরত্নবতী বভূব ॥
তত্রাসিতাব্জ-হলভৃদ্‌বসনাভিষঙ্গ-
শক্রায়ুধাঙ্গ হরকণ্ঠ কলায়-পুষ্পৈঃ।
শুক্লেতরৈশ্চ কুসুমৈর্গিরিকর্ণিকায়া-
স্তস্মিন্ ভবন্তি মণয়ঃ সদৃশাবভাসঃ ॥
অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পয়সাং নিধাতু
রম্যত্বিষঃ শিখিগল-প্রতিমাস্তথান্যে।
নীলীরস-প্রসব-বুদ্বুদ-ভাশ্চ কেচিৎ
কেচিত্তথা শমন-কোকিলকশ্চ (কাক্ষ) ভাসঃ ॥
একপ্রকার-বিস্পষ্ট-বর্ণশোভা-বিভাসিনঃ
জায়ন্তে মণয়স্তস্মিন্নিন্দ্রনীলা মহাগুণাঃ ॥
শ্বেতনীলং রক্তনীলং পীতনীলমথাপি বা।
কৃষ্ণনীলং তথাজ্ঞেয়ং ব্রাহ্মণাদি ক্রমেণতু ॥
যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধ-প্রভা
তমিন্দ্রনীলমিত্যাহুর্মুনয়োভুবি দুর্লভম্ ॥
যস্যবর্ণস্য ভূয়স্ত্বাৎক্ষীরে শতগুণে স্থিতম্।
নীলভাবংনয়েৎ সর্বং স মহানীল উচ্যতে ॥

শিশুপালবধ কাব্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ মহানীলমণির সমান কান্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং সেই স্থলে টীকাকার মল্লিনাথ ভগবান্ অগস্ত্যের বচন প্রমাণস্বরূপ উপন্যস্ত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সিংহলদ্বীপ-সম্ভূত ইন্দ্রনীলমণিই 'মহানীল' নামে অভিহিত হয়।[২৫]

কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর প্রদর্শিত গরুড়পুরাণীয় বচনানুসারে সিংহলোৎপন্ন সমস্ত ইন্দ্রনীল মহানীল নামে কথিত হয় না।

যুক্তিকল্পতরুতে ইন্দ্রনীল প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, 'ইন্দ্রনীল'মণি নীলবর্ণ, 'পদ্মরাগ' মণি লোহিত বর্ণ, ঈষন্নীল শুক্লবর্ণ স্নেহলিপ্তবৎ-প্রতীয়মান মণি 'মানবক' নামে কথিত, ঈষদ্রক্তবর্ণ পীতবর্ণ ভিন্ন স্বচ্ছমণি 'কাসায়' নামে পরিচিত। ঈষৎপীত পাণ্ডুবর্ণ প্রস্তর 'পুষ্পরাগ' নামে অভিহিত হয়, এবং পুষ্পরাগই লোহিতাকার হইলে, কৌরণ্ডকনামে অভিহিত হয়।[২৬] ইন্দ্রনীলের বিস্তৃত বিবরণ যুক্তিকল্পতরুতে দ্রষ্টব্য।

মণি সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে। সমস্ত বিষয় এইস্থলে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং কেবল সাহিত্যে বিশেষরূপে সংসৃষ্ট রত্নের লক্ষণ মাত্রই এই স্থলে কথিত হইল।

—

২৫ মহামহানীলশিলারুচঃ পুরো নিষেদিবান্ কংসকৃষঃ স বিষ্টরে।
শ্রিতোদয়াদ্রেরভিসায়মুচ্চকৈরচূচুরচ্চন্দ্রমসোঽভিরামতাম্। —১।১৫
'সিংহলাস্যাকরোদ্ভূতা মহানীলাস্তু তে স্মৃতাঃ' —ইতি ভগবান অগস্ত্যঃ

২৬ ইন্দ্রনীলস্তু নীলাভা পদ্মরাগস্তু লোহিতঃ
আনীলশুক্লস্নিগ্ধস্তু মণির্মানবকো মতঃ॥
আলোহিতমপীতঞ্চ স্বচ্ছং কাসায়কং বিদুঃ
আপীতপাণ্ডু-পাষাণঃ পুষ্পরাগোঽভিধীয়তে॥
তমেব লোহিতাকারমাহুঃ কৌরণ্ডকং বুধাঃ

পাকবিদ্যা

আর্য-সাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাকবিদ্যার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাও সভ্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। এমনকি, স্বাধীন রাজা এবং রাজপরিবারবর্গও আগ্রহের সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পুণ্যশ্লোক নৈষধ এবং মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ উপন্যস্ত হইবার যোগ্য। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এবং তাহার টীকায় এই বিদ্যা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পেরই অংশ-বিশেষ কলা নামে পরিচিত। রাজপুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা-বর্ণনপ্রসঙ্গে কলাশিক্ষারও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং বর্তমান সময়ে যেমন নিরক্ষর উড়ে ঠাকুর বা বিষ্ণুপুরের চাটুর্যে পাচকের পদ একচেটিয়া করিয়াছে, এবং বড়লোকের ভক্ষ্যান্নরস-পাচকতার ভার বাবুর্চির উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, পূর্বকালে তেমন ছিল না। সেকালে অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করিত, এবং তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়া সভ্য-সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিত। ভীমসেন বলিয়াছিলেন যে, 'যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহার (বিরাটের) জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিব।'[১]

খাদ্যের প্রস্তুতপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, পক্ব ও অপক্ব এই দুই প্রকার খাদ্যের বিভাগানুসারে পাক ও তদতিরিক্ত প্রক্রিয়া, এই দুই প্রণালী দেখা যায়। তন্মধ্যে পাকের নানা প্রকার পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেকের বিশ্বাস এবং অভিমত যে, মুসলমানের শুভাগমনের পর হইতেই নানা শ্রেণীর উপাদেয় খাদ্য ভারতবাসীর রসনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব রস বিতরণে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পলান্ন প্রভৃতি নৈপুণ্যোদ্ভাবিত নরদুর্লভ অমৃতায়মান খাদ্য মুসলমান-নরপতিবৃন্দের রসনার প্রীতিসাধনের জন্যই ভারতে পদক্ষেপ করিয়াছে। এই সকল কথা আপাতত অতীত যুগের অবস্থা-জ্ঞাপক ইতিহাসের উপাদান বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই সুপ্রাচীন যুগের সংহিতা, পুরাণ, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, চিকিৎসাগ্রন্থ প্রভৃতির প্রতি

১ কৃতপূর্বাণি যৈরস্য ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ।
তানপ্যভিভবিষ্যামি প্রীতিং সংজনয়ন্নহম্॥ —বিরাটপর্ব, ২য় অধ্যায়

মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, যাহা আমাদের নিজস্ব ছিল, তাহাই ঘটনাচক্রে কালের আবর্তনে বিদেশে উদ্‌ভাবিত শিল্প বলিয়া আজ বিবেচিত হইতেছে।

কত জিনিসে যে এই বিদেশীয় স্বত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাই সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে অনেক সময়ের ও যত্নের প্রয়োজন, সুতরাং আজ কয়টিমাত্র পক্ব বস্তুর উল্লেখ করিব।

পলান্ন ও পোলাও, এই উভয় শব্দের পর্যায়তায় কাহারও প্রায় বিপ্রতিপত্তি দেখা যায় না। কারণ, বর্তমান সময়ে পোলাও যে প্রণালীতে পক্ব হইয়া থাকে, আমাদের পুরাতন পলান্নও সেই প্রণালীর অতিক্রম করিত বলিয়া বোধ হয় না। পলান্ন এই শব্দটি যোগরূঢ়; পল অর্থ— মাংস, তাহার সহিত পক্ব অন্ন পলান্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণ ঘৃতের সহিত ইহার পাক নিষ্পন্ন হয়, ইহার সৌরভে সর্বদিক আমোদিত হইয়া থাকে। ঘৃতের বাহুল্য নিবন্ধন এই অন্ন সর্পিষ্বৎ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্বে ভবভূতির লেখনী এই সর্পিষ্বৎ ভক্তের (অন্নের) মনোহর গন্ধে বাল্মীকির তপোবন সৌরভিত করিয়া গিয়াছে।[২]

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় গণপতির বলিদানে পললৌদনের উল্লেখ দেখা যায়। যথা— কৃতাকৃত (অর্ধকৃত) তণ্ডুল, পললৌদন, পক্ব ও অপক্ব মৎস্য এবং মাংস, বিচিত্র পুষ্প সুগন্ধ দ্রব্য এবং বিবিধ প্রকার সুরা।[৩]

অত্রত্য পললৌদন ও পলান্ন সমানার্থক; কারণ পলল-মাংস, তাহার সহিত পক্ব ওদন (অন্ন) পললৌদন নামেও পরিচিত ছিল। যদিও অপরার্ক এবং মিতাক্ষরা পললৌদন শব্দের তিলপিষ্ট মিশ্র ওদন[৪] এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা অবিচারিত ভাবে তাঁহাদের এই মত গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ অভিধানে পলল শব্দের অর্থান্তর দৃষ্ট হইলেও, মাংস অর্থেই ইহার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং পলান্নের সমানার্থ পললৌদন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগের হেতু দেখা যায় না। পিষ্টতিলের সহিত অন্নপাক প্রসিদ্ধও নহে।

এই অন্নে ঘৃতের প্রাচুর্য-নিবন্ধন, কবিপ্রবর ভবভূতি সর্পিতেই ইহার পাক

২ গন্ধেন স্ফুরতামনাগনুসৃতো ভক্তস্য সর্পিষ্বতঃ
কর্কন্ধূ-ফলমিশ্র-শাকপচনামোদঃ পরিস্তীর্যতে॥ —উত্তরচরিত, ২য় অধ্যায়

৩ কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেবচ।
মৎস্যান্‌পক্কাংস্তথৈবামান্‌ মাংসমেতাবদেবতু॥
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ বিবিধামপি॥ —১।২৮৭-৮৮

৪ তিলপিষ্টমিশ্র ওদনঃ পললৌদনঃ। —৫৫পৃ. অপরার্ক

নির্দেশ করিয়াছেন। যথা— বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই পরশুরামকে বলিতে-ছেন: ‘সর্পিতে অন্নপাক করা হইয়াছে, বৎসতরী সংজ্ঞপন করা হইয়াছে, তুমি শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছ, আমাদের এইসকল দ্রব্য গ্রহণ কর।’[৫]

—

কন্দুপক্ব

প্রাচীন সাহিত্যে ‘কন্দুপক্ব’ নামক একশ্রেণীর খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘কন্দুপক্ব’ এই শব্দটি যৌগিক অর্থাৎ দুইটি শব্দের মিশ্রণে নিষ্পন্ন। কন্দুতে পক্ব বস্তু ‘কন্দুপক্ব’ নামে অভিহিত হয়। সুতরাং ‘কন্দুপক্ব’ চিনিতে হইলে প্রথমত কন্দু চেনা আবশ্যক।

অমরসিংহ একটি কারিকার্ধে ‘অম্বরীষ’, ‘ভ্রাষ্ট্র’, ‘কন্দু’ ও ‘স্বেদ- এই চারিটি শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।[৬] আপাতত এই কারিকার্ধ পাঠে ধ হয়, যেন এই চারিটি শব্দই একার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত ‘অম্বরীষ’ ও ‘ভ্রাষ্ট্র’, এই উভয় শব্দকে ভর্জনপাত্র (খোলা হাঁড়ি) নামে নির্দেশ করিয়া, ‘কন্দু’ ও ‘স্বেদনী’ এই উভয় শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শোষণার্থ ‘স্কন্দ’ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক উ প্রত্যয়ের দ্বারা এবং সকার লোপের দ্বারা ‘কন্দু’ এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। ‘স্বেদনী’ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন যে, স্বিদ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ল্যুট্‌ প্রত্যয়ের দ্বারা ‘স্বেদন’ এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে, অনন্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যোগে ‘স্বেদনী’ এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ধাতু-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের অর্থ স্বেদ করা হয়, অর্থাৎ তাপ দেওয়া হয় যাহাতে। ‘কন্দু’ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ— শোষণ করা হয় যাহাতে। কন্দু ও স্বেদনী একার্থক শব্দ। দীক্ষিত মহাশয় ইহাকে মণ্ডনির্মাণোপযোগী করাহী নামে প্রসিদ্ধ পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে এই অর্থ নির্দেশে

৫ সংজ্ঞপ্যতে বৎসতরী সর্পিষান্নং বিপচ্যতে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়গৃহাণাগতোঽসি জুযস্ব নঃ॥ —বীরচরিত, ৩ অঙ্ক

৬ ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্বা স্বেদনী স্ত্রিয়াম্‌। —অমরকোষ, বৈশ্যবর্গ।

সর্বতোভাবে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আচার্য হেমচন্দ্র 'ভক্ষ্যকার' ও 'কান্দবিক' এই উভয়ের একার্থতা নির্দেশ করিয়া 'কন্দু' ও 'স্বেদনিকা' এই উভয়ের একার্থতা কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তিতে 'ভ্রাষ্ট্র' হইতে 'কন্দু'র পার্থক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অতিরিক্ত কন্দুর স্বরূপজ্ঞাপক বিশেষ কিছু জানা যায় না। হেমচন্দ্র যে পর্যায়ে ভক্ষ্যকারের ও কান্দবিকের নির্দেশ করিয়াছেন, অমরসিংহ সেই পর্যায়ে আপূপিকেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই আপূপিক ভক্ষ্যকারের অন্তরালে অতীত-সমাজ-তত্ত্বের এক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

বর্তমান সময়ে যেমন 'খাবার' বলিলে লুচি কচুরি প্রভৃতি খাদ্য-বিশেষকেই বুঝায়, সেইরূপ পূর্বকালেও ভক্ষ্য বলিলে সাধারণ খাদ্য না বুঝাইয়া 'কান্দব' অর্থাৎ কন্দুপক খাদ্যই বুঝাইত। মহাভারতে ভীমের উক্তিতেও সাধারণ অন্ন হইতে 'ভক্ষ্যে'র স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়।

'ভক্ষ্যান্নরসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ'। (—বিরাটপর্ব)। এই শ্রেণীর খাদ্য পিষ্টক-সমানার্থক অপূপ-পদবাচ্য খাদ্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও, অমরসিংহ এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া কান্দবিকের পর্যায়ে আপূপিকের সন্নিবেশ করিয়াছেন। কান্দবিক শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থানুসারে বুঝা যায়, কন্দুতে সংস্কৃত এই অর্থে কন্দু শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় যোগে কান্দব এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। কান্দব যাহার পণ্য (৪।৪।৫১) অর্থাৎ বিক্রেয়, এই অর্থে কান্দব শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় যোগে 'কান্দবিক' এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অমরের উক্তির পৌর্বাপর্যের পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণ পিষ্টক হইতে কান্দব পদার্থ স্বতন্ত্র। কারণ তিনি পিষ্টকের পাকপাত্রকে 'ঋজীষ' নামে নির্দেশ করিয়াছেন।[৭]

পিষ্টক এবং অপূপ একার্থক শব্দ। পিষ্টকের এবং কান্দবের পাকপাত্র স্বতন্ত্র; পাকপ্রণালীও স্বতন্ত্র। পিষ্টকের পাক সাক্ষাৎ অগ্নিসাপেক্ষ, কান্দবের পাকে সাক্ষাৎ অগ্নির অপেক্ষা নাই। কন্দুটি উষ্ণ করিয়া স্বেদের উপযোগী করিতে কেবল অগ্নির অপেক্ষা। কারণ কন্দুশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ শোষকযন্ত্র, তাহাতে সংস্কৃত খাদ্য— 'কান্দব'। সুতরাং 'কান্দব' পিষ্টক যে সাধারণ পিষ্টক হইতে ভিন্ন, তাহা সুস্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; অতএব 'কান্দব'-মাত্রে অপূপ শব্দ প্রযুক্ত

৭ ঋজীষং পিষ্টপচনং।

হইলেও, অপূপ মাত্রে কান্দব শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। হেমচন্দ্র এই ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কান্দবিকের পর্যায় হইতে আপূপিকের নির্বাসন করিয়াছেন, এবং কান্দবিকের নির্দেশ করিয়াই তাহার পরিচয়ার্থ কন্দুরও নির্দেশ করিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে যেমন এক শ্রেণীর লোক রুটি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, এবং জীবিকার অনুসারে রুটিওয়ালা নামে পরিচিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বকালেও 'কান্দব'-বিক্রেতা 'কান্দবিক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর ভক্ষ্যদ্রব্য বৈশ্যগণ বিক্রয় করিত। বৈশ্য দ্বিজাতি, সুতরাং তাহার পক্বদ্রব্য খাইতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না। যখন শূদ্রগণও এই শ্রেণীর পণ্যে হস্তক্ষেপ করিল, হয়ত সেই সময়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল— 'শূদ্রগৃহ-কৃত ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বিজাতির খাদ্য কি না?' জিজ্ঞাসিত শাস্ত্রকার মীমাংসা করিলেন, কন্দুপক দ্রব্য প্রভৃতি শূদ্রগৃহ-কৃত হইলেও দ্বিজাতির ভক্ষ্য হইবে।[৮]

এই শ্রেণীর কারখানাতে সর্বতোভাবে শৌচাশৌচ বিবেচিত হয় না, তাহা দেখিয়াও হয়ত একটা আলোচনা হইয়াছিল। তাহার মীমাংসায় প্রয়াসী মহর্ষি শাতাতপ ব্যবস্থা করিলেন— গোকুলে, কন্দুশালাতে, অর্থাৎ কন্দুর কারখানায় তৈলযন্ত্রে, ইক্ষুযন্ত্রে, এবং স্ত্রীলোক, বালক ও আতুরের সম্বন্ধে শৌচাশৌচ বিবেচ্য নহে।[৯]

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বিদূষকের উক্তিতে কন্দুর কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষককে বলিলেন, 'সখে! অধিক আর বলিয়া ফল কি? আমার সম্বন্ধে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতে হইবে।' উত্তরে বিদূষক বলিলেন, 'আপনাকেও আমার বিষয়ে ভাবিতে হইবে; কারণ বিপণিস্থিত কন্দুর ন্যায় আমার উদরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে।'

এই উক্তিতে সাধারণতঃ বুঝা যায়, কন্দু বিপণিতে অবস্থিত হইত, এবং তাহার মধ্যভাগ দগ্ধ হইত।

চরকসংহিতায় জেন্তাক-স্বেদের প্রসঙ্গে কন্দুর উল্লেখ দেখা যায়। তত্রত্য

৯ কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহ-কৃতান্যপি॥ —তিথিতত্ত্বে কূর্মপুরাণ

৯ গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥

স্বেদোপযোগী যন্ত্রটি দ্বিপুরুষ-প্রমাণ মৃন্ময় এবং কন্দুসদৃশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।[১০]

অভিধানে 'হসন্তী' নামক একপ্রকার অঙ্গারবাহী ক্ষুদ্র শকটের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১] 'হসন্তী' এই নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে পদার্থ হাসিতেছে তাহাই যেন হসন্তী শব্দের ধাতু-প্রত্যয়ানুযায়ী অর্থ। কিন্তু শকটের হাস্য অসম্ভব; সুতরাং এই প্রয়োগটি সাদৃশ্যার্থে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ হইতেছে, হাস্যকারীর মত। জ্বলদঙ্গারপূর্ণ শকট ঔজ্জ্বল্যনিবন্ধন হাস্যকারীর সদৃশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। জ্বলদঙ্গারেও অঙ্গার শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা— 'অঙ্গার চুম্বিতমিব ব্যথমানমাস্তে'। এই হসন্তী সম্ভবতঃ কন্দুর অভ্যন্তর-দগ্ধকারী অঙ্গারের প্রবেশন-নিষ্কাশন কার্যেই ব্যবহৃত হইত। এই সকল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যে জিনিসের সম্বন্ধে আর্যযুগেও নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল, পাণিনির পূর্বেও যে জিনিসের বাচকশব্দের সাধনের প্রয়াস দেখা যায়, যাহার জন্য স্বতন্ত্র শালা বা প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট ছিল, তাহা যে কত প্রাচীন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সম্ভবতঃ কালের পরিবর্তনে, কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশ হইতে নির্বাসিত 'কন্দু'ই বর্তমানে 'তুন্দুর' নামে পরিচিত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিদেশীয় আগন্তুকরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কন্দুপক্ব বা 'কান্দব' পদার্থই পাঁউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি অনার্যজুষ্ট নাম ধারণ করিয়া খাঁটি হিন্দুর অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়, কূর্মপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যায় 'কন্দুপক্ব' শব্দের যে অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অর্থ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার মতে জলোপসেক-ব্যতীত, অর্থাৎ কোনরূপ জল-সংস্পর্শ-বিনা কেবল পাত্রে অগ্নির দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই 'কন্দুপক্ব' নামে অভিহিত; যেমন ভাজা চাউল প্রভৃতি।[১২] তিনি 'কন্দুপক্ব' চিনাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কন্দু শব্দের অর্থনির্ণয়ে তাঁহাকে উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার এই ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, তিনি অমর-কারিকাস্থ অম্বরীষ

---

১০ দ্বিপুরুষ প্রমাণং মৃন্ময়ং কন্দুসংস্থানম্। —সূত্র, ১৫ অধ্যায়

১১ অঙ্গারধানিকাঙ্গারশকট্যপি হসন্ত্যপি। —অমরকোষ, বৈশ্যবর্গ, ২৯

১২ জলোপসেকং বিনা কেবলপাত্রে যদ্বহ্নিনাপক্বং ভৃষ্টতণ্ডুলাদি।

হইতে স্বেদনী পর্যন্ত চারিটি শব্দকে অবিচারিতভাবে ভর্জন-পাত্র অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকাকারের উক্তিতে বুঝা যায়, তিনিও যেন চারিটি শব্দের একার্থতাই বুঝিয়াছেন,[১৩] এবং অদ্ভুত রকমের একটি ব্যুৎপত্তিও জনান্তরের মত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিই আবার মতান্তরে শোষণ-কারী লৌহপাত্রকে 'কন্দু' নামে নির্দেশ করিয়া, সমর্থনার্থ অমরের কারিকা উপন্যস্ত করিয়াছেন।

এই সকল ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, কি স্মার্ত কি তত্ত্ববোধিনীকার কেহই কন্দু জিনিসটা চিনিতে পারেন নাই; অথবা চিনিবার উপায়ও তাঁহাদের ছিল না। তেঁতুলপাতা সিদ্ধ খাইয়া গৃহিণীর হস্তে রক্তসূত্র পরাইয়া সংসারসুখে অনাসক্ত মনীষিগণ নিরাপদে দার্শনিক কূটতত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন। বাহ্যনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তায় লৌকিক বৃত্তান্ত জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই সত্য, কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্রের সহিত সমাজতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি সংসৃষ্ট, তাহাদের মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, সেই সেই বিদ্যা, সমাজের তাৎকালিক অবস্থা, এবং শিল্প ও শিল্পোপকরণ, এই কয়টির সহিত বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। এই সকল উপাদান সংগ্রহ না করিয়া যাহারা কেবল ব্যাকরণের অথবা কোষের সাহায্যে যে কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যানে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্ভুত ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিয়া আরব্ধ গ্রন্থের সমাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অনভিজ্ঞতার ফলেই কাহারও মতে কন্দু 'মদ্য-নির্মাণোপযোগী পাত্র', কাহারও মতে 'ভোগ-স্থান,' কাহারও মতে 'তাওয়া' হইয়াছে।

শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি আধুনিক কোষের নিবন্ধৃগণও গতানুগতিক-ভাবে অসন্দিগ্ধচিত্তে পুরাতন ব্যাখ্যাতৃ-বর্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া সাহিত্যের পথ তমসাচ্ছন্ন করিয়াছেন। পূর্ববর্তী ব্যাখ্যানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভর না করিয়া যদি যুক্তিবলে পদ-পদার্থের বিচারপূর্বক প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ে প্রয়াসী হওয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত অনেক স্থলেই মধ্যযুগের সিদ্ধান্তের অন্যথা ঘটিবে। কারণ, পদার্থ না চিনিয়া কেবল পদজ্ঞানের দ্বারা শিল্পের বা

---

১৩ স্কন্দেঃ সলোপশ্চ। উণাদি, ১।১৫। স্কন্দির গতি শোষণয়োঃ।
কন্দুরিতি স্কন্দত্যস্মিন্ জলতাপ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভোগস্থানমিতি কেচিৎ। অন্যেতু স্কন্দতি শোষয়তীতি 'কন্দুঃ' লৌহাদি-পাত্রমিত্যাহুঃ। অতএব 'ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রোনা কন্দুর্বা স্বেদনী স্ত্রিয়ামিত্যমরঃ।

সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিবরণ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য।

মৃদঙ্গ যাহার শিল্প, এই অর্থে 'মার্দঙ্গিক' এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থনির্ণয়প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াছেন যে, মৃদঙ্গ যাহার শিল্প, সেই যদি 'মার্দঙ্গিক' নামে অভিহিত হয়, তবে তো মৃদঙ্গ-নির্মাতাই মার্দঙ্গিক সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য; কারণ, মুখ্যতঃ মৃদঙ্গ তাহারই শিল্প, সে-ই মৃদঙ্গ-নির্মাণের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মৃদঙ্গবাদকেই মার্দঙ্গিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, লক্ষণার দ্বারা মৃদঙ্গশব্দ মৃদঙ্গ-বাদনে স্থিত হইয়াছে। সুতরাং মৃদঙ্গ-বাদন যাহার শিল্প, সেই মৃদঙ্গবাদকই মার্দঙ্গিক নামে কথিত হইয়া থাকে।

মহাভাষ্যকার রাজা পুষ্পমিত্রের সভায় থাকিয়া মৃদঙ্গ মার্দঙ্গিকের সহিত পরিচিত ছিলেন, সুতরাং বিচারপূর্বক প্রকৃত অর্থ বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি মৃদঙ্গ চেনে না, মার্দঙ্গিককেও জানে না, সে যদি মার্দঙ্গিক শব্দের অর্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যে তদ্ধিতের বলে মৃদঙ্গ-নির্মাতা কুম্ভকারকেই মার্দঙ্গিকের আসনে বসাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আলোচ্য বিষয়েও এইরূপ হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক-কার কন্দুপক্বের উল্লেখ করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অনাপদ্ অবস্থাতেও শূদ্রান্ন-ভোজনশীল ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে কন্দুপক্ব প্রভৃতি বস্তু খাইতে পারেন। কিন্তু তাহার উক্তিতে কন্দুর অথবা কন্দুপক্বের অর্থনির্ণয়ের প্রয়াস দেখা যায় না। তবে যেভাবে তিনি প্রমাণগুলির বিন্যাস করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মনে হয়, পিষ্টকবিশেষকেই যেন তিনি কন্দুপক্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা—'অনাপত্যপি ভোজ্য-বিশেষমাহ সুমন্তুঃ গোরসঞ্চৈব শক্তুঞ্চ তৈলং পিণ্যাক-মেবচ। অপূপান্ ভোজয়েচ্ছূদ্রাদ্ যচ্চান্যৎ পয়সাকৃতম্॥ এতানি শূদ্রান্নাদ-নিবৃত্তেনৈব ভক্ষ্যাণি।' (—২৩৮ পৃ.)।

'সুমন্তু বলেন,— ব্রাহ্মণ গোরস (দুগ্ধ), শক্তু, তৈল, খৈল, অপূপ এবং দুগ্ধ-নির্মিত অন্যান্য বস্তু শূদ্র হইতেও গ্রহণ করিয়া খাইতে পারেন। শূদ্রান্নভক্ষণে অনিবৃত্ত অর্থাৎ শূদ্রান্ন ভক্ষণে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তিনিই উক্ত দ্রব্য খাইতে পারেন।'

ইহার পরে আবার বলিয়াছেন—'অতএব হারীতঃ কন্দুপক্বং স্নেহপক্বং পায়সং দধি শক্তবঃ এতানি শূদ্রান্ন-ভুজো ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ।'

'এই জন্যই হারীত বলিয়াছেন, কন্দুপক্ব স্নেহপক্ব (ঘৃতে বা তৈলে পক্ব) দুগ্ধনির্মিত-দ্রব্য, দধিমিশ্রিত শক্তু, এই সকল দ্রব্যকে মনু শূদ্রান্নভোজীর ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।'

সুমন্তু-বচনে অপূপ উক্ত হইয়াছে; হারীত-বচনে অপূপের পরিবর্তে 'কন্দুপক্ব' পঠিত হইয়াছে। সুতরাং সুমন্তুর অভিমত অপূপ কন্দুপক্ব অপূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু টীকাকার গোবিন্দানন্দ বলেন— অপূপপদে পয়োবিকারকৃত অর্থাৎ ছানা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত অপূপ বুঝিতে হইবে; যেহেতু পরবর্তী অংশে 'যচ্চান্যৎ পয়সাকৃতম্' এই উক্তি দ্বারা দুগ্ধকৃতেরই গ্রহণ করা হইয়াছে।

টীকাকারের এই উক্তির সারবত্তা অনুভূত হয় না; কারণ বিবেক-কার যে দুইটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটিতে অপূপ, অপরটিতে 'কন্দুপক্ব' শব্দ আছে, সুতরাং একই বস্তু এই উভয় পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে, কন্দুতে যাহা পক্ব হয়, তাহাই কন্দুপক্ব। ইহার উপাদান কি হইবে, শাস্ত্রকারগণ তদ্বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে, পাকগত বৈজাত্যেই ইহার তাৎপর্য, উপাদান-বৈজাত্যে নহে। সুতরাং 'যচ্চান্যৎ' এই উক্তির দ্বারা অন্যান্য পয়োবিকারকৃতেরই গ্রহণ হইয়াছে, ইহার সহিত অপূপের কোনও সম্পর্ক নাই। সুমন্তু-বচনে 'অপূপান্' এবং কূর্মপুরাণ-বচনে 'কন্দুপক্বানি' এই উভয় স্থলে বহুবচন দেখিয়া মনে হয়, 'কন্দুপক্ব' অপূপের নানাপ্রকার শ্রেণী বিভাগ ছিল।

উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, ভ্রাষ্ট্র ও কন্দু— এই উভয়ের একার্থতার আশঙ্কাই হইতে পারে না। কারণ ভ্রস্‌জ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ষ্ট্রন্ প্রত্যয়ে ভ্রাষ্ট্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুর অর্থ— পাক। এই পাক ভর্জন, অর্থাৎ ভাজা। সাধারণ পাক নহে। সুতরাং যাহাতে ভাজা করা হয়, তাহাই ভ্রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে যাহাতে সেঁকা হয়, তাহা কন্দু।

—

কাচ

পুরাকালে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল কি না, এই বিষয়ে শিক্ষিত সমাজে মতপার্থক্যের অভাব নাই। অনেকে কাচকে পাশ্চাত্ত্য জাতির উদ্‌ভাবিত আধুনিক শিল্প বলিয়া মনে করেন; এবং 'কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিং' ইত্যাদি প্রাচীন শ্লোকোক্ত 'কাচ'কে স্ফটিকের নামান্তর বলিয়াই নির্দেশ করিয়া থাকেন। আপাততঃ এই মতের খণ্ডন কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ বিম্বগ্রাহিতা প্রভৃতি গুণ স্ফটিকে চিরপ্রসিদ্ধ, কাচেও এই গুণ বর্তমান। সুতরাং স্ফটিক হইতে কাচের স্বতন্ত্রসত্তা কেবল স্বতন্ত্র নামের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু একটু প্রণিধান সহকারে পুরাতন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসে এই বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে। সুশ্রুতসংহিতায় বিভিন্ন অর্থে এক স্থলেই কাচের এবং স্ফটিকের উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থে অন্নপানাদির পরিবেষণ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে—পানীয় দ্রব্য পানক (সরবৎ) এবং মদ্য, এই কয়টি দ্রব্য মৃন্ময় পাত্রে অথবা মনোরম শীতল কাচপাত্রে কিংবা স্ফটিকপাত্রে প্রদান করিবে।[১] যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থেও কাচের দ্বারা এবং স্ফটিকের দ্বারা পানপাত্র নির্মাণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

নেপালাধিপতি মহারাজ প্রতাপসিংহসাহ-কৃত পুরশ্চর্যার্ণব নামক গ্রন্থধৃত তন্ত্রান্তর-বচনে কাচপাত্রের এবং স্ফটিকপাত্রের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে।[৩] কুলার্ণবতন্ত্রেও পাত্রনির্মাণের উপাদানরূপে স্ফটিক এবং কাচ স্বতন্ত্ররূপেই পরিগণিত হইয়াছে।[৪] ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত 'ইণ্ডো-এরিয়ান্' গ্রন্থে কালিকাপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে কাচের এবং স্ফটিকের বিভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :

---

১ পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃন্ময়েষু প্রদাপয়েৎ।
কাচ-স্ফটিক-পাত্রেষু শীতলেষু শুভেষুচ॥ —সূত্রস্থান, ৪৬ অ.

২ যৎপানপাত্রং ভূপানাং তজ্‌জ্ঞেয়ং চসকং বুধৈঃ
কানকং রাজতঞ্চৈব স্ফাটিকং কাচমেবচ॥

৩ পাত্রং কাঞ্চন-কাচরূপ্যজনিতং মুক্তা-কপালোদ্‌ভবং
বৈশ্বামিত্র মুদঞ্চ কামদমিদং হৈমং প্রিয়ং স্ফাটিকম্॥ ইত্যাদি

৪ অথবা বর্ত্তুলাকারং কুর্য্যাদ্দেবি মনোহরং
স্বর্ণ-রৌপ্য শিলা কূর্ম কপালালাবু মৃন্ময়ম্।

'জল পাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদোহিতম্
পবিত্রং শীতলং পাত্রং ঘটিতং স্ফটিকেন চ॥
কাচেন ঘটিতং তদ্বত্তথা বৈদূর্য-সম্ভবম্॥

প্রদর্শিত কুলার্ণব-বচনে শিলাশব্দে স্ফটিক অভিপ্রেত হইয়াছে। কাদম্বরী গ্রন্থে 'স্ফটিকোপল' শব্দে স্ফটিক প্রস্তর-বাচক উপলের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৫] গরুড়পুরাণে কাবের প্রভৃতি দেশ স্ফটিকের আকর রূপে উক্ত হইয়াছে।[৬] কিন্তু চিকিৎসা গ্রন্থে 'কাচ' ক্ষার পদার্থ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। অমরকোষের মতেও ক্ষার এবং কাচ এক পদার্থ। পাশ্চাত্য দেশের লোকেও ক্ষার-বিশেষের দ্বারাই কাচ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের সাহিত্যে উল্লিখিত কাচের এবং পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত কাচের উপাদানগত কোনরূপ পার্থক্যের উপলব্ধি হয় না।

ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে—আধুনিক কাচে যেমন রক্ত, নীল প্রভৃতি বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বকালের কাচেও এই রীতির অভাব ছিল না। এমন কি, একটি কাচপাত্রেই বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' কাব্যে ময়ূরপঙ্‌ক্তি 'কাচকলসাকৃতি' ধারণ করিতেছে, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৭]

রত্নপরীক্ষাপ্রসঙ্গে জানা যায় যে, সেকালে কাচের দ্বারা নানাবিধ মণির অনুকরণ বা নকল করা হইত, সুতরাং এই রীতিও কাচের রঞ্জনক্রিয়ার নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য।

কাচ অতি ভঙ্গপ্রবণ, এইহেতুই 'কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া' ইত্যাদি শ্লোকে কাচ নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভঙ্গপ্রবণ পদার্থেরও পূর্বকালে ভূরি ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে কাচের ব্যবহার হইত।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে মকরধ্বজ প্রস্তুতপ্রকরণে কাচকুম্ভের উপযোগিতা কথিত

নারিকেল-শঙ্খমুক্তা-শুক্তিকাচ-সমুদ্‌ভবম্
পুণ্যবৃক্ষকৃতং রম্যং পাত্রং দেবি প্রকল্পয়েৎ।

৫ অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলোপমং

৬ কাবের বিন্ধ্য যবন চীন নেপালভূমিষু
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্ত প্রযত্নতঃ
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ। —গরুড়পুরাণ, পূর্ব ভাগ।

৭ কাচ-কলসাকৃতিমুদ্বহন্তীভিঃ শিখি-সংহতিভিঃ॥

হইয়াছে। কাচ গালাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া কুম্ভ প্রস্তত করিতে হয়। সুতরাং কাচের দ্রবীকরণ এবং ছাঁচে পাতন প্রণালী অতিপুরাকালেই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে, কাচের চাকচিক্যে সভ্য জগৎ প্রোদ্ভাসিত। কাচের গ্লাস্ প্রভৃতি বিবিধ পাত্র অনেকেই ব্যবহার করেন। কাচপাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়া উচ্ছিষ্ট হইলে আর শুদ্ধ হয় না, সুতরাং উহার ব্যবহার পাপজনক— অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণেই কাচের চুড়ি ব্যবহারের পক্ষেও দোষারোপ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কাচ উচ্ছিষ্ট হইলেও মৃৎপাত্রের ন্যায় পরিত্যাজ্য নহে, প্রত্যুত স্বর্ণপাত্রের ন্যায় জলের দ্বারা ধৌত করিলেই শাস্ত্রানুসারে ইহার শুদ্ধি সম্পাদিত হইতে পারে। বাচস্পতিমিশ্র-কৃত শুদ্ধিচিন্তামণি গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখা যায়। যথা—

অশ্মনাং কাচভাণ্ডানাং হৈমানামিব শোধনম্
নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডং জলেনৈব বিশুধ্যতি।

এই বচনটি অঙ্গিরা মুনির। স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহোদয় কর্তৃক বাচস্পতিমিশ্রের মত অনেক স্থলেই উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণে এই বচনটি উদ্ধৃত হয় নাই। তাহাতে বোধ হয়, বঙ্গদেশে ঐ সময়ে কাচ-পাত্রের ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রয়োজনের অভাবেই ইহার কথা উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অঙ্গিরা ঋষির বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে— যে সময়ে ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা আর্য ঋষিগণ সমাজের কল্যাণ-কামনায় স্ব স্ব মত সংহিতাকারে প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই অতি পুরাতন যুগেই গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে কাচপাত্রও প্রচলিত হইয়াছিল, নতুবা অঙ্গিরা ঋষি কাচের শুদ্ধিকথনে প্রয়াসী হইতেন না। পূজ্যপাদ উপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার শুদ্ধিচন্দ্রালোক গ্রন্থে প্রদর্শিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও কাচের অব্যবহার্যতা বিবেচিত হয় নাই।

—

চর্ম

পূর্বকালে যে সকল উপাদানে ভদ্রসমাজের ব্যবহারোপযোগী পাত্রাদি নির্মিত হইত, স্মৃতি-সংহিতায় দ্রব্যের শুদ্ধিবিধান-প্রসঙ্গে, শ্রাদ্ধক্রিয়ার পাত্রনির্দেশ-প্রসঙ্গে, গৃহস্থাদির ভোজনপাত্র জলপাত্র প্রভৃতির বিধিনিষেধে, গৃহ্যসূত্রে সংস্কারের উপযোগী দ্রব্য-বিধানে, এবং কাব্য-ইতিহাসাদি গ্রন্থে বিলাসোপকরণ উপঢৌকন প্রভৃতির বর্ণনায় তাহার অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

তন্মধ্যে চর্ম একটি অতি পুরাতন উপাদান, তাহা মানবসমাজের অভ্যুদয়কাল হইতেই নানাকার্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদে চর্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। অস্পৃশ্য জন্তুর চর্ম অস্পৃশ্য ও তজ্জন্য ভদ্র-সমাজে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া নিন্দিত ছিল, স্পৃশ্য জন্তুর চর্ম অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত ছিল না।

মহর্ষি বৌধায়ন বলিয়াছেন— স্বর্ণ মণি রজত শঙ্খ শুক্তি প্রস্তর বজ্র (হীরক) বংশ রজ্জু চর্ম এই সকল পদার্থ জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়।[৮] যাজ্ঞবল্ক্যের বচনেও চর্ম-শুদ্ধির ব্যবস্থা দেখা যায়, যথা— শাকরজ্জু মূল ফল বস্ত্র বিদল (বাঁশ) ও চর্ম জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়।[৯] বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অরিষ্ট (নিম্ব), বিল্ব ও ইঙ্গুদ ইহাদের দ্বারা চর্মের শুদ্ধি সম্পাদিত হয়।[১০] ভগবান মনুর উক্তিতে বস্ত্রের মত চর্মের শুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

মনুস্মৃতির প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মেধাতিথি অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণে প্রকৃতির দ্বারাও বিকৃতির গ্রহণ বুঝিতে হইবে, এবং বিকৃতির দ্বারাও প্রকৃতির গ্রহণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং চর্মের যে শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে, চর্মের বিকৃতি অর্থাৎ চর্মনির্মিত পাদুকা গাত্রাবরণ প্রভৃতিরও সেই শুদ্ধিই বুঝিতে হইবে[১২] পক্ষান্তরে পাদুকা প্রভৃতির সম্বন্ধে বিহিত শুদ্ধিও তাহাদের উপাদান চর্ম

৮ কনক মণি রজত শঙ্খ শুক্ত্যুপলানাং বজ্র বিদল রজ্জু চর্মাণাং চাদ্ভিঃ শৌচং মৃৎপাত্রাণাং বহ্ন্যাবুপতাপঃ। (—অপরার্ক, ২০০ পৃ)

৯ শাক রজ্জু-মূল-ফল-বাসো-বিদল-চর্মণাম্।
পাত্রাণাং চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে॥ (১।১৮২)

১০ অরিষ্টৈশ্চ তথা বিল্বৈরিঙ্গুদৈশ্চর্মণামপি। (—অপরার্ক, ২০০ পৃ)

১১ চেলবচ্চর্মণাং শুদ্ধির্বিদলানাং তথৈবচ। (৫।১১৯)

১২ উপানৎকবচাদীনামপি তদ্বিকারাণামেষ এব বিধিঃ। অত্র হি প্রকরণে প্রকৃত্যাপি বিকৃতি-র্গৃহ্যতে, বিকৃত্যাচ প্রকৃতিঃ। (—৫।১১৯, ভাষ্য)

প্রভৃতির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। মেধাতিথির এই উক্তিতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে চর্ম স্বতন্ত্রভাবে এবং ব্যবহার্য বস্তুর উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত।

রামায়ণে রাজভোগ্য শয্যার আস্তরণরূপে চর্মব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের বনবাসবৃত্তান্ত শ্রবণে ভরত শোকাতুর হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম উৎকৃষ্ট চর্মাবৃত শয়নীয়ে শয়ন করিতেন, তিনি আজ কি প্রকারে ভূতলে শয়ন করিবেন ?'[১৩]

রামায়ণে মেচর্মাস্তরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের বিলাসভবনে উপস্থিত হইয়া হনুমান যে মনোহর শয্যা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আবিক চর্মের দ্বারা আবৃত ছিল।[১৪]

মহাভারত পাঠে জানা যায়, সেকালে 'অজিনরত্ন' (ভাল চর্ম) নৃপতিদিগের উপহাররূপেও প্রদত্ত হইত। ভগবান হরি পাণ্ডবদিগের নিকট সুখস্পর্শকর মনোরম চর্ম উপহার পাঠাইয়াছিলেন। যথা—

ততস্ত কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডুভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ।
কম্বলাজিনরত্নাণি স্পর্শবন্তি শুভানিচ॥ (—আদি পর্ব। ১৯৯)

এইস্থলে চর্মের স্পর্শবদ্বিশেষণ দেখিয়া বোধ হয়, সেকালে অতি সুন্দর-রূপে চর্ম পালিশ করা হইত। পূর্বপ্রদর্শিত মেধাতিথির উক্তিতে বুঝা যায়, সে-কালে চর্মের দ্বারা 'কবচ' অর্থাৎ গাত্রাবরণ প্রস্তুত হইত। গাত্রাবরণ (কঞ্চুক) প্রস্তুত করিতে হইলে চর্মের বিশেষরূপ মসৃণতা সম্পাদন আবশ্যক, এবং উপযুক্ত রঞ্জনও আবশ্যক। এই রঞ্জনক্রিয়া শিক্ষার জন্য আজ ভারতবাসীকে সমুদ্র পার হইয়া সুদূরদেশে গমন করিতে হইতেছে; কিন্তু পূর্বকালে ভারতবাসীর দৈনন্দিন ব্যবহার্য চর্মপাত্রের শুদ্ধিবিধানার্থ রঙ করা আবশ্যক হইত। সুতরাং ইহা যে সাধারণের বিদিত এবং সুকরপ্রণালীপ্রসূত ছিল, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহের কারণ নাই। ভগবান হারীত বলিয়াছেন যে 'রঞ্জন' (রঙ করা) ক্রিয়ার দ্বারা দৃতির শুদ্ধি সম্পন্ন হয়। 'ক্ষারোষাভ্যাং কার্পাস-শণময়ানাং পুত্র-

---

১৩ অজিনোত্তর-সংস্তীর্ণে বরাস্তরণ সঞ্চয়ে।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে। (—অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৮।৪)

এই শ্লোকের তিলক টীকায় কথিত হইয়াছে যে— এই সকল চর্ম শীতসময়ে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মসময়ে শীতল হইয়া থাকে। অজিনেন রাজার্হা-চর্মাদি-মৃগাজিন-বিশেষরূপেণ, উত্তরেণমঞ্চোত্তরচ্ছদেন সংস্তীর্ণেন। তানি চাজিনানি শীতোষ্ণয়োরুষ্ণশীতে।

১৪ পরমাস্তরণাস্তীর্ণমাবিকাজিনসংবৃতম্। (—সুন্দরকাণ্ড, ১০।৬)

জীবকারিষ্টৈঃ ক্ষৌমবরোর্ণানাং পুত্রজীবকোদশ্বিদ্‌ভ্যামজিনানাং চৈলবচ্চর্মণাং শুদ্ধিঃ, দৃতীনাং রঞ্জনম্।'

টীকাকার অপরার্ক বলেন দৃতি শব্দের অর্থ চর্মনির্মিত জলাদি ধারণোপযোগী ভাণ্ড, 'দৃতিশ্চর্মময়মুদকাদিভাণ্ডম্'।

মহর্ষি হারীত পুত্রজীবক ও উদশ্বিৎ এই উভয় পদার্থের দ্বারা অজিনের শুদ্ধি-বিধান করিয়া চৈলের ন্যায় চর্মের শুদ্ধিবিধান করিয়াছেন, এবং দৃতির জন্য রঞ্জন-রূপ বিশেষ শুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, যে সকল অজিন পাদুকা প্রভৃতিতে ব্যবহার্য, তাহাদের জন্য পুত্রজীবকাদির ব্যবস্থা, শুষ্কদ্রব্যের ধারক বা শয্যাদিতে ব্যবহার্য চর্মের জন্য চৈলশুদ্ধির সমান শুদ্ধির ব্যবস্থা, এবং জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ধারণে ব্যবহার্য দৃতির জন্য রঞ্জন অর্থাৎ বার্নিশ করা বিহিত হইয়াছে। কারণ উপরে বার্নিশ থাকিলে চর্মের সহিত জল প্রভৃতি তরলপদার্থের সংশ্রব হইতে পারে না, এবং চর্মসংশ্লিষ্ট অমেধ্য পদার্থও ঢাকা পড়িয়া যায়।

বাঙ্গলায় চর্মপাত্রে জল ব্যবহারের প্রথা নাই, সুতরাং 'ভিস্তির জল ব্যবহারের যোগ্য' একথা শুনিলে আপাততঃ বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু চর্মকে আমরা চিরন্তন সংস্কারবশে যেরূপ অপবিত্র মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সকল চর্ম সেরূপ অপবিত্র নহে। মহাভারতে 'শ্বদৃতিবৎ' এই উক্তির দ্বারা কেবল কুক্কুর-চর্মনির্মিত দৃতিরই অপবিত্রতা সূচিত হইয়াছে।

মেধাতিথি স্পষ্টই বলিয়াছেন, চর্মের যে শুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, সেই শুদ্ধি স্বভাবতঃ স্পৃশ্য জন্তুর চর্মনির্মিত 'বরত্রা' প্রভৃতির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতি অশুচি জন্তুর চর্ম শুদ্ধ হইবে না। (—মনু, ৫।১১৯)

দৃতি জিনিসটা সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহা কোথাও চর্মকরণ্ড নামে কোথাও বা চর্মপুট নামে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি শঙ্খ বলিয়াছেন, চর্মকরণ্ডোদ্ধৃত জল শুদ্ধ। 'আপো রূপরসবত্যঃ পরিশুদ্ধা জীর্ণচর্মকরণ্ডকৈরভ্যুদ্ধৃতাঃ। চর্মকরণ্ড-শ্চর্মপুটঃ'। (—ইণ্ডো-এরিয়ান্। ২৭৭ পৃ.) মহর্ষি বিষ্ণুও চর্মপুটস্থ জলকে শুদ্ধ বলিয়াছেন, 'গোদোহনে চর্মপুটেচ তোয়ম'।

এই দৃতি সাধারণতঃ পশুর দ্বারা বাহিত হইত, দৃতিবাহক পশু 'দৃতিহরি' নামে কথিত হইত। পাণিনির একটি সূত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়— 'হরতের্দৃতিনাথয়োঃ পশৌ' (৩।২।২০)।

আদরার্থ দৃঙ্ধাতুর উত্তর ক্তিচ্ প্রত্যয় যোগে দৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সুতরাং ধাতুর অর্থানুসারে জিনিসটা আদরের বলিয়াই বোধ হয়। অদ্যাপি পশ্চিম ভারতে পশুর দ্বারা পেয়-জলপূর্ণ দৃতি চালিত হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদে জলোদর রোগ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ জলপূর্ণ দৃতির বর্ণনা দেখা যায়। 'যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ।'

পূর্বকালে যুদ্ধব্যাপারে চর্মের উপযোগিতা অনুভূত হইয়াছিল। গণ্ডারের চর্মে ঢাল প্রস্তুত হয়, একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু রামায়ণে ঋষভচর্মেরও যুদ্ধোপকরণতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সেই ক্ষিপ্রকারী মহাবীর বৃষের চর্ম এবং খড়্গ গ্রহণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।'[১৫]

রামায়ণে অজচর্মনির্মিত পেটকের পরিচয় পাওয়া যায়। রামলক্ষ্মণ প্লবারোহণে সীতার সহিত যমুনা পার হইবার সময়ে রাম সাবধান হইয়া পার্শ্বভাগে প্লবোপরি সীতার বসনভূষণ ও 'কঠিন-কাজ' স্থাপন করিয়াছিলেন—

পার্শ্বে তত্রচ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানিচ।
প্লবে কঠিন-কাজঞ্চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ॥
(—অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৫।১৭)

তিলকটীকাকার 'কঠিন-কাজ' শব্দের অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'কঠিন' শব্দের অর্থ খনিত্র, এবং 'কাজ' শব্দের অর্থ পেটক। মতান্তরের উপন্যাস করিয়া বলিয়াছেন, কেহ বলেন কঠিন শব্দের অর্থ খনিত্র, আজ শব্দের অর্থ অজচর্ম-পিনদ্ধ অর্থাৎ ছাগচর্মাবৃত পেটক।[১৬] এই স্থলে তিলকের ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি 'কাজ' শব্দের পেটক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে কোনও নিরুক্তি দেখান হয় নাই। মতান্তরোপন্যাসেও কা শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হয় নাই, তাহাতেই প্রকৃতার্থটি তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইষদর্থ 'কু' শব্দ নিষ্পন্ন কাদেশ ও 'আজ' (অজচর্ম নির্মিত) এই উভয় যোগে সিদ্ধ 'কাজ' শব্দের ক্ষুদ্র পেটকার্থই ব্যুৎপত্তিলভ্য ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হয়ত আধুনিক হ্যাণ্ডব্যাগের মত পূর্বকালেও প্রবাসীর বহনোপযোগী ক্ষুদ্র পেটক 'কাজ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

সম্ভবতঃ টীকাকারের সময়ে চর্মের দ্বারা সাধারণতঃ পেটকের আবরণ করা হইত, সুতরাং তাহা দেখিয়া তিনি 'কাজ'কে চর্মনির্মিত না বলিয়া চর্মাবৃত

---

১৫ আর্ষভং চর্ম খড়্গঞ্চ প্রগৃহ্য লঘুবিক্রমঃ। —যুদ্ধকাণ্ড, ৯৬।২১

১৬ কঠিনং খনিত্রং কাজং পেটকং দ্বন্দ্ব একবদ্‌ভাবঃ।
কঠিনং খনিত্রং আজং আজচর্মপিনদ্ধং পেটকমিত্যন্যে।

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কঠিন শব্দের খনিত্রার্থ গ্রহণের পরিবর্তে দৃঢ় অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহা 'কাজে'র বিশেষণরূপে অন্বিত হইয়া পেটকের দৃঢ়তা প্রতি-পাদন করিতে পারে, এবং এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ব্যবহার্য বস্তুর সাময়িক পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন অনেক বস্তুরই স্বরূপ নির্ণয় হইয়া উঠে না। কেবল শব্দার্থের টানাটানির দ্বারা তথ্যনির্ণয় সর্বতোভাবেই অসম্ভব।

—

চিত্রবিদ্যা

আর্য সাহিত্যে চিত্রবিদ্যার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। উহা কলাবিদ্যার অন্তর্গত। দৃশ্যকাব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ, নাটকাদিতে পর্বত, বন, জলাশয়, পথ, গৃহ, প্রভৃতির আকৃতি চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শ্রব্যকাব্যেও উহার উল্লেখ আছে। অনেক কাব্যেই চিত্রের প্রসঙ্গ আছে। দর্শনশাস্ত্রে, ধর্মশাস্ত্রে ও উপাসনা-গ্রন্থেও উহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বেদান্তের পঞ্চদশী গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ 'চিত্রদীপ' নামে অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের স্থানান্তরেও চিত্রের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, 'আশ্রয় ব্যতীত যেমন চিত্রের অবস্থান হয় না…'। সাকার উপাসনায় চিত্র একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিচিত। কারণ, উহা পূজার অন্যতম আধার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কিরূপ রীতি অবলম্বন করিয়া চিত্রকরগণ চিত্রণ সম্পন্ন করিতেন, অর্থাৎ যাহা দেখিতেন স্বকীয় রুচি অনুসারে প্রতিভাবলে তাহাই অঙ্কিত করিতেন, অথবা কোনও সূত্রানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চিত্র করিতেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা তাহার পরিচয় দিব।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের একটি আখ্যায়িকা-পাঠে জানা যায় যে, নারায়ণ মুনি এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক। উক্ত মুনি কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার তপে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার জন্য, দিব্যাঙ্গনাগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার হাবভাব প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু মুনি তাহাতে প্রলুব্ধ হইলেন না; তিনি পৃথিবীতে আম্ররসের দ্বারা অসামান্য রূপবতী রমণীর মূর্তি চিত্রিত করিলেন; যোগবলে তাহাতেই জীবনসঞ্চার করিলেন। তখন দিব্যাঙ্গনারা লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। উক্ত মূর্তি 'উর্ব্বী'তে অর্থাৎ পৃথিবীতে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া 'উর্বশী' নামে অভিহিত হইল।

মহামুনি নারায়ণ এই প্রকারে লক্ষণযুক্ত চিত্র নির্মিত করিয়া ঐ 'চিত্রসূত্র' বিশ্বকর্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বেদপ্রসিদ্ধ রাজা পুরুরবা উর্বশীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সুপ্রসিদ্ধ কুরুকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে, অতি সুপ্রাচীন কালেই চিত্রসূত্র হিন্দুশাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বজ্রের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি হইতে জানা যায় যে, চিত্রবিদ্যার আদিম গ্রন্থ 'চিত্রসূত্র' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন, 'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চিত্রসূত্রং তবানঘ'। চিত্রসূত্রের উপসংহারে মার্কণ্ডেয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলার মধ্যে চিত্রই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ফলের প্রদায়ক; উহা যে গৃহে স্থাপিত হয়, সেখানে মঙ্গলবিধান করে।[১]

চিত্রসূত্রাধ্যায়ের পূর্বাধ্যায়ে নৃত্যসূত্র কথিত হইয়াছে। চিত্রের সহিত নৃত্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, 'নৃত্যের ন্যায় চিত্রেও ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং মহানৃত্যে যেরূপ দৃষ্টি, ভাব, অঙ্গোপাঙ্গ ও হস্তের নির্দেশ হইয়াছে, চিত্রেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। নৃত্য 'পরম চিত্র' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং নৃত্যে যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই এখন বলিব, তুমি শ্রবণ কর।'

ইহার পরেই কথিত হইয়াছে যে, হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক— পুরুষ এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা সকলেই দীর্ঘে ও আয়ামে নির্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত; অর্থাৎ, যে পরিমাণ কথিত হইবে, ইহাদের দেহে তাহার বিপর্যয় হইবে না।

হংসের দৈর্ঘ স্বকীয় অঙ্গুলপ্রমাণে একশত আট অঙ্গুল। ভদ্রের পরিমাণ একশত ছয় অঙ্গুল। মালব্যের পরিমাণ একশত চারি অঙ্গুল। রুচকের পরিমাণ একশত অঙ্গুল, এবং শশকের পরিমাণ নব্বই অঙ্গুল।[২]

---

১ কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।
মঙ্গল্যং প্রথমং বৈ তদ্ গৃহে যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ (—৩য় খণ্ড, ৪৩।৩৮)

২ যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।
দৃষ্টয়শ্চ তথা ভাবা অঙ্গোপাঙ্গানি সর্বশঃ ॥
করাশ্চ যে মহানৃত্যে পূর্বোক্তা নৃপসত্তম।
ত এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্যং চিত্রং পরং স্মৃতম্ ॥
নৃত্যপ্রমাণং যেনোক্তং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যতঃ শৃণু।
হংসো ভদ্রোঽথ মালব্যো রুচকঃ শশকস্তথা ॥
বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাঃ পঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
উচ্ছ্রায়ায়ামতুল্যাস্তে সর্বে জ্ঞেয়াঃ প্রমাণতঃ ॥
স্বেনৈবাঙ্গুলমানেন শতমষ্টাধিকং ভবেৎ।
প্রমাণং নৃপ হংসস্য ভদ্রস্য তু ষড়ুত্তরম্ ॥
চতুর্ভিরধিকং জ্ঞেয়ং মালব্যস্য তথা নৃপ।
শতঞ্চ রুচকস্যোক্তং দশোনং শশকস্য চ ॥

বলা আবশ্যক যে, এই স্থলে যে পরিমাণ কথিত হইয়াছে, বৃহৎসংহিতায় নির্দিষ্ট পরিমাণের সহিত তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎসংহিতার 'পঞ্চ-মনুষ্যবিভাগ' নামক প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, হংস-সংজ্ঞক পুরুষের 'ব্যামায়' অর্থাৎ, প্রসারিত ভুজদ্বয়ের পরিমাণ ও উচ্চতা 'ষড়্নবত্যঙ্গুল' (ছিয়ান্নব্বই) হইয়া থাকে। শশক, রুচক, ভদ্র ও মালব্য, ইহাদের পরিমাণ হংসের পরিমাণ অপেক্ষা ক্রমে তিন অঙ্গুল অধিক। সুতরাং শশকের পরিমাণ নিরান্নব্বই, রুচকের এক শত দুই, ভদ্রের এক শত পাঁচ ও মালব্যের পরিমাণ এক শত আট অঙ্গুল। এই স্থলে টীকাকার ভট্টোৎপল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কথিত পরিমাণ পরবর্তী গ্রন্থের বিরুদ্ধ।[৩]

আরও একটি বিষয়ে বরাহমিহিরের সহিত অনৈক্য আছে। মার্কণ্ডেয় পরিমেয় মানবের স্বকীয় প্রমাণানুসারে অঙ্গুল-মান-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাহমিহির পারিভাষিক মান-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। প্রতিমা-নির্মাণ-পরিচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন যে, গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্যরশ্মিতে ধূলির মত যে সূক্ষ্মতর পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহার নাম পরমাণু। পরিমাণ বিষয়ে ইহাই প্রথম। পরমাণু, রজ, বালাগ্র, লিক্ষা, যূক, যব ও অঙ্গুল, যথোত্তর অষ্ট গুণানুসারে এই পরিমাণ বুঝিতে হইবে।[৪] অর্থাৎ, অষ্ট পরমাণুতে এক রজ, অষ্ট রজে এক বালাগ্র, অষ্ট বালাগ্রে এক লিক্ষা, অষ্ট লিক্ষাতে এক যূক, অষ্ট যূকে এক যব, ও অষ্ট যবে এক অঙ্গুল হয়।

যদিও বরাহমিহির প্রতিমা-নির্মাণ-প্রসঙ্গে এই মানসূত্র বলিয়াছেন, তথাপি চিত্র প্রভৃতিতেও উক্ত সূত্র ব্যবহার্য। কারণ, পরিমাণ বিষয়ে প্রতিমা ও চিত্র, এতদুভয়ে একরূপতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় কথিত চিত্রসূত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ যেরূপ, বরাহমিহিরের প্রতিমা-পরিমাণ-নির্দেশেও তাহা প্রায় সেইরূপ। কেবল কোনও কোনও স্থলে সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়।

চিত্রের সহিত প্রতিমার কোথায় প্রভেদ হইবে, বরাহমিহির প্রতিমা-লক্ষণে

৩ ষণ্ণবতিরঙ্গুলানাং ব্যায়ামো দীর্ঘতা চ হংসস্য।
শশ-রুচক-ভদ্র-মালব্য-সংজ্ঞিতাস্ত্র্যঙ্গুলবিবৃদ্ধ্যা॥
—এতদুত্তরত্র বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন বিরুধ্যন্তে।

৪ জালান্তরগে ভানৌ যদণুতরং দর্শনং রজো যাতি।
তদ্বিদ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং তদ্ধিপ্রমাণানাম্॥ —বৃ. স.।৫৭
পরমাণুরজো-বালাগ্রলিক্ষযূকং যবোঽঙ্গুলং চেতি।
অষ্টগুণানি যথোত্তরমঙ্গুলমেকং ভবতি সংখ্যা॥ —১।২

তাহাও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। প্রতিমা-মস্তকের পরিণাহ বত্রিশ অঙ্গুল, বিষ্কম্ভ হইতে আয়াম চতুর্দশ অঙ্গুল হইবে। কিন্তু চিত্রকর্মে দ্বাদশাঙ্গুলি মাত্র দৃশ্য হইবে; অবশিষ্ট বিংশতি অঙ্গুল অদৃশ্য থাকিবে। মার্কণ্ডেয় চিত্রসূত্রে বলিয়াছেন যে, মস্তকের পরিণাহ দ্বাদশাঙ্গুল হইবে।[৫]

এই সকল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্রাঙ্কনে শিল্পীর যথেচ্ছাচারের অবসর ছিল না। শাস্ত্রীয় সূত্র ধরিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের সমস্ত বিষয়েই অদৃষ্টবাদ জড়িত। সুতরাং পরিমাণাদির ব্যতিক্রমে চিত্র-স্থাপয়িতার দুরদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী। চিত্রের গুণ-দোষ-কথন-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা পরে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

চিত্র সাধারণতঃ পটে ও ভিত্তিতে অঙ্কিত হইত। উভয় চিত্রের আধারগত পার্থক্য থাকিলেও, উপাদান প্রায়ই একরূপ। রেখাই চিত্রের প্রধান অঙ্গ। কারণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিমাণ ও সংস্থানের অভিব্যক্তি প্রথমতঃ কেবল রেখাপাতের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণান্তরের অভাবেও কেবল অঙ্কন-ক্রিয়ার দ্বারাই মনুষ্যাদির আকৃতি বিন্যস্ত হইতে পারে। পঞ্চদশীর চিত্রদীপ প্রকরণে চিত্রের চারিটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমাবস্থা, ধৌত; দ্বিতীয়, ঘট্টিত; তৃতীয় লাঞ্ছিত; এবং চতুর্থ, রঞ্জিত। পটচিত্রের আধার-বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রাবস্থা, ধৌত। উহাতে অন্নবিলেপন অর্থাৎ অন্নমণ্ডের দ্বারা প্রলেপ-দান, ঘট্টিত। তাহাতে মসী, অর্থাৎ কালীর দ্বারা আকার-সম্পাদন, অর্থাৎ পরিমাণসূত্রানুসারে কালীর রেখাপাতের দ্বারা লেখনীয় বিষয়ের আকৃতিবিন্যাস, লাঞ্ছিত; এবং স্থানানুসারে উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসের নাম রঞ্জিত।[৬] স্মৃতিশাস্ত্রেও দৃষ্টান্তস্থলে চিত্র-রচনার যে পদ্ধতি কথিত হইয়াছে, তাহাতেও পঞ্চদশী-কথিত ক্রমেরই আভাস পাওয়া যায়। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, চিত্রকর্ম যেমন অনেক অঙ্গের দ্বারা ক্রমে উন্মীলিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যও তেমনই বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া

৫ তত্র দ্বাদশাঙ্গুলপরিণাহো মূর্ধা। (—বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৩।৩৫)

৬ যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মানি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা চতুষ্টয়ম্॥ ১
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ। ২
স্বতঃশুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ। —৬।৩

থাকে।[৭] নৈষধচরিতে দময়ন্তীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, হংস নখের আঁচড়ের দ্বারাই নলের আকৃতি দময়ন্তীকে দেখাইয়াছিল। সাহিত্যে এই শ্রেণীর অনেক উদাহরণ আছে।

মার্কণ্ডেয়-কথিত চিত্রসূত্রেও চিত্র-নির্মাণের উপযোগী কুড্য-সম্পাদনের পর, তাহাতে শ্বেত প্রভৃতি বর্তিকার দ্বারা (তূলিকার দ্বারা) প্রমাণে চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্থাপনের পর, তাহাতে উপযুক্ত স্থানে সেই সেই বর্ণের বিন্যাস করিবার উপদেশ আছে।[৮] বোধ হয়, অত্রত্য 'প্রমাণ' শব্দে চিত্রের পরিমাপক রেখা-বিন্যাস অভিপ্রেত হইয়াছে।

চিত্রের স্থায়িত্ব-সম্পাদনের জন্য কুড্যে যে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অনেকগুলি মশল্লার সংমিশ্রণের উপদেশ দেখা যায়। যথা— 'তিন প্রকার ইষ্টকচূর্ণ, সাধারণ মৃত্তিকা তিন ভাগ, গুগ্‌গুল, মোম, মধুক (রঙ্গ অথবা যষ্টিমধু), মুরুক (মুরক) মুরা নামক প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, গুড়, কুসুম্ভ ও তৈল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া তিন ভাগ অগ্নিদগ্ধ সুধার (চুন) সহিত চূর্ণাকারে মিশ্রিত করিবে।

'অনন্তর ইহাতে দুই ভাগ অপক বিল্বচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ('মযকং কষং' বুঝা গেল না) উপযুক্ত পরিমাণ বালুকা দিবে। তাহার পর পিচ্ছল বল্কল-জলের দ্বারা সমস্ত ভিজাইবে। এই উপাদান একমাসে প্রলেপের উপযুক্ত হয়। অনন্তর এই পদার্থের দ্বারা প্রাচীর প্রভৃতিতে বিবেচনাপূর্বক প্রলেপ দিবে। এই প্রকারে এবং আরও কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্রস্থানকে উপযুক্ত করিয়া, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করিলে, শত বৎসরেও চিত্রের অন্যথা হয় না।'[৯]

সাহিত্যে চিত্রের যে চমৎকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়, সূত্রকর্তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, কবি এ বিষয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

কালিদাস চিত্রস্থ নায়িকার আলাপকারিত্বের উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন ; সূত্র-কার এতদপেক্ষাও কঠিনতর ভাববিন্যাস চিত্রের অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

৭ চিত্রং কর্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্বকৈঃ।

৮ শ্বেত-কাদ্রব-কৃষ্ণাভির্বর্তিকাভির্যথাক্রমম্ ॥
আলিখ্য স্থাপয়েদ্বিদ্বান্ প্রমাণে স্থানকে তথা।
ততস্তু রঞ্জয়েদ্রঙ্গৈর্যথাস্থানানুরূপতঃ ॥

৯ অপি বর্ষশতস্যান্তে ন প্রনশ্যেত্তু কর্হিচিৎ। —৪০।৯

তাঁহার মতে, যিনি নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনাযুক্তভাব, মৃতদেহের সংজ্ঞাশূন্যতা ও নিম্নোন্নতভাব ফলাইতে পারেন, তিনিই চিত্রশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত। যিনি জলের তরঙ্গ, অগ্নির শিখা, ধূম, পতাকাযুক্ত আকাশ প্রভৃতি বায়ুর গতির সহিত অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনিই চিত্রবিৎ। সুতরাং চিত্রজ্ঞকে এমন ভাবে তূলিকা-পরিচালনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার চিত্র দেখিয়া লোকে যেন সত্য সত্যই বুঝিতে পারে যে, বায়ুবেগে অগ্নিশিখা ধ্বক্ ধ্বক করিতেছে ; বায়ু ধূমরাশিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে ; বায়ুর মৃদুমন্দ বেগে জলে তরঙ্গ উঠিয়াছে ; এবং আকাশে পতাকা দুলিতেছে।[১০]

কাব্যে যেমন নবরসের বিন্যাস হইয়া থাকে, চিত্রেও তেমনই শৃঙ্গারাদি রস প্রকটনের উপদেশ আছে।[১১]

চিত্রস্থ মানব প্রভৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণাদি সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে। সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিলে চিত্র সম্বন্ধে একখানি বড় পুস্তক হইতে পারে। আমরা শিল্পের পরিচয়মাত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুতরাং বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টিতার পরিচায়ক কতিপয় বিষয় এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত করিব।

শাস্ত্রে আদেশ আছে যে, রাজাদিগকে মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত করিতে হইবে।[১২] তাঁহাদের শরীর চক্রবর্তিলক্ষণযুক্ত হইবে। হস্ত জালপাদের মত হইবে। তাঁহাদের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঊর্ণা (আবর্তচিহ্ন) দেখাইতে হইবে। তাঁহাদের উভয় হস্তের মধ্যে তিনটি করিয়া মনোহর রেখা দেখাইতে হইবে ; ঐ রেখাগুলি শশকের রক্তের মত বর্ণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কেশগুলি তরঙ্গের মত ভঙ্গী-যুক্ত, সূক্ষ্ম, ইন্দ্রনীলমণির মত বর্ণযুক্ত, স্বাভাবিক তৈলাক্তভাববিশিষ্ট ও দক্ষিণাবর্ত-তরঙ্গান্বিত হইবে। চক্ষুর আকার সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার কথিত হইয়াছে। চাপাকার (ধনুরাকার), মৎস্যোদরসদৃশ, উৎপলপত্রসদৃশ, পদ্মপত্রসদৃশ ও শশাকৃতি। তন্মধ্যে চাপাকার চক্ষু তিনযব পরিমিত ; মৎস্যোদর চক্ষু চারিযব পরিমিত ; উৎপলপত্র

১০ তরঙ্গাগ্নিশিখা-ধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্।
বায়ুগত্যা লিখেদ্‌যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জিতম্।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ ॥

১১ শৃঙ্গারহাস্যকরুণবীররৌদ্রভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব চিত্ররসাঃ স্মৃতাঃ ॥

১২ নৃপাশ্চ সর্বে কর্তব্যা মহাপুরুষলক্ষণাঃ

চক্ষু ছয়যব পরিমিত; পদ্মপত্র চক্ষু নয়যব পরিমিত, এবং শশাকৃতি চক্ষু দশযব পরিমিত করিতে হয়। স্বকীয় অঙ্গুলিমানানুসারে যবমান বুঝিতে হইবে। যোগস্থ ব্যক্তিদিগের চক্ষু 'চাপাকার'; কামীদিগের ও নারীদিগের চক্ষু 'মৎস্যোদরাকৃতি'; নির্বিকারচিত্ত ব্যক্তির চক্ষু 'উৎপল-পত্রাভ'; ত্রস্ত ব্যক্তির ও রোদনকারী ব্যক্তির চক্ষু 'পদ্মপত্রনিভ'; এবং ক্রুদ্ধ ও বেদনাপীড়িত ব্যক্তির চক্ষু 'শশাকৃতি' হওয়া আবশ্যক।

দেবতাদিগের চক্ষু মনোজ্ঞ, বিশাল, প্রসন্নতাব্যঞ্জক কৃষ্ণবর্ণ-তারাযুক্ত ও পদ্মপত্রপ্রান্তের মত হইবে। উভয় চক্ষু সমান, গোক্ষীরবর্ণসদৃশ ও পক্ষ্মযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

দেবতার চিত্র পূর্বোক্ত হংসের প্রমাণানুসারে করিতে হইবে। তাঁহাদের চক্ষুর পক্ষ্ম ও ভ্রূদ্বয়, এই কয় স্থানে লোম অঙ্কিত হইবে। তাঁহাদের আকৃতি ষোড়শবর্ষীয়ের মত হওয়া আবশ্যক।

চিত্রে দেবতার আকৃতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, রাজাদিগের রূপও সেইরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। অধিকন্তু নৃপতিদিগের গাত্রে লোম অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। ঋষি, গন্ধর্ব, দানব, মন্ত্রী, পুরোহিত ও জ্যোতির্বিদ্, ইহাদের আকৃতি পূর্বোক্ত ভদ্রের প্রমাণানুসারে অঙ্কিত করিতে হইবে। ঋষিদিগের আকৃতি জটাজুটশোভিত হইবে। তাঁহাদের গাত্রে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বস্ত্র রূপে দেখাইতে হইবে, এবং আকৃতি দুর্বলতা-ব্যঞ্জক ও তেজস্বিতাদ্যোতক হওয়া আবশ্যক। দেবতাদিগের ও গন্ধর্বদিগের মস্তকে মুকুট থাকিবে না। ব্রাহ্মণদিগের পরিধানে শুক্লবস্ত্র ও শরীর ব্রহ্মবর্চস-(বেদাধ্যয়নজনিত তেজ)-যুক্ত হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রী, পুরোহিত ও জ্যোতির্বিদ্ সর্বালঙ্কার-ভূষিত হইবেন। পরন্তু ইহাদের মস্তকে মুকুটের পরিবর্তে উষ্ণীষ থাকিবে। দৈত্যদানবদিগের মুখ ভ্রূকুটিভীষণ ও চক্ষু গোলাকার। তাহাদের বেশ অত্যন্ত ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক। ভদ্রের পরিমাণানুসারে বিদ্যাধরের আকৃতি অঙ্কিত করিতে হয়। ইহাদের প্রত্যেক ছবিই পত্নী-সহিত ও মাল্যালঙ্কারে ভূষিত হইবে। কিন্নর, সর্প ও রাক্ষস, ইহাদের আকৃতি মালব্যের পরিমাণানুসারে অঙ্কনীয়। এই স্থলে যে সর্পের কথা বলা হইয়াছে, উহা সর্পসংজ্ঞক মনুষ্য। নাগকন্যা উলূপীকে অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। অত্রত্য উরগও সেই জাতীয় মনুষ্য। রুচকের প্রমাণানুসারে যক্ষের মূর্তি অঙ্কনীয়। প্রধান মানবের আকৃতি শশকের প্রমাণানুসারে অঙ্কিত হইবে।

পিশাচ, বামন, কুব্জ ও প্রমথ, ইহাদের আকৃতি ও রূপ প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে

চিত্রণীয়। উক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর স্ত্রীকে পুরুষের প্রমাণানুসারে, অর্থাৎ যাহাতে পুরুষের সহিত সামঞ্জস্য হয়, তদনুরূপ চিত্রিত করিতে হয়।

কিন্নর সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে এক শ্রেণী মনুষ্যমুখ; অপর শ্রেণী অশ্বমুখ। মনুষ্যমুখদিগের শরীর ঘোড়ার মত, এবং অশ্বমুখদিগের শরীর মনুষ্যের মত। অশ্বমুখদিগের শরীর সর্বালঙ্কারভূষিত। ইহাদিগকে দ্যুতিমান্ ও গীতবাদ্যযুক্তরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। রাক্ষসের আকৃতি ভীষণ, বিকলচক্ষু ও ঊর্ধ্বকেশযুক্ত। দেবাকৃতি সর্পগণ ফণাযুক্ত। যক্ষগণ অলঙ্কারযুক্ত। দেবতাদিগের গণ অর্থাৎ পারিষদবর্গ নানা প্রকার জন্তুর মুখযুক্ত। তাহাদের বেশ, আয়ুধ, ক্রীড়া ও কর্ম ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ একরূপই হইবে। তাহারা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাসুদেবগণ বাসুদেবের সমানাকৃতি; সঙ্কর্ষণগণ তৎসমানাকৃতি; প্রদ্যুম্নগণ তৎসমানাকৃতি; এবং অনিরুদ্ধগণ তাঁহার সমানাকৃতি; বাসুদেবগণের বর্ণ নীলোৎপলের মত শ্যাম; সঙ্কর্ষণগণের উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ; প্রদ্যুম্নগণের বর্ণ মরকতমণির মত ও অনিরুদ্ধগণের বর্ণ সিন্দূরের মত রক্ত।

বেশ্যাদিগকে রুচকের পরিমাণানুসারে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহাদিগের বেশ উৎকট-শৃঙ্গারভাব-ব্যঞ্জক করিতে হয়।

কুলস্ত্রীদিগকে মালব্যের মানানুসারে লজ্জাবতীরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। তাহাদের গাত্রে অলঙ্কার দেখাইতে হইবে, কিন্তু, তাহা অত্যন্ত সমুন্নত হইবে না। দৈত্যদানব প্রভৃতির স্ত্রীও তাহাদের অনুরূপ। বিধবা স্ত্রীদিগের আকৃতি পক্বকেশযুক্ত, সর্বালঙ্কাররহিত ও শুক্লবস্ত্রপরিহিত রূপে অঙ্কিত করিতে হইবে।

প্রায় প্রত্যেক জাতিরই আকার প্রভৃতির নিয়ম কথিত হইয়াছে। এই প্রকরণের উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে, যাহা বলা হইল, উহা কেবল অদৃষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অর্থাৎ, যাহা সর্বদা দেখা যায় না, তাহারই এই নিয়ম। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তদাকারেই অবিকল চিত্রিত করিতে হয়। চিত্রাঙ্কনে সাদৃশ্যই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[১৩] বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেশ, নিয়োগ, স্থান, কর্ম, আসন, শয়ন, যান ও বেশ দেখাইতে হয়। কিন্তু রাত্রিকালের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল দেখাইতে হয়। জাঙ্গল, আনূপ প্রভৃতি ভূমিকে তত্তৎলক্ষণযুক্ত করিতে হইবে। ছয়ঋতু, নবরস প্রভৃতি প্রত্যেকের লক্ষণ চিত্রকর্মে অভিহিত হইয়াছে।

চিত্রে কোন্ কোন্ পদার্থ বর্ণক অর্থাৎ রঙ রূপে ব্যবহৃত হইবে তাহারও

১৩ চিত্রে সাদৃশ্যকরণং প্রধানং পরিকীর্তিতম্।

নির্দেশ আছে। এই প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, স্বর্ণ, রজত, তাম্র, অভ্র, রাজবন্ত (?) (রাজপট্ট মণিবিশেষ), সিন্দুর, সীসক, হরিতাল, সুধা (চুন), লাক্ষা, হিঙ্গুল ও নীল, এবং আরও অনেক প্রকার পদার্থ রঞ্জনক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[১৪] লৌহপদার্থের, অর্থাৎ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুপদার্থের পত্রবিন্যাস ও রসক্রিয়া, এই দুই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে। (অত্যন্ত পাতলা পাত করিয়া তদ্দারা চিত্রের স্থানবিশেষ আবৃত করা 'পত্রবিন্যাস' শব্দে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়)। লৌহের বিন্যস্তক্রিয়া অর্থাৎ পত্ররূপে ব্যবহার কঠিন; কিন্তু দ্রাবণক্রিয়া সহজ; দ্রাবণ হইলে, অর্থাৎ স্বর্ণ প্রভৃতি পদার্থকে গালাইয়া তরল করিলে, তদ্দারা লেখন অর্থাৎ চিত্রে অঙ্কন অনায়াসে হইতে পারে।[১৫] এই উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুপদার্থকে গালাইয়া, তাহাদিগকে তরল করিয়া, তদ্দারা লেখন অর্থাৎ অঙ্কন করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তরলতা-সম্পাদন ও তাহার স্থায়িত্বরক্ষার প্রণালী 'স্তম্ভনা' শব্দের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।[১৬] রঙ-পদার্থের স্থায়িত্বরক্ষার উপায়ও স্তম্ভনা শব্দে সূচিত হইয়াছে। স্তম্ভনার কতকগুলি উপকরণও কথিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের এই স্থলটি এতই অশুদ্ধিবহুল যে, উহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রকরণের উপসংহারে কথিত শ্লোকার্ধের অর্থ হইতে এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, উপযুক্ত-স্তম্ভনা-যুক্ত চিত্র জলের দ্বারা ধৌত হইলেও নষ্ট হয় না, এবং অনেক বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে।[১৭]

সাধারণতঃ চিত্রের চারি প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে।[১৮] তন্মধ্যে প্রথম 'সত্য'; দ্বিতীয় 'বৈণিক', তৃতীয় 'নাগর'; এবং চতুর্থ 'মিশ্র'। দীর্ঘাকার ফলকে (ফ্রেম্) উপযুক্ত প্রমাণানুসারে, অবিকল অবস্থার ব্যঞ্জক মনোরম

১৪ রঙ্গদ্রব্যাণি কনকং রজতং তাম্রমেব চ।
অভ্রকংরাজবন্তং (রাজপট্টং) চ সিন্দূরং ত্রপুরেব চ॥
হরিতালং সুধা লাক্ষা তথা হিঙ্গুলকং নৃপ।
নীলং চ মনুজশ্রেষ্ঠ তথান্যে সন্ত্যনেকশঃ॥

১৫ সঙ্কটং লৌহবিন্যস্তমভ্রকং (সুকরং) দ্রাবণং ভবেৎ।
এবং ভবতি লৌহানাং লেখনে কর্মযোগ্যতা॥

১৬ দেশে দেশে মহারাজ কার্যাস্তে স্তম্ভনাযুতাঃ।

১৭ ধৌতং জলেনাপি ন নাশয়েৎ, (!) তিষ্ঠত্যনেকানি চ বৎসরাণি।

১৮ সত্যং চ বৈণিকঞ্চৈব নাগরং মিশ্রমেব চ।
চিত্রং চতুর্বিধং প্রোক্তং তস্য বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

লোকসাদৃশ্য অঙ্কিত হইলে, ঐ চিত্র 'সত্য' নামে কথিত হয়। ঐ শ্রেণীর চিত্রই যদি চতুরস্র ফলকে উপযুক্ত প্রমাণাদিযুক্ত হইয়া অনুল্বনাকৃতি অর্থাৎ 'জাঁকজমক'-রহিত রূপে অঙ্কিত হয়, তবে উহা 'বৈণিক'। গোলাকার ফলকে অঙ্কিত দৃঢ়াবয়বব্যঞ্জক অল্পমাল্যভূষণযুক্ত চিত্র 'নাগর'। মিশ্রলক্ষণান্বিত চিত্র 'মিশ্র'। চিত্র-নির্মাণে তিন প্রকার বর্তনা (তুলির টান বলিয়া মনে হয়) কথিত হইয়াছে। ইহা যথাক্রমে পত্রা, হৈরিক ও বিন্দুজ নামে অভিহিত। তন্মধ্যে পত্রাকৃতি-রেখাবিশিষ্ট বর্তনা 'পত্রা'; সূক্ষ্ম রেখা 'হৈরিক'; স্তম্ভনাযুক্ত 'বিন্দুবর্তনা'। (স্থায়িরূপে বিন্দু বিন্দু দাগ দেওয়া বিন্দুবর্তনা বলিয়া মনে হয়)। প্রথমতঃ রেখাপাত, তৎপরে বর্তনা; উপযুক্ত ভূষণবিন্যাস ও বর্ণক (বর্ণপ্রলেপ) চিত্রের ভূষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে গৃহে নানা প্রকার চিত্র রাখিবার রীতি দেখা যায়। কিন্তু পূর্বকালে সকল গৃহে সকল প্রকার চিত্র রক্ষিত হইত না। শৃঙ্গারাদি নবরসের ব্যঞ্জক চিত্রের মধ্যে কেবল শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্ত রসের চিত্র গৃহে স্থাপিত হইত।[১৯] বিধান এই যে, রাজার সভাগৃহে ও দেবালয়ে সমস্ত রসের চিত্র অঙ্কিত করিবে; কিন্তু রাজার ও সাধারণের বাসগৃহে যুদ্ধ, শ্মশান, দুঃখার্ত ব্যক্তি, কুৎসিতাকৃতি ও অমঙ্গল-ব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কিত করিবে না। আরও একটি বিশেষ উপদেশ এই যে, নিজের হাতে নিজের গৃহে কখনও চিত্র অঙ্কিত করিবে না।[২০]

রুচিভেদে চারিটি বিষয় চিত্রে প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আচার্যগণ অর্থাৎ চিত্রবিদ্যাবিশারদগণ রেখাপাতেরই প্রশংসা করেন। অন্যান্য বিচক্ষণগণ বর্তনার প্রশংসা করেন। স্ত্রীলোকেরা ভূষণের বাহুল্য পছন্দ করে, এবং সাধারণ মানবগণ বর্ণের চাকচিক্য ভালবাসে।[২১]

সমস্ত কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্র প্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের প্রদায়ক।[২২] চিত্রসূত্র-কার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পর্বতের মধ্যে যেমন সুমেরু শ্রেষ্ঠ, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড় শ্রেষ্ঠ, এবং মানুষের মধ্যে যেমন রাজা প্রধান, তেমনই সমস্ত কলার মধ্যে চিত্র

১৯ শৃঙ্গারহাস্যশান্তাখ্যা লেখনীয়া গৃহেষু তে

২০ চিত্রকর্ম ন কর্তব্যমাত্মানা স্বগৃহে নৃপ।

২১ রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যা বর্তনাং চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥

২২ কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।

প্রধান।[২৩] পূর্বে যুদ্ধ প্রভৃতির চিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত হইত যে, তাহা দেখিয়া অতীত ঘটনাও প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। মহাভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে কংসের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রেও কংসের ও কৃষ্ণের উদ্‌গূর্ণ (যাহার উদ্যম করা হইয়াছে) ও নিপতিত প্রহার দেখিতে পাওয়া যায়।[২৪] অর্থাৎ, চিত্র দেখিয়া মানুষ বুঝিতে পারে যে কৃষ্ণ ও কংস উভয়ে প্রহারের উদ্যম ও প্রহার করিতেছেন।

এখন যেমন চিত্রে প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখা হয়, পূর্বকালেও এই রীতির বহুল প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে প্রায় অন্যের দ্বারাই চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্বকালে রাজা রানী প্রভৃতি নায়ক নায়িকাগণ নিজেই এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত প্রিয়তমের বা প্রিয়তমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তদ্দর্শনে বিরহের দুঃখ প্রশমিত করিতেন।

রাজা দুষ্মন্ত নিজের হাতেই শকুন্তলার মনোহর মূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাতে নয়ন যুগলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

সাগরিকা বৎসরাজের চিত্র স্বহস্তেই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। (রত্নাবলী, ২য় অঙ্ক)। কারুর দ্বারাও ফরমাইশ মত চিত্র প্রস্তুত করান হইত। শ্রীহর্ষের বর্ণনায় জানা যায় যে, নলরাজের রূপগুণ শ্রবণে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা দময়ন্তী লীলা-গৃহের ভিত্তিতে কারুতরের দ্বারা নলের এবং নিজের চিত্র আঁকাইয়া উভয়ের সখ্য দর্শন করিয়াছিলেন।[২৫] ভবভূতির লেখনীপ্রসূত রামবনবাসের বিস্তৃত চিত্রে অতীব নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রদর্শনে রামচন্দ্র অতীত ঘটনাবলীকে উপস্থিত মনে করিয়াছিলেন। (উত্তর চরিত, ১ম অঙ্ক)। বলা বাহুল্য যে, সে সময়ে কবির কল্পনানুসারী চিত্র অঙ্কিত করিয়া অভিনয়কার্য সম্পন্ন করা হইত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে— আমাদের শিল্পশাস্ত্রে চিত্রবিদ্যা চতুঃষষ্টি কলার

২৩ যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাম্ যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশঃ তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥

২৪ চিত্রেষপি উদ্‌গূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য কৃষ্ণস্য চ। (মহাভাষ্য ৩।১।২)

২৫ প্রিয়ং প্রিয়াঞ্চ ত্রিজগজ্জয়িশ্রিয়ৌ
লিখাধিলীলাগৃহভিত্তি কাবপি।
ইতি স্ম সা কারুতরেণ লেখিতং
নলস্য চ স্বস্য চ সখ্যমীক্ষতে॥ (নৈষধ ১।৩৮)

অন্যতম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে চতুঃষষ্টি কলার যে নাম-নির্দেশ দেখা যায়, তাহাতে আলেখ্য (চিত্র) চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।[২৬] কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চিত্রকে 'ষড়ঙ্গ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ চিত্রনির্মাতাকে ছয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য সম্পাদন করিতে হয়। সেই ছয়টি অঙ্গ যথাক্রমে রূপভেদ, প্রমাণ, ভাবযোজন, লাবণ্য-যোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকা-ভঙ্গ।[২৭] যশোধর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীত হইতে চিত্র পর্যন্ত যে কয়টি কলা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজন অন্যের অনুরাগ জন্মান এবং নিজের চিত্তবিনোদন।[২৮]

আমরা কিন্তু চিত্রকলার আরও অনেক প্রয়োজন অনুভব করি। চিত্র না হইলে শিল্পের স্বরূপ জ্ঞাপন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ছাত্রকে বুঝাইবার সময়ে চিত্রের সাহায্যে যতটা ভাব প্রকাশ করা যায়, কেবল ভাষার দ্বারা তাহা হইয়া উঠে না। টীকাকারগণ 'পুষ্পবিশেষঃ' 'জন্তুবিশেষঃ' এইরূপ উক্তির দ্বারা মূলের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ বৈজাত্য-নির্দেশপূর্বকই শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্য সম্পাদন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন যুগের রীতি এরূপ ছিল না। কারণ শিবধর্মের একটি বচন পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা এবং দেশভাষা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা শিষ্যকে উপযুক্ত রূপে বুঝাইতে পারেন, তিনিই গুরু নামে অভিহিত হন।[২৯] উক্ত বচনস্থ আদিপদের দ্বারা চিত্র প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য মহাশয় আদিশব্দের অর্থ 'গ্রন্থ-করণাদি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাতেও 'আদি' শব্দ দেখা যায়; সুতরাং তাঁহার সহিত একমত হইয়াও আমরা তৎপ্রযুক্ত আদি শব্দের বলে চিত্র প্রভৃতি উপায়কে ধরিতে পারি।

কারণ আমাদের মত শাস্ত্রব্যবসায়িগণও সেকালে কলাজ্ঞানে নৈপুণ্যলাভ করিতেন। আমরা ভারতী মাতার নিকটে যে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করি, তাহাতে নৃত্যগীতাদি কলারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

২৬ গীতং বাদ্যং নৃত্যং আলেখ্যং বিশেষকচ্ছেদম্ ইত্যাদি। (৩ অধ্যায়)

২৭ রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য-যোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

২৮ এতানি পরানুরাগ জননাত্মাত্মবিনোদনার্থানিচ।

২৯ সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ
দেশ-ভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥ (আহ্নিকতত্ত্ব)

বেদাঃ শাস্ত্রানি সর্বানি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রাঘবভট্ট আত্মপরিচয়দানাবসরে নিজকে কলা-কুশল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কলা যে পূর্বাচার্যদিগের বিশেষ আদরণীয় ছিল, এবং বিবিধ প্রয়োজন সম্পাদন করিত, তাহা বুঝা যাইতেছে।

—

প্র তি মা

আর্য সাহিত্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ শ্রেণীর প্রতিমার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিমার উপাদানরূপে ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গজদন্ত, তৃণ, কাষ্ঠ, বস্ত্র প্রভৃতি গৃহীত হইত; উপাদানের এবং প্রয়োজনের পার্থক্যানুসারে প্রতিমার নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। অমরকোষে— প্রতিমান প্রতিবিম্ব, প্রতিমা, প্রতিযাতনা, প্রতিকৃতি, অর্চা, প্রতিনিধি এই কয়টি শব্দ প্রতিমা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও এই কয়টি শব্দই আপাততঃ সমানার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তথাপি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, এবং শাস্ত্রোক্ত প্রয়োগে, ইহাদের অর্থগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিমান শব্দের নিরুক্তি যাহার দ্বারা প্রকৃত বস্তু উপমিত অর্থাৎ অনুকৃত হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দেবতা মনুষ্য পশু প্রভৃতি যাবতীয় মূর্তবস্তুর কৃত্রিম প্রতিবিম্বই প্রতিমা শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে; প্রতিবিম্ব প্রভৃতি শব্দের নিরুক্তিলভ্য অর্থও ইহারই অনুরূপ। কিন্তু অর্চাশব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ (অর্চাতে কর্মণি অঙ্ প্রত্যয়) যাহাকে পূজা করা হয়; সুতরাং কেবল দেবতার প্রতিকৃতিই অর্চা শব্দের প্রতিপাদ্য; মনুষ্যাদির প্রতিকৃতি অর্চা হইতে পারে না। অমরসিংহ লাঘবতঃ পূজ্য অপূজ্য উভয় প্রতিকৃতির একত্র উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা কেবল পূজ্য প্রতিমাই তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে না।

স্মৃতির বচনে অর্চা শব্দ পূজ্য প্রতিমা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা— 'যে দুরাত্মার গৃহে কেশবের অর্চা অবস্থিত নহে, তাহার অন্ন খাইবে না যেহেতু ঐ অন্ন অভক্ষ্যের তুল্য।'[৩০]

৩০ কেশবার্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি দুরাত্মন
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যং অভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥ (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভাগবতে (১১শ স্কন্ধে) পূজ্য প্রতিমার আট প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী। শুক্রনীতিসারেও আট প্রকার প্রতিমা কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভেদ ভাগবতোক্ত হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দেখা যায়, যথা— সৈকতী, পৈষ্টী, লেখ্যা, লেপ্যা, মৃন্ময়ী, কাষ্ঠময়ী, পাষাণময়ী ও ধাতুময়ী। ইহারা উত্তরোত্তর স্থিরতররূপে জ্ঞাতব্য।[৩১]

বালুকানির্মিত প্রতিমা মৃন্ময়ী হইলেও তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মৃন্ময়ী প্রতিমানির্মাণে খড়, পাট প্রভৃতি উপাদানান্তর আবশ্যক হয়। সৈকতীর উপাদান কেবলই বালুকা। পিষ্ট পদার্থ পিটালু প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত পৈষ্টীনামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা চিত্রে অঙ্কিত হয়, তাহার নাম লেখ্যা। স্তরে স্তরে লেপের উপর লেপ দিয়া যে প্রতিমা প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম লেপ্যা। মৃন্ময়ী প্রতিমার মুখ ছাঁচে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হস্ত-ব্যাপারে নিষ্পন্ন হয়; বার্ক্ষী, পাষাণময়ী এবং ধাতুময়ী প্রতিমা বৃক্ষ, প্রস্তর ও বিবিধ ধাতু এই সকল পদার্থ হইতে উৎকীর্ণ হইয়া থাকে। ধাতু গলাইয়া তাহাকে ছাঁচে ঢালিয়াও ধাতুপ্রতিমা প্রস্তুত করা হয়।

লৌহপ্রতিমা সূর্মী, স্থূণা ও অয়ঃপ্রতিমা নামে অভিহিত হইয়াছে।[৩২] এই সূর্মীর অভ্যন্তর সচ্ছিদ্র থাকিত এবং তাহাতে অগ্নি প্রবেশিত হইয়া দগ্ধ করিত, বোধ হয় ইহা মল শোধনের উপায়রূপে বিবেচিত হইয়াছিল। মহাভাষ্যধৃত একটি মন্ত্রে সূর্মীর এবং তাহাতে অগ্নিপ্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'হে বরুণ! তুমি সুদেব অর্থাৎ সত্যদেব হও, অগ্নি যেমন সচ্ছিদ্র সূর্মীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দহন করে, সেইরূপ তোমার সপ্তসিন্ধু (সাতবিভক্তি) তালুকে পাইয়া প্রকাশিত হয়[৩৩]। ব্যাকরণেও পূজ্য এবং অপূজ্য এই দ্বিবিধ প্রতিকৃতি অর্থেই অর্চা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বিক্রেয় এবং অবিক্রেয় অর্থাৎ যাহা দেবলক-দিগের জীবিকারূপে ব্যবহৃত হয়, এই উভয়বিধ প্রতিমার সংজ্ঞাগত পার্থক্য ও বিবেচিত হইয়াছে। পাণিনির কয়টি সূত্র এই বিষয়ে প্রমাণরূপে উপন্যস্ত হইতে

৩১ প্রতিমা সৈকতী পৈষ্টী লেখ্যা লেপ্যাচ মৃন্ময়ী
বার্ক্ষী পাষাণ-ধাতূত্থা স্থিরাজ্ঞেয়া যথোত্তরা॥ (১১।৪।৪)

৩২ সূর্মী স্থূণায়ঃ প্রতিমা। (অমরকোষ, শূদ্রবর্গ)

৩৩ সুদেব অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ
অনুক্ষরতি কাকুদং সূর্মীং সুষিরামিব॥ (উপোদ্‌ঘাতঃ)

পারে, যথা— 'ইবে প্রতিকৃতৌ' (৫।৩।৯৬)। ইব শব্দের অর্থে অর্থাৎ সদৃশ অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয়, প্রতিকৃতি বুঝাইলেই এই প্রত্যয় হইবে, অন্যত্র হইবে না। যথা— অশ্বের প্রতিকৃতি অশ্বক, উষ্ট্রের প্রতিকৃতি উষ্ট্রক ইত্যাদি। 'জীবিকার্থে চাপণ্যে' (৫।৩।৯৯)। যাহা জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয় অথচ বিক্রেয় নহে, সেইরূপ প্রতিকৃতিকে বুঝাইলে ইবার্থে বিহিত কন্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। বাসুদেব, শিব, স্কন্দ, বিষ্ণু, আদিত্য ইত্যাদি। উদাহৃত বাসুদেব প্রভৃতি শব্দে দেবলক প্রভৃতির জীবিকা স্বরূপ— দেবপ্রতিমা অভিহিত হইয়া থাকে[৩৪]। বিক্রেয় প্রতিমা বুঝাইলে হস্তিক, রথক, অশ্বক এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে। (কাশিকা)। 'দেব পথাদিভ্যশ্চ' (৫।৩।১০০)। প্রতিকৃতি বুঝাইলে ইবার্থে এবং সংজ্ঞার্থে দেব পথাদি শব্দের পর বিহিত কন্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। বৃত্তিকার কর্তৃক এই সূত্রের অভিপ্রায় বিশদরূপে কারিকাকারে বিবৃত হইয়াছে। যথা—

অর্চাসু পূজনার্থাসু চিত্রকর্ম-ধ্বজেষু চ।
ইবে প্রতিকৃতৌ লোপঃ কনো দেবপথাদিষু॥

পূজনার্থ অর্চা, চিত্রকর্ম (ছবি) এবং ধ্বজ এই সকল অভিহিত হইলে সদৃশ প্রতিকৃতি অর্থে কন্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। পূজনীয় অর্চা অর্থে শিব, বিষ্ণু, চিত্র অর্থে অর্জুন, দুর্যোধন, ধ্বজ অর্থে কপি, গরুড় ইত্যাদি প্রয়োগ হয়।

প্রাচীন যুগে যে সকল কার্যে প্রতিমার প্রয়োজন হইত, বর্তমান কালে অনেক স্থলেই তাহার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। বর্তমান সময়ে আভ্যুদয়িক কার্যে গৌরী প্রভৃতি মাতৃকা পূজায় প্রতিমার ব্যবহার দেখা যায় না, যবপুঞ্জেই অর্চনা হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাকালে শুভ্র প্রতিমাতেও এই পূজা সম্পন্ন হইত।

প্রতিমার অভাবে পট এবং পটের অভাবে যবপুঞ্জের ব্যবস্থা দেখা যায়[৩৫]।

---

৩৪ কাশিকায় উল্লিখিত দেবলক শব্দের অর্থকথনপ্রসঙ্গে পদমঞ্জরী টীকাকার হরদত্ত বলিয়াছেন, —'যে প্রতিমা গ্রহণ করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, সেই প্রতিমা বাসুদেব শিব প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এবং তাদৃশ ভিক্ষুকগণই দেবলক শব্দের প্রতিপাদ্য।' যাহা মঙ্গলকামনায় অথবা মুক্তিকামনায় গৃহাদিতে স্থাপিত এবং পূজিত হয়, তাদৃশ প্রতিমা বুঝাইলে 'অর্চানুপূজার্থাসু' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ অনুশাসনানুসারে প্রত্যয়ের লোপ হয়। (বাসুদেবঃ শিব ইতি যাঃ প্রতিমাঃ প্রতিগৃহ্য গৃহাদ্ গৃহং ভিক্ষমাণা অটন্তি, তা এব মুচ্যন্তে। তাহি জীবিকার্থা ভবন্তি দেবলকা অপি ত এব ভিক্ষবোঽভিপ্রেতাঃ। যাস্ত্বায়তনেষভ্যুদয়নিশ্রেয় সার্থং প্রতিষ্ঠাপ্যন্তে পূজ্যন্তেচ তাস্বর্চাসু পূজার্থাস্বিতি বক্ষ্যমাণেন লুগ্ ভবতি)।

৩৫ কর্মাদিষুচ সর্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ॥
প্রতিমাসুচ শুভ্রাসু লিখিত্বা বা পটাদিষু—
অপি বাঽক্ষত-পুঞ্জেষু নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ॥ (কর্মপ্রদীপ ১৪)

বর্তমান যুগেও গ্রহযাগ বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সেই আর্যযুগের নির্দিষ্ট বিভিন্ন উপাদান-ঘটিত তাদৃশ গ্রহপ্রতিমা আজ কয়স্থলে দেখা যায়? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, তাম্র, স্ফটিক, রক্তচন্দন এই তিন উপাদানের দ্বারা যথাক্রমে সূর্য, চন্দ্র ও মঙ্গল এই তিন গ্রহের মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বর্ণের দ্বারা বুধ ও বৃহস্পতির মূর্তি, রজত, লৌহ, সীস, ও কাংস্য এই চারি ধাতুর দ্বারা যথাক্রমে শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই চারি গ্রহের মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে।[৩৬] পত্নীর সাহিত্য ব্যতীত যজ্ঞকার্যে অধিকার নাই, পত্নীর অভাবে তাঁহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে কল্পনাপূর্বক যজ্ঞে ব্রতী হইবার রীতি ছিল; কর্মপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রও যশস্বিনী পত্নী সীতাদেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমাকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়া মহাত্ম-ভ্রাতৃবর্গের সহিত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।[৩৭]

যে প্রতিকৃতি ক্রীড়া প্রভৃতি প্রয়োজন ব্যবহৃত হয়, তাহা পাঞ্চালিকা এবং পুত্রিকা। অমর সিংহ এই পুত্রিকা বা পুত্তলিকা বস্ত্র-দন্তাদি উপাদানে নির্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৮] এই স্থলে ভানুজীদীক্ষিত-সম্মত পাঠ পঞ্চালিকা, তিনি ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন, 'যাহা পাঁচ প্রকার বর্ণের দ্বারা ভূষিত হয়।[৩৯] তিনি পক্ষান্তরে পাঞ্চালিকা পাঠ গ্রহণ করিয়া, তাহার নিরুক্তি দেখাইয়াছেন— 'পঞ্চাল-ভব এই অর্থে পাঞ্চালিকা হইতে পারে'। এই নিরুক্তি অনুসারে বোধ হয়, পঞ্চাল দেশেই পুত্তলিকার উদ্‌ভাবন হইয়াছিল।

মেদিনীকোষে কেবল বস্ত্রনির্মিত পুত্তলিকাই পাঞ্চালিকা নামে অভিহিত হইয়াছে।[৪০] মেদিনীর এই উক্তিতে বোধহয়, তাঁহার সময়ে পুতুল নির্মাণে কেবল বস্ত্রই উপাদানরূপে গৃহীত হইত। আচার্য হেমচন্দ্র পাঞ্চালিকার পর্যায়ে শালভঞ্জিকা শব্দের পাঠ করিয়াছেন।[৪১]

---

৩৬ সূর্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি নবগ্রহাঃ॥
তাম্রকাৎ স্ফটিকাদ্রক্ত-চন্দনাৎ স্বর্ণকাদুভৌ
রজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ॥ (১।২৬।২৭)

৩৭ রামোঽপি কৃত্বা সৌবর্ণীং সীতাং পত্নীং যশস্বিনীং
ঈযে যজ্ঞৈর্বহুবিধৈঃ সহভ্রাতৃভিরর্চিতৈঃ॥ (৩।১০)

৩৮ পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদ্বস্ত্রদন্তাদিভিঃ কৃতা। (শূদ্রবর্গ, ২৯)

৩৯ পঞ্চভির্বর্ণৈরল্যতে (অলভূষণাদৌ) ঘঞ্।

৪০ পাঞ্চালিকা স্ত্রিয়াং বস্ত্র-পুত্রিকা-গীতি-ভেদয়োঃ।

৪১ শালভঞ্জী পাঞ্চালিকা চ পুত্রিকা। (তির্যক্ কাণ্ড ২০।১৪)

জটাধরের মতে কেবল কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকাই শালভঞ্জিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। শালভঞ্জিকার উপাদান যাহাই হউক না কেন, ইহার বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিপূর্ণ, এবং ইহার বর্ণনে সেকালের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদর্ভ নগরের বর্ণনায় শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন, 'যে নগরে নানারূপ শালভঞ্জিকার মুখচন্দ্রস্থিত কলঙ্করূপ মৃগগুলির যেন অনেক প্রাসাদের উপরিস্থিত সিংহ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।' এই উক্তিতে বুঝা যায়, পুতুলের মুখগুলি কলঙ্ক রহিত চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইত।[৪২]

প্রাচীনতম কবিগুরু সুবন্ধুর উক্তিতে বোধ হয়, সেকালে শালভঞ্জিকার অধিষ্ঠানের দ্বারা গৃহের এবং নগরের সৌন্দর্য সম্পন্ন হইত। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুসুমপুর শালভঞ্জিকাযুক্ত গৃহের দ্বারা উপশোভিত হইয়াছিল।[৪৩] শালভঞ্জিকার অবলম্বনে 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' নামক দৃশ্য কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

দ্বারবতী পুরীর বর্ণনায় মহাকবি মাঘ লিখিয়াছেন যে, নগরীতে গৃহের কপোতপালী (পায়রার খোপ) স্থিত কৃত্রিম (কাষ্ঠনির্মিত) পক্ষিসমূহকে (বাস্তবিক পক্ষী মনে করিয়া) ধরিবার অভিপ্রায়ে আয়তনিশ্চলাঙ্গ বিড়ালকেও মানুষে কৃত্রিম বিড়াল বলিয়াই মনে করিত।[৪৪]

বর্তমান সময়ে আমরা জলের কলে কুকুরের অথবা বাঘের মুখ হইতে জল পড়িতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পের নৈপুণ্য অনুভব করি। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট কাদম্বরীর ভবন যে-ভাবে সাজাইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের তুলনায় প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পের ন্যূনতা অনুভূত হয় না। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—কোথাও স্ফটিকনির্মিত বলাকাশ্রেণীর মুখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে, কোথাও কলের

৪২ বহুরূপক-শালভঞ্জিকা মুখচন্দ্রেষু কলঙ্করঙ্কবঃ।
যদনেকক-সৌধকন্ধরা-হরিভিঃ কুক্ষিগতী-কৃতা ইব। (নৈষধ ২।৮৩)

৪৩ অস্তি সুধাধবলৈর্বৃহৎকথারম্ভৈরিব শালভঞ্জিকোপেতৈর্বেশ্মভিরূপশোভিতম্॥ (বাসবদত্তা)

৪৪ চিক্রংসয়া কৃত্রিম-পত্রি-পঙ্‌ক্তেঃ
কপোতপালীষু নিকেতনানাম।
মার্জারমপ্যায়তনিশ্চলাঙ্গম্
যস্যাং জনঃ কৃত্রিমমেবমেনে। (৩।৫১)

সাহায্যে কৃত্রিম মেঘমালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে আবার ইন্দ্রধনু (রামধনু) শোভাবিস্তার করিতেছে। স্থানে স্থানে কলের ছোট ছোট গাছ বড় বড় জলবিন্দু বর্ষণ করিতেছে, কোথাও বা উড়ন্ত কলের পাখি পাখা নাড়িয়া জল-কণা মিশ্রিত ঠাণ্ডা হাওয়া জোগাইতেছে।[৪৫] সুতরাং কলের পুতুল চালাইয়া বাহবা পাওয়ার প্রবৃত্তি এবং সফলতা, পূর্বকালে কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মূর্তিশিল্প আমাদের ধর্মকর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই যে জগদম্বা সংবৎসরান্তে দশভুজাকারে ভক্তের মণ্ডপ শোভিত করিতে আসিতেছেন, তাঁহার মহাপূজায় যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন, তন্মধ্যে অভিরূপ প্রতিমাও একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—পূজকের তপোবল, পূজোপকরণের আতিশয্য, এবং প্রতিমার আভিরূপ্য অর্থাৎ সৌন্দর্য, এই কয়টি কারণে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে।[৪৬]

ধ্যানকার্যে প্রতিমার বিশেষ প্রয়োজন। শুক্রনীতিসারে কথিত হইাছে যে, প্রতিমাকারক মানব যেরূপ ধ্যানরত হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হইতে পারে না।[৪৭]

ধ্যানোপযোগিনী প্রতিমা শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী অবয়ব-সন্নিবেশানুসারে নির্মিত হইলে, মনোহারিণী সেই প্রতিমা পুণ্য প্রদান করেন, অবয়ব-সন্নিবেশের ব্যতিক্রম ঘটিলে সাধকের আয়ু ও ধন বিনাশ করেন এবং দুঃখ বৃদ্ধি করেন।[৪৮]

প্রতিমার পরিমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। দেবতা ভেদে প্রতিমার পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়টি মাত্র দেবতার পরিমাণ এই স্থলে প্রদর্শিত হইল, যথা—চণ্ডী, ভৈরব, বেতাল, নরসিংহ ও বরাহ, এই সকল ক্রূর দেবতার মূর্তি দ্বাদশতাল পরিমিত হইবে।[৪৯]

৪৫ ক্বচিৎ স্ফটিকবলাকাবলীবান্তবারিধারা মিলিতেন্দ্রায়ুধাঃ সঞ্চার্যমানা মায়ামেঘমালাঃ…… অনবরতস্থূল জলবিন্দুদুর্দিনমুৎসৃজতঃ যন্ত্রবৃক্ষকান্। ক্বচিদ্বিধূত-পক্ষ-নিঃক্ষিপ্তসীকরানীত-নীহারা ভ্রমন্তী যন্ত্রময়ীঃ পত্রশকুনি-শ্রেণীঃ। (কাদম্বরী)

৪৬ অর্চকস্য তপোযোগাদর্চনস্যাতিশায়নাৎ
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি॥ (তিথিতত্ত্বে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

৪৭ প্রতিমাকারকো মর্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথানান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপিবাখলু॥ (৪।৪)

৪৮ যথোক্তাবয়বৈঃ পূর্ণা পুণ্যদা সুমনোহরা।
অন্যথায়ুর্ধনহরা নিত্যং দুঃখ-বিবর্ধিনী॥ (শুক্র ৪।৪।৭৩)

৪৯ চণ্ডী ভৈরব বেতাল-নরসিংহ-বরাহকাঃ।
ক্রূরা দ্বাদশতালাঃ স্যুর্হয়শীর্ষাদয় স্তথা॥ (শুক্র ৪।৪।৮৬)

শাস্ত্রান্তরে দেবতা-প্রতিমা-দর্শন মাত্রই প্রণামের উপদেশ আছে। এই বিধি লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বাপ্যদণ্ডিনম্।
নমস্কারং নকুর্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ত্বসৌ॥

দেবতা-প্রতিমা ভঙ্গকারীর গুরুতর দণ্ডের বিধান দেখা যায়। যথা—দেবতা-প্রতিমা-ভেদকশ্চোত্তম-সাহসং দণ্ডনীয়ঃ (বিষ্ণু সংহিতা ৫।৬৭)।

এই সকল প্রমাণানুসারে বুঝা যায় যে, আর্যজাতির সহিত প্রতিমার পরিচয় নূতন বা আগন্তুক নহে, আর্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই ধরণীমণ্ডলে প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

দেশভেদে এবং যুগভেদে প্রতিমা-পরিমাণের পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশভেদে মূর্তির সপ্ততাল প্রভৃতি উচ্চতা হইয়া থাকে।[৫০]

সত্যযুগে দশতাল, ত্রেতাযুগে নবতাল, দ্বাপরে অষ্টতাল এবং কলিযুগে সপ্ততাল পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।[৫১] সুতরাং আমাদের মূর্তির পরিমাণ প্রভৃতির সহিত দেশান্তরের শিল্পশাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই; মৎস্যপুরাণ, হয়-শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মূর্তিশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, এই সকল গ্রন্থের মৌলিকতায় পরবর্তী অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। দু-চারিটি প্রবন্ধের দ্বারা মূর্তিশিল্পের বা চিত্রকলার সমগ্র বিবরণ প্রকাশ অসম্ভব, সুতরাং এই প্রবন্ধে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। বৈদিক গ্রন্থেও মূর্তির অস্তিত্ববোধক প্রমাণের অভাব নাই।

—

৫০ সপ্ততালাদ্যুচ্চতা বা মূর্তিনাং দেশভেদতঃ। (শুক্র ৪।৪।৮৪)

৫১ দশতালা কৃতযুগে ত্রেতায়াং নবতালিকা।
অষ্টতালা দ্বাপরেতু সপ্ততালা কলৌযুগে॥ (৪।৪।৮৯)

রাজোপকরণ

যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে নয়টি জিনিস 'রাজোপকরণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথম বলিয়াছেন যে, ধ্বজ, সিংহাসন ও যান প্রভৃতি হইতে যাহা ভিন্ন, যাহা বহিরঙ্গ-রূপে বিবেচিত হয়, তাহাই 'উপকরণ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি চামর, ভৃঙ্গার, চসক, প্রসাধনী, বিতান, শয্যা, ব্যজন, দর্পণ ও অম্বর, এই নয়টি বস্তুকে 'উপকরণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই নয়টি পদার্থ পারিভাষিক 'উপকরণ' সমাখ্যা লাভ করিয়াছে।[১]

—

চামর

উক্ত নববিধ উপকরণের মধ্যে, চামরের বর্ণনা অতি বিস্তৃত। আমরা সেই বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য হইতে সারভূত যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদর্শিত করিব। পূর্বকালে প্রায় সমস্ত জিনিসের ব্যবহারেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপকরণ ব্যবহারেও বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সূর্য প্রভৃতি গ্রহগণের দশাবিশেষ অনুসারে নরপতিদিগের জন্য দশানুযায়ী উপকরণ ব্যবহার ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, এবং দশানুসারে ব্যবহার্য বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সূর্যাদি গ্রহের দশায় জাত রাজাদিগের ভোগ্য চামর যথাক্রমে ভব্য, ভদ্র, জয়, শীল, সুখ, সিদ্ধি, চল ও স্থির, এই আট নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাদের পরিমাণও যথাক্রমে এক এক বিতস্তি বৃদ্ধি করিবার উপদেশ আছে।

জাঙ্গলদেশ-জাত ও অনূপদেশ-জাত রাজা যথাক্রমে স্থলজ এবং জলজ চামর ব্যবহার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। আবার ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ

১ ছত্রধ্বজসিংহাসন-যানাদিভ্যো যদন্যৎ স্যাৎ।
বাহ্যাঙ্গং তদুপকরণং তস্মাল্লোকে বিশেষাস্তু (!)।
চামরশ্চাথ ভৃঙ্গারশ্চসকশ্চ প্রসাধনী।
বিতানশ্চার্থ শয্যাচ ব্যজনং দর্পণাম্বরম্॥
এতন্নবকমুদ্দিষ্টং রাজোপকরণাখ্যয়া॥

নৃপতির চামরনিহিত মালাশ্রেণীতে যথাক্রমে হীরক, পদ্মরাগ, বৈদূর্য ও নীলমণিখচিত হইবে, এরূপ নিয়মও দেখিতে পাওয়া যায়। চামর-নিহিত মালার বর্ণও যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও নীলবর্ণ করিবার উপদেশ দেখা যায়। সম্রাট ব্যতীত সাধারণ রাজার চামর-ব্যবহারের অধিকার ছিল না।

জলজ ও স্থলজ, সাধারণতঃ চামরের এই দুই প্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস, মলয়, উদয়গিরি, অস্তাচল ও গন্ধমাদন, এই সকল পর্বতে যে সমস্ত চমরী সম্ভূত হয়, তাহাদের লোমই 'চমর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পর্বত ভেদে চমরের বর্ণগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বরাহমিহির কেবল হিমালয় পর্বতকেই চমরীর জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বচনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, চামরনির্মাণের উপযুক্ত লোমের জন্য দেবগণকর্তৃক হিমালয় পর্বতের গুহাতে চমরীর সৃষ্টি হইয়াছে, এমত প্রসিদ্ধি আছে। এই চমরীদিগের লাঙ্গূলোৎপন্ন লোম ঈষৎ পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।[২] তিনি চমরীর গুণকথন প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্নেহ (তৈলাক্তের মত) মৃদুত্ব, লোমের বহুত্ব, নির্মলতা, সংলগ্ন-অস্থিমালার অল্পত্ব, এবং শুক্লতা তাহাদের গুণসম্পদরূপে কথিত হইয়াছে।[৩] যুক্তিকল্পতরুতে চমরীগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের লোমেও নানাপ্রকার দোষ গুণ বিবেচিত হইয়াছে। এমন কি, দুষ্ট চামরের ব্যবহারে মৃত্যুর আশঙ্কা পর্যন্ত কথিত হইয়াছে।

জলজ চামর সমুদ্রজাত চমরীর লোম হইতে প্রস্তুত হয়, যুক্তিকল্পতরুতে ইহা কথিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, লবণ-সমুদ্র প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের অভ্যন্তরে নানা জাতীয় চমরী বাস করে। তাহাদের বিবরণ অতি বিস্তৃত। অনাবশ্যক বোধে সেই অপ্রীতিকর বিষয় উপেক্ষিত হইল। সমুদ্রজাত চমরীর লোম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যুক্তিকল্পতরুতে এই বিষয়ের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আছে। পৌরাণিকের মতানুসারে জানা যায় যে, সমুদ্রজাত চমরীদিগের পুচ্ছ মকর-প্রভৃতি-জন্তু কর্তৃক খণ্ডিত হইলে, তীরবাসী পুণ্যশালী মানবগণ তাহা কখনও কখনও পাইয়া থাকেন।

---

২ দেবৈশ্চমর্যঃ কিল কিল বাল-হেতোঃ সৃষ্টা হিমক্ষ্মাধর-কন্দরেষু।
আপীতবর্ণাশ্চ ভবন্তি তাসাং কৃষ্ণাশ্চ লাঙ্গূল-ভবাঃ সিতাশ্চ ॥ (৭১।১)

৩ স্নেহো মৃদুত্বং বহুবালতা চ বৈশদ্যমল্পাস্থিনিবন্ধনত্বম্ ॥
শৌক্ল্যঞ্চ তাসাং গুণ সম্পদুক্তা ॥ (৭০।২)

চামরদণ্ডের পরিমাণ সম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, উহা সার্ধহস্ত, একহস্ত, অথবা অরত্নি-সমান হইবে। উক্ত দণ্ড প্রশস্ত লক্ষণান্বিত কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হইবে, তাহা আবার স্বর্ণের দ্বারা অথবা রূপার দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে, এবং বিবিধ রত্ন-সন্নিবেশের দ্বারা ভূষিত হইবে, এইরূপ চামর রাজাদিগের হিতকর হয়।[৪]

চামরদণ্ডের বর্ণ কাহার কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধেও ঋষিযুগে একটা নিয়ম হইয়াছিল। গর্গঋষি উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যষ্টি ছত্র অঙ্কুশ প্রভৃতির দণ্ডের বর্ণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পক্ষে যথাক্রমে পীত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে।[৫]

বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের যষ্টি, ছত্র, অঙ্কুশ, বেত্র (বেতের ছড়ি), ধনু, বিতান, কুন্ত (বল্লম), ধ্বজ, ও চামর ইহাদের দণ্ড যথাক্রমে পীতবর্ণ, পীতলোহিতবর্ণ, মধুর মত ঈষৎ পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে।[৬] বরাহমিহিরের উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে, চামরের দণ্ড-সম্বন্ধ-পর্ব (গ্রন্থি) সংখ্যানুসারে শুভাশুভ বিবেচনা হইত; তন্মধ্যে দুই হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত যুগ্ম গ্রন্থির অশুভ ফল কথিত হইয়াছে। যথা, দুইপর্বে মাতৃবিনাশ, চারিপর্বে ভূমিক্ষয়, ছয়পর্বে ধনক্ষয়, অষ্টপর্বে কুলক্ষয়, দশপর্বে রোগজনন, এবং দ্বাদশপর্বে মরণ। বলা বাহুল্য যে, এই নিয়ম কেবল চামরদণ্ডের পক্ষে নহে, যষ্টি প্রভৃতির পক্ষেও উহা বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে তিন হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত অযুগ্ম সংখ্যার শুভফল বিবচিত হইয়াছে। যথা— তিনপর্বে যাত্রায় জয়লাভ, পঞ্চপর্বে শত্রুবিনাশ, সপ্তপর্বে বহু লাভ, নবপর্বে ভূমিলাভ, একাদশপর্বে চতুষ্পদের বৃদ্ধি, এবং ত্রয়োদশপর্বে অভীষ্টলাভ হয়। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংখ্যা অধিক সমবিষম সংখ্যায় সাধারণতঃ অশুভ ও শুভফল বিবেচনীয়।[৭]

---

৪ অধ্যর্ধ-হস্তপ্রতিতোঽস্য দণ্ডো হস্তোঽথবাঽরত্নিসমোঽথবান্যঃ।
কাষ্ঠাচ্ছুভাৎ কাঞ্চন-রূপ্য-গুপ্তাদ্রত্নৈশ্চ সর্বৈশ্চ হিতায় রাজ্ঞাম্।

৫ বিপ্রাণাং পীতবর্ণঃস্যাৎ ক্ষত্রিয়াণাস্ত লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতবর্ণশ্চ শূদ্রাণামসিতপ্রভঃ ॥
দণ্ডঃ শুভপ্রদো জ্ঞেয়ো যষ্টিধ্বজাঙ্কুশাদিষু ॥ (ভট্টোৎপল ধৃত)

৬ যষ্ট্যাতপত্রাঙ্কুশ-বেত্র-চাপ-বিতান-কুন্ত-ধ্বজচামরাণাম্।
ব্যাপীততন্ত্রীমধু-কৃষ্ণবর্ণা বর্ণক্রমেণৈব হিতায় তেষাম্ ॥

৭ মাতৃ-ভূধন-কুলক্ষয়বেহা রোগমৃত্যুজননাশ্চ পর্বভিঃ।
দ্ব্যাদিভির্দ্বিক-বিবর্ধিতৈঃ ক্রমাদ্ দ্বাদশান্তবিরতৈঃ সমৈঃ ক্রমাৎ ॥
যাত্রাপ্রসিদ্ধির্দ্বিষতাং বিনাশো লাভাঃ প্রভূতা বসুধাগমশ্চ।
বৃদ্ধিঃ পশূনামভিবাঞ্ছিতাপ্তি স্ত্র্যাদ্যেষ্বযুগ্মেষু তদীশ্বরাণাম্ ॥ (৭১।৫।৬)

বিষ্ণুধর্মোত্তরে চামরের দণ্ডসম্বন্ধে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থের মতে, চামরের দণ্ড স্বর্ণনির্মিত, রৌপ্যনির্মিত, প্রবালনির্মিত, অথবা বৈদূর্যমণি-নির্মিত হইবে, কিন্তু বৈদূর্য প্রবাল-নির্মিত চামরদণ্ড ও স্বুবর্ণ শোভিত হওয়া আবশ্যক। ক্ষীরবৃক্ষ-কাষ্ঠের দ্বারাও চামরদণ্ড হইতে পারে, কিন্তু উহাকে স্বুবর্ণের দ্বারা অথবা রূপার দ্বারা আবৃত করিতে হয়। কাঞ্চন-নির্মিত দণ্ড উৎকৃষ্ট রত্নের দ্বারা চিত্রিত হইলে উহা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। চন্দনকাষ্ঠ গজদন্ত, এবং (মহিষ প্রভৃতি পশুর) শৃঙ্গে দ্বারাও উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে। ইহার পরিমাণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, চামরদণ্ড অর্ধহস্তের ন্যূন হইবে না, এবং দেড় হস্তের অধিক হইবে না। পুষ্কর পরশুরামকে ইহা বলিয়াছেন যে, রাজা কখনও রঞ্জিত (রঙ করা) চামর ব্যবহার করিবে না। কিন্তু রাজার পুরোহিত, অমাত্য, দৈবজ্ঞ মহিষী, যুবরাজ ও সৈন্য ইহাদের পক্ষে ঈষৎ পীতবর্ণ চামর এবং অন্যান্যের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ চামর প্রশস্ত।[৮]

সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে চামর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাদিগের পার্শ্বে চামর আন্দোলিত হইত, এই বর্ণনা অনেক স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। শিশুপালবধকাব্যপাঠে জানা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে, তদীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থিত ভগবান কৃষ্ণের পার্শ্বে ভীমসেনকর্তৃক সাগরফেনপুঞ্জ-সদৃশ চামর সঞ্চালিত হইয়াছিল।[৯] এই বর্ণনা হইতে ইহাও উপলব্ধ হয় যে, সেকালে চামরান্দোলন, বিশিষ্ট ব্যক্তির অভ্যর্থনার একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

এক এক জন ভূপতির পরিচর্যার জন্য অনেকগুলি চামরগ্রাহিণী নিযুক্ত হইত।

কাদম্বরী পাঠে জানা যায়, রাজা শূদ্রক সভা ভঙ্গ করিয়া স্নানার্থ অভ্যন্তরে

৮ দণ্ডশ্চ চামরে কার্যো রুক্ম-রৌপ্যময়স্তথা।
প্রবালবৈদূর্যময়স্তথৈব কনকান্বিতঃ ॥ ২
ক্ষীরবৃক্ষস্য বা কার্যো রুক্মরূপনিবন্ধনঃ।
রত্নৈঃ প্রশস্তৈশ্চিত্রো বা কাঞ্চনস্ত প্রশস্যতে ॥ ৩
চন্দনস্যাথ দন্তস্য শার্ঙ্গঃ কার্যো যথা ভবেৎ।
অর্ধ হস্তান্নচাপ্যূনস্ত্বধ্যর্ধান্ন তথাধিকঃ ॥ ৪
কর্তব্যং চামরং রাজ্ঞা ন চ ভার্গব রঞ্জিতম্। ৫
আপীতবর্ণন্তু ভবেৎসরামাত্য পুরোহিতানাম্।
নরেন্দ্র-পত্নী-যুবরাজ-সৈন্যস্যান্যস্য শেষস্য জনস্য কৃষ্ণম্ ॥ (৬।২।১২)

৯ পৃথুফেনকূটমিব নিম্নগাপতে-
মরুতশ্চ স্ফুরধুবৎ প্রকীর্ণকম্।

প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, বহুসংখ্যক চামরগ্রাহিণী স্কন্ধদেশে চামর নিহিত করিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিতেছিল।

মেঘদূত কাব্যে বারবিলাসিনীকর্তৃক রত্নখচিত দণ্ডযুক্ত চামর গ্রহণ পূর্বক লাস্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। (পূর্বমেঘ, ৩৬ শ্লোক)। বর্তমান সময়েও ঢপওয়ালীদিগকে চামর হস্তে গান করিতে দেখা যায়। দেবমূর্তির পার্শ্বে চামর আন্দোলন পদ্ধতি অদ্যাপি অনেক স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং চামর রাজোপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, প্রয়োজনান্তরের সহিত উহার সম্পর্ক রহিয়াছে। এমনকি, চামরবিশেষের বায়ুস্পর্শে অনেক প্রকার রোগের উপশম হয়, শাস্ত্রে এরূপ উপদেশও পাওয়া যায়। যুক্তিকল্পতরুতেই বলা হইয়াছে, 'অস্যবাতেন নশ্যেত্তু তৃষ্ণামূর্ছা মদোভ্রমঃ'; ইহার অর্থ— দধিসমুদ্রজাত এই চামরের বায়ুদ্বারা তৃষ্ণা, মূর্ছা, মদরোগ ও ভ্রমরোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপ অন্যান্য চামরেরও গুণবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পরীক্ষালব্ধ গুণ-বিশেষের অনুরোধেই প্রথমতঃ চামর ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। ইহার পরীক্ষা ব্যাপারেও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলজ চামর সুখদাহ্য অর্থাৎ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অনায়াসেই পুড়িয়া যায়, এবং দহন-সময়ে ইহার মিষ্ মিষ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জলজ চামর শীঘ্র দগ্ধ হয় না, এবং উহা হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া থাকে। মস্তুরের জল প্রভৃতির দ্বারা বালুকাতে চামরের সংস্কার করিতে হয়। যদি চামরের দণ্ড কৃত্রিম বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে অষ্টসলিলকাথের দ্বারা তাহার সেই কৃত্রিমত্ব বিনষ্ট করার উপদেশ আছে। জাঙ্গলদেশে জাত রাজা যদি জলজ চামর ব্যবহার করেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার কুল, বীর্য, লক্ষ্মী এবং আয়ু বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে অনূপদেশজাত রাজা যদি স্থলজ চামর ব্যবহার করেন, তবে তাঁহার আয়ুঃ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। সুতরাং পরীক্ষা করিয়া চামর ব্যবহার কর্তব্য।[১০]

—

১০ স্থলজং সুখদাহ্যংহি দাহে মিষমিষায়তে।
জলজং বহ্নিদুর্দাহ্যং মহান্তং ধূমমুদগিরেৎ ॥
জলজং চামরং রাজা যোধত্তে জাঙ্গলেশ্বরঃ।
তস্যাচিরাৎ কুলং বীর্যং লক্ষ্মীরায়ুশ্চ নশ্যতি ॥
অনূপাধীশ্বরো রাজা যো বহেৎ স্থলজন্তথা।
তস্যৈতানি বিনশ্যন্তি লক্ষ্মীরায়ুর্যশোবলম্ ॥

ভৃঙ্গার

ভোজ-রাজ-পরিগণিত নববিধ উপকরণের মধ্যে, ভৃঙ্গার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও, রাজার অভিষেককার্যে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। ভোজ-রাজ উহাকে নৃপতিদিগের অভিষেকপাত্র নামেই অভিহিত করিয়াছেন—

'রাজ্ঞোঽভিষেকপাত্রং যদ্ ভৃঙ্গার ইতিতন্মতম্'

সূর্যাদিগ্রহের দশাজাত নৃপতিদিগের ব্যবহার্য ভৃঙ্গারের আকার ও পরিমাণ এই উভয়ের বিভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপাদানের প্রভেদানুসারে উহা আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা, সৌবর্ণ (স্বর্ণময়), রাজত (রূপময়), ভৌম (মৃত্তিকাময়), তাম্রময়, স্ফাটিক (স্ফটিক নির্মিত), চান্দন (চন্দন কাষ্ঠ-নির্মিত), লোহাময় এবং শার্ঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গ নির্মিত।[১১] বলা বাহুল্য যে, হরিণ মহিষ প্রভৃতি পশুর শৃঙ্গ অন্যান্য ধাতুর ন্যায় গালাইয়া তদ্দ্বারা ভৃঙ্গার প্রস্তুত করা হইত; সুতরাং এই সকল বিধানদৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অস্থি শৃঙ্গ প্রভৃতি জান্তব পদার্থের দ্রবীকরণ প্রক্রিয়া অতি প্রাচীনকালেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কারণ ভোজদেব বরাহ মিহির প্রভৃতি মধ্যযুগের লোক হইলেও, তাঁহাদের উপজীব্য পুরাণ এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি গ্রন্থ, এইসকল গ্রন্থের উপজীব্য আবার বেদ এবং তন্ত্র; সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রের ভিত্তিও সুপ্রাচীন বেদতন্ত্রেই নিহিত।

অষ্টপ্রকার ভৃঙ্গারের মধ্যে কেবল মৃন্ময় ভৃঙ্গারে কোন মণির সন্নিবেশ হইতে পারে না; তদ্ব্যতীত আর সাত প্রকার ভৃঙ্গারে পদ্মরাগমণি, হীরক, বৈদূর্য, মৌক্তিক, নীলমণি, মরকতমণি ও মুক্তা ইহাদের বিন্যাসের উপদেশ আছে।[১২] ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্বিধ নৃপতির ভৃঙ্গারের কোণে যথাক্রমে শঙ্খ, পদ্ম, চন্দ্র ও

---

১১ সৌবর্ণং রাজতং ভৌমং তাম্রং স্ফটিকমেবচ।
চান্দনং লোহজং শার্ঙ্গ মেতদষ্টবিধং মতম্॥

১২ পদ্মরাগ স্তথাবজ্রং বৈদূর্যং মৌক্তিকস্তথা।
নীলং মরকতঞ্চৈব মুক্তাশ্চ সপ্তকীর্তিতাঃ॥
ভৃঙ্গারসপ্তকেষ্বন্যা ন ভৌমো মণিমর্হতি।

কহ্লার, ইহাদের চিহ্ন সন্নিবেশিত করা কর্তব্য।[১৩] স্বর্ণময় এবং মৃন্ময় ভৃঙ্গার সকলেরই ব্যবহার্য। অর্থাৎ সমস্ত গ্রহের দশাজাত নৃপতিই এই দুই প্রকার ভৃঙ্গার ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু রাজাব্যতীত অন্যের স্বর্ণভৃঙ্গার ব্যবহারে অধিকার নাই। সাধারণে মৃন্ময় ভৃঙ্গার ব্যবহার করিবে।[১৪]

ভৃঙ্গার রাজাভিষেকের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, অন্যান্য কাজের সহিত উহার সম্পর্কের অভাব নাই। দুর্গাপূজার মহাস্নানে ভৃঙ্গারের ব্যবহার আছে। বর্তমানকালে অভিধান প্রভৃতিতে ভৃঙ্গার গাড়ু বা ঝারি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈধকার্যেও গাড়ুর দ্বারাই ভৃঙ্গারের প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইদানীন্তন গাড়ু পুরাতন ভৃঙ্গারের সম্পূর্ণ অনুরূপ কিনা, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায় না। পুরাতন যুগের অনেক জিনিসেই নামসাম্যেও আকৃতির সামঞ্জস্য প্রতিভাত হয় না। 'থালে ভাত ভৃঙ্গারে জল' এই কথাটা বাঙ্গালার অনেক উপকথায় এবং ব্রতকথায় প্রচলিত আছে।

—

চষক

রাজাদিগের মদ্যপানের পাত্র চষক নামে অভিহিত হইয়াছে[১৫]। যুক্তিকল্পতরুকার বলিয়াছেন যে, ভূপতিদিগের যে পানপাত্র, তাহার নাম চষক, যদিও তিনি সাধারণতঃ পানপাত্র শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তথাপি মদ্যপানপাত্রই তাঁহার অভিপ্রেত। কারণ, অভিধানে মদ্যপানপাত্র অর্থেই চষক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাহিত্যেও মদ্যপানপাত্র অর্থেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। শিশুপালবধ-কাব্যে চষকের দ্বারা রমণীগণকর্তৃক মদ্যপানের পরিচয় পাওয়া যায়[১৬]। সুতরাং মদ্যপানের পাত্রের নামই চষক, রাজাদিগের এই পাত্রের বিশেষ নিয়ম বিধানের

---

১৩ শঙ্খপদ্মেন্দু-কহ্লারং প্রত্যস্রং বিন্যসেৎ ক্রমাৎ।
চতুর্বিধানাং ভূপানাং চান্দ্রঃ সর্বত্রশস্যতে॥

১৪ কানকন্তু ক্ষিতীশানাং মৃন্ময়ং সার্বযৌগিকম্।

১৫ যৎপানপাত্রং ভূপানাং তজ্‌জ্ঞেয়ং চষকং বুধৈঃ।

১৬ অধিরজনি বধূভিঃ পীত-মৈরেয়-রিক্তং
কনক চষকমেতদ্রোচনা-লোহিতেন।
উদয় মহিম-রোচি-জ্যোতিষাক্রান্তমন্ত-
র্ধুন ইব তথৈবাক্রান্ত মদ্যাপি ভাতি॥ ১১।৫১

জন্যই ভোজদেব উহাকে রাজোপকরণ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। স্বর্ণ, রৌপ্য স্ফটিক ও কাচ, এই চারিপ্রকার উপাদানের দ্বারা চষক নির্মাণ করিতে হয়। চতুর্বিধ-নৃপতিদিগের চষকের আকার যথাক্রমে বৃত্ত, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ ও দশকোণ কর্তব্য[১৭]। ইহার পরিমাণ স্ব স্ব মুষ্টিদ্বারা গ্রহণীয়, ইহাতে চারি বর্ণ-যুক্ত রত্ন-বিন্যাস করিতে হয়। মৃত্তিকানির্মিত অথবা ফল (নারিকেলের মালৈ প্রভৃতি) নির্মিত চষক সকলেই ব্যবহার করিতে পারে[১৮]।

জাঙ্গল প্রভৃতি দেশের ভূপতিদিগের জন্য কাষ্ঠজ, ধাতুজ এবং প্রস্তরজ চষক নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতেও চতুর্বর্ণসমন্বিত রত্ন-বিন্যাস করিতে হয়, এবং পরিমাণও মুষ্টির দ্বারাই গ্রহণ করিতে হয়[১৯]। উপসংহারে ভোজদেব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজাদিগের অন্যান্য জলপাত্র প্রভৃতি যাহা ব্যবহার্য, তাহারও উপাদান প্রভৃতির এবং আকার প্রভৃতির নিয়ম চষকের নিয়মানুসারে নির্ধারিত করিতে হইবে[২০]। ভোজদেবের নির্দেশানুসারে মুষ্টিমেয় চষকের দৈর্ঘ্য কতটুকু হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের অনেক স্থলেই সাধারণতঃ অষ্টাঙ্গুলের ন্যূন পাত্র হীন পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[২১] সুতরাং অনুক্ত স্থলে ও উক্ত পরিভাষানুসারে অন্যূন অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

—

প্র সা ধ নী

নববিধ-রাজোপকরণের মধ্যে প্রসাধনী অন্যতম। উহা এখন চিরুনি এবং স্থানে স্থানে কাঁকুই নামে পরিচিত। অভিধানে ইহার কঙ্কতিকা নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁকুই নামের সহিত সংস্কৃত কঙ্কতিকা শব্দের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যও

১৭ কানকং রাজতঞ্চৈব স্ফাটিকং কাচমেবচ।
বৃত্তং ষড়ষ্টদিকোণং পৃথিবীভুজাম্॥

১৮ স্বমুষ্টি-সম্মিতং রত্নং চতুর্বর্নৈঃ সমন্বিতম্॥
মাতিকংবাথফালং বা সর্বেষামুপযুজ্যতে

১৯ কাষ্ঠজং ধাতুজং শৈলঃ জাঙ্গালাদিমহীভূজাম্।
স্বমুষ্টিসম্মিতং রত্নং চতুর্বর্ণৈঃ সমন্বিতম্।

২০ যদন্যত্তোয়-পানাদি-পাত্রং পৃথ্বীভূজাং ভবেৎ।
এবং তত্রাপি নিয়ম ইতি ভোজস্য নিশ্চয়ঃ॥

২১ হীন-পাত্রন্তু তজ্‌জ্ঞেয়ং ন্যূনমষ্টাঙ্গুলাত্তুবৎ॥

প্রতীয়মান হয়। প্রসাধনী নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থানুসারে উহার বিলাসোপকরণতা বুঝিতে পারা যায়। প্রসাধন বা সাজা-গোজা যাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা প্রসাধনী। প্র-পূর্ব সাধ্ ধাতুর পর করণবাচ্যে ল্যুটপ্রত্যয় যোগে 'প্রসাধনী' এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। উহা সাধারণের ব্যবহার্য হইলেও, নৃপতিদিগের ব্যবহার্য এই ক্ষুদ্র জিনিসটিরও বিশেষ নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল। যুক্তিকল্পতরুকার বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ নৃপতিদিগের জন্য যথাক্রমে দশ, নয়, আট ও সাত অঙ্গুল পরিমিত প্রসাধনী নির্ধারিত হইয়াছে। আবার জাঙ্গলাদি ত্রিবিধ দেশজাত রাজাদিগের জন্য কাষ্ঠজ, ধাতুজ ও শৃঙ্গজ প্রসাধনীর বিধান আছে। কিন্তু কাষ্ঠজাত প্রসাধনীর নির্মাণেও, ছত্রদণ্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। সূর্যপ্রভৃতি গ্রহের দশাজাত রাজাদিগের জন্য যথাক্রমে স্বর্ণ, রূপা, তাম্র, পিত্তল, সীস, লৌহ এবং মিলিত সমস্ত ধাতু, ইহাদের দ্বারা প্রসাধনী প্রস্তুত করিতে হয়। মৃগশৃঙ্গ মহিষশৃঙ্গ নির্মিত প্রসাধনী 'কালকীর্তি' নামে অভিহিত। এই প্রসাধনী এবং গজদন্ত নির্মিত প্রসাধনী কেবল রাজাদিগেরই ব্যবহার্য। প্রসাধনীতেও চামরদণ্ডের রীতি অনুসারে রত্নবিন্যাস করিতে হয়।[২২]

দেবতার পূজোপকরণরূপেও কঙ্কতিকার ব্যবহার হইয়া থাকে। এই পদার্থ কি উপাদানে কিরূপ পরিমাণে নির্মিত হইবে, বীরমিত্রোদয় গ্রন্থে তাহার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার বৈখানস গ্রন্থের যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইতে জানা যায় যে— স্বর্ণ অথবা রূপার দ্বারা কঙ্কত নির্মাণ করিতে হইবে। উহার আয়তন অষ্টাঙ্গুল অথবা ষড়ঙ্গুল হইবে, বিস্তার দৈর্ঘ্যের

২২ প্রসাধনী দিঙ্ নব-নাগ সপ্ত সংখ্যাভিরুক্তাঙ্গুলিভিঃ ক্রমেণ।
চতুর্বিধানাং পৃথিবীপতীনাং সম্পত্তিসৌভাগ্যযশঃ সমৃদ্ধিদা॥
কাষ্ঠজা ধাতুজা চৈব শৃঙ্গজাতা যথাক্রমং।
জাঙ্গলানূপসামান্যদেশজানাং মহীভুজাম্॥
ছত্রদণ্ডবদুন্নেয়ঃ কাষ্ঠজায়া বিনিশ্চয়ঃ।
কনকং রজতং তাম্রং পিত্তলং সীসকন্তথা।
লৌহং সর্বঞ্চ সর্বার্থমাদিত্যাদি দশাশুবাম্॥
রাজ্ঞামেবোপযুজ্যেত কালকীর্তিঃ প্রসাধনী।
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ শৃঙ্গজাতা প্রসাধনী॥
গজদন্ত সমুদ্‌ভূতা রাজ্ঞামেবোপযুজ্যতে।
তত্রাপি রত্নবিন্যাসো জ্ঞেয়শ্চামরদণ্ডবৎ॥

অর্ধেক পরিমিত হইবে, উহার মুখ দুই দিকেই থাকিবে, মুখে কুড়িটি দ্বাদশটি অথবা আটটি দন্ত অর্থাৎ কাঁটা থাকিবে।[২৩]

—

বিতান

বিতানের বিবরণ বস্ত্র প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং উপকরণ প্রকরণে উহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

—

শয্যা

উপকরণবর্গে পরিগণিত পদার্থের মধ্যে শয্যার বিবরণ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। শয্যার আধার খট্বা সম্বন্ধে প্রভূত নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, ভোজরাজ খট্বাকে উপকরণ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত না করিয়া উহাকে আসন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে উহা শয্যার আধাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বরাহমিহির শয্যাসনপ্রকরণে শয্যার যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও খট্বাতে সমঞ্জস হয়; অতএব আমরাও শয্যা পরিচয়ে খট্বার বিবরণ সন্নিবেশিত করিলাম।

ভোজরাজের মতে খট্বাতে মোট আটখণ্ড কাষ্ঠ উপাদানরূপে গৃহীত হইবে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া খট্বা অবস্থিত হয়, তাহার নাম চরণ। বর্তমান সময়ে উহা পায়া নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর মস্তক রাখা হয়, তাহার নাম বুপধান, অধঃস্থ কাষ্ঠ অর্থাৎ যাহাতে পা রাখা হয়, তাহার নাম নিরূপক, এবং উভয় পার্শ্বের কাষ্ঠের নাম আলিঙ্গন। ইদানীন্তন খাটে যাহা পাশী নামে কথিত হয়, তাহাই অতীত যুগে আলিঙ্গন নামে অভিহিত হইত। কাষ্ঠের পরিমাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে— এক এক আলিঙ্গন চারিহস্ত, বুপধান

২৩ কঙ্কতং কনকং রূপ্যমপি বাষ্টাঙ্গুলায়তম্।
ষড়ঙ্গুলায়তং যদ্বা তদর্ধাঙ্গুল বিস্তৃতম্॥
বিংশত্যা দশনৈর্যুক্তং ভবেদুভয়তোমুখম্।
যদ্বা ষোড়শভির্দন্তৈরষ্টাভির্বাথমঙ্গলম্॥

এবং নিরূপক আলিঙ্গনের অর্ধপরিমিত অর্থাৎ দুহাত, এবং চরণের পরিমাণ বুপধান নিরূপকের অর্ধেক, সুতরাং একহাত। উক্ত পরিমাণানুসারে নির্মিত খট্বা সর্বষোড়শিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। নামের নিরুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সমষ্টিতে ষোলহাত পরিমিত কাষ্ঠ গৃহীত হওয়ায়, উহার 'সর্বষোড়শিকা' নাম হইয়াছে।[২৪]

সর্বষোড়শিকার অনুপাতে আলিঙ্গন প্রভৃতি অংশের বৃদ্ধির দ্বারা সর্বাষ্টাদশিকা, সর্ববিংশতিকা, সর্বদ্বাবিংশিকা, সর্বচতুর্বিংশিকা, সর্বষড়্বিংশিকা, সর্বাষ্টাবিংশিকা ও সর্বত্রিংশত্তিকা এই আট প্রকার খট্বা প্রস্তুত করিতে হয়। সাধারণতঃ খট্বার এই আট প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। আদিত্যাদি গ্রহের দশাজাত-নৃপতিদিগের জন্য এই আট প্রকার খট্বা নির্ধারিত হইয়াছে। এই সমস্ত খট্বাতে শিল্পিগণ নানা প্রকার আকৃতির কল্পনা করিবে।[২৫]

সর্বষোড়শিকা খট্বা সকলেরই উপযুক্ত। অতঃপর ভোজরাজ বলিয়াছেন যে, খট্বার উপাদান আটখণ্ড কাষ্ঠ যদি চতুর্হস্তযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক কাষ্ঠের পরিমাণ যদি চারিহাত হয়, তবে সেই মাপে নির্মিত রাজভোগ্য খট্বা শ্রীসর্বমঙ্গলা নামে অভিহিত হয়।[২৬] প্রত্যেক অংশের পরিমাণ চারিহাত হইলে চরণের পরিমাণও তাহাই হইবে, এবং জিনিসটি চতুষ্কোণ হইবে। চরণের পরিমাণ চারিহাত হইলে উহার কতকাংশ উপরের দিকে থাকা সঙ্গত, নতুবা অত্যন্ত উচ্চতা নিবন্ধন অসমঞ্জস ও দুরারোহ হইয়া পড়ে। পরবর্তী গ্রন্থের অভিপ্রায় হইতেও এমতই প্রতিভাত হয়। কারণ ইহার পরেই বলা হইয়াছে যে, এই সর্বমঙ্গলা খট্বা যদি সচ্ছদন অর্থাৎ ছাতযুক্ত (উপরে চালিযুক্ত) হয়, তবে উহা

২৪ অষ্টাভিঃ কাষ্ঠ-খণ্ডৈশ্চ খট্বেতি প্রতিচক্ষ্যতে।
তিষ্ঠেদ্যদালম্ব্য খট্বা তজ্জ্ঞেয়ং চরণাহ্বয়ম্॥
শিরঃস্থং বুপধানংস্যা দধঃস্থং স্যান্নিরূপকম্।
আলিঙ্গনে উভেপার্শ্বে প্রাহ ভোজমহীপতি॥
আলিঙ্গনেচতুর্হস্তে বুপধাননিরূপকে।
তদর্ধেন তদর্ধেন চত্বারশ্চরণা ইতি॥
সর্বষোড়শিকা খট্বা সর্বত্রাভয়দায়িকা। —যুক্তিকল্পতরু

২৫ এবমষ্টবিধাঃ খট্বাঃ সমাসেনেপদর্শিতাঃ।
আদিত্যাদিদশাজানাং নৃণাং সম্পত্তিদায়কাঃ॥
কার্যাঃ শিল্পিভিরেতাসু বিবিধাকৃতি-কল্পনাঃ।

২৬ সর্বষোড়শিকা খট্বা সর্বেষামেবযুজ্যতে।
অষ্টৌ খণ্ডানি যস্যাংস্যুশ্চর্হস্তযুতানিচ।
শ্রীসর্বমঙ্গলা নাম খট্বৈষা পৃথিবীপতেঃ॥

সর্বজয়া নামে অভিহিত হয়।[২৭] সুতরাং আধুনিক খাটে যেমন মশারি খাটানর জন্য পায়ার ছিদ্রের উপর খুঁটি বসাইয়া তাহার উপরে কাঠের চালি দেওয়া হয়, সেকালের খাটের উপরেও মশারির মত আবরণ দেওয়া হইত। অধিকন্তু আধুনিক খাটে চালির খুঁটি স্বতন্ত্র কাঠের দ্বারা নির্মিত, সেকালের খুঁটি পায়ারই অংশ। উক্ত সর্বজয়া খট্বার পরিমাণ একহস্ত বৃদ্ধি করিলে, তাহার নাম যাত্রা-সিদ্ধি, দুই হাত বৃদ্ধি করিলে সর্বসিদ্ধি, তিন হাত বৃদ্ধি করিলে বিজয়া এবং চারি হাত বৃদ্ধি করিলে অষ্টমঙ্গলা। অতঃপর একহাত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, সেই খট্বাই মঞ্চ নামে অভিহিত হয়। মঞ্চের এক এক হাত পরিমাণ বাড়াইলে যথাক্রমে তাহার 'জয়' 'মঙ্গল' 'প্রেয়ান্' এবং 'চিত্রকান্ত' এই চারিটি সংজ্ঞা হয়। মঞ্চের আবার এক এক হাত পরিমাণ বাড়াইলে, 'তুঙ্গা' 'অতিতুঙ্গা' 'শিখরী' ও বিষয়েক্ষণা, যথাক্রমে এই চারি নামে অভিহিত 'টঙ্ক' সংজ্ঞক খট্বা হইয়া থাকে।[২৮] প্রাসাদসংজ্ঞক আর একপ্রকার খট্বার পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তিকল্পতরুকার এই খট্বাকে 'দূরদর্শী' 'দীর্ঘদর্শী' 'দুর্লঙ্ঘ্য' ও 'দুরাসদ' এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। টঙ্ক অপেক্ষা দূরদর্শীর পরিমাণ দশগুণ অধিক, দীর্ঘদর্শীর পরিমাণ দূরদর্শী হইতে দশগুণ অধিক, দুর্লঙ্ঘ্যের পরিমাণ দীর্ঘদর্শী হইতে দশগুণ অধিক, এবং দুরাসদের পরিমাণ দুর্লঙ্ঘ্য হইতে দশগুণ অধিক। কিন্তু ইহাদের পরিণাহ অর্থাৎ ওসার এক চতুর্থাংশ করিয়া বাড়াইতে হইবে। এই চারি প্রকার প্রাসাদখট্বা সকল রাজাদিগেরই সুখকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[২৯]

যুক্তিকল্পতরুকার 'ভোজমতেতু' বলিয়া ভোজদেবের নিজ মতানুসারে, আর

---

২৭ ইয়ং যদা সচ্ছদনা তদা সর্বজয়াভিধা।
যাত্রাসিদ্ধিঃ সর্বসিদ্ধির্বিজয়া চাষ্টমঙ্গলা ॥
একৈক হস্তবৃদ্ধ্যাতু ভবেন্মঞ্চমতঃপরম্।
মঞ্চখট্বা

২৮ জয়োহথ মঙ্গলঃ প্রেয়ান্ চিত্রকান্তঃ পরো মহান্।
একৈকহস্তবৃদ্ধ্যাতু মঞ্চানামিতি লক্ষণম্ ॥
টঙ্কখট্বা ও প্রাসাদ খট্বা
সা তুঙ্গা হ্যতিতুঙ্গা চ শিখরী বিষয়েক্ষণা।
একৈকহস্তবৃদ্ধ্যাতু টঙ্ক ইত্যভিধীয়তে ॥

২৯ দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী দুর্লঙ্ঘ্যোহথ দুরাসদঃ।
যথোত্তরং দশগুণাঃ পাদৈকপরিণাহিণঃ।
প্রাসাদসংজ্ঞকাঃ কার্যা রাজ্ঞা সুখমভীপ্সতা।
চত্বার এতে সর্বেষাং ভূপতীনাং সুখাবহাঃ ॥

আট প্রকার খট্বার বিবরণ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, উভয়-ষোড়শী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্রিংশতিকা পর্যন্ত যে আট প্রকার খট্বার কথা বলা হইয়াছে, উহাদের পরিমাণ যদি উত্তরোত্তর দুই হাত করিয়া বৃদ্ধি করা হয়, তবে যথাক্রমে 'মঙ্গলা' 'বিজয়া' 'পুষ্টি' 'ক্ষমা' 'তুষ্টি' 'সুখাসন' 'প্রচণ্ডা' ও 'সর্বতোভদ্রা' এই আট প্রকার খট্বা হইয়া থাকে।[৩০] বর্ধিত অংশের বিভাগ পূর্বকথিত রীত্যনুসারে গৃহীত হইবে। যুক্তিকল্পতরুধৃত জ্যোতিঃপরাশরের মতে আট খণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা যে অঙ্গপিণ্ড অর্থাৎ অবয়বী নির্মিত হয়, তাহা সমান হইলে খট্বা নামে, এবং বিষম হইলে প্রণস্থা নামে অভিহিত হয়। সমপিণ্ডের ব্যবহারে সমস্ত অর্থসম্পত্তি লাভ হয় এবং বিষমের ব্যবহারে বিপদ্ ঘটিয়া থাকে, অতএব পণ্ডিতগণ খট্বাঙ্গপিণ্ডকে সমান করিয়াই প্রস্তুত করিবেন। গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন যে, এই নিয়ম সামান্য অর্থাৎ সকলের পক্ষেই গ্রাহ্য এবং সর্বসম্মত।[৩১]

বরাহমিহিরের মতে তুষররহিত অষ্টযবোদরে এক কর্মাঙ্গুল, অর্থাৎ পরিমাণে ব্যবহার্য একাঙ্গুল বিবেচিত হয়। উক্ত একশত অঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ মহতী শয্যা রাজাদিগের জয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়। রাজপুত্রের শয্যা নব্বই অঙ্গুল দীর্ঘ, মন্ত্রীর শয্যা চৌরাশী অঙ্গুল দীর্ঘ, সেনাপতির শয্যা আটাত্তর অঙ্গুল, এবং পুরোহিত ও দৈবজ্ঞের শয্যা বাহাত্তর অঙ্গুল দীর্ঘ কর্তব্য।[৩২] বলা বাহুল্য যে, এই স্থলে শয্যা শব্দে খট্বাই অভিপ্রেত হইয়াছে। পরবর্তী গ্রন্থের দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

---

৩০ সর্বত্রিংশতিকাং যাবদারভ্যোভয়ষোড়শীম্।
খট্বানামিতি নামানি অষ্টৌ হস্তদ্বয়াধিকে ॥
তদ্যথা—
মঙ্গলা বিজয়া পুষ্টিঃ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখাসনম্।
প্রচণ্ডা সর্বতোভদ্রা খট্বানামষ্টকং বিদুঃ ॥
আসাং বিভাগঃ পূর্ববৎ।

৩১ অষ্টাভিঃ কাষ্ঠখণ্ডৈশ্চ যোহঙ্গপিণ্ডোহভিজায়তে।
সচেৎ সমো ভবেৎ খট্বা প্রণস্থা স্যাদতোহন্যথা ॥
সমে সর্বার্থ-সম্পত্তির্বিষমে বিপদাস্পদম্।
তস্মাৎ খট্বাঙ্গপিণ্ডো যঃ সমঃ কার্যঃ স সূরিভিঃ ॥
ইদন্তু সামান্যং সর্বসম্মতঞ্চ ॥

৩২ কর্মাঙ্গুলং যবাষ্টকমুদরাসক্তং তুষৈঃ পরিত্যক্তম্।
অঙ্গুলশতং নৃপাণাং মহতী শয্যা জয়ায় কৃতা ॥
নবভিঃ সৈব ষড়ূনা দ্বাদশহীনা ত্রিষট্কহীনাচ।
নৃপপুত্র-মন্ত্রি-বলপতি-পুরোধসাং স্যুর্যথাসংখ্যম্ ॥ বৃহৎসংহিতা, ৭৯

শয্যার বিস্তার সম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে দৈর্ঘ্যের অর্ধাংশকে অষ্টমাংশ হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিষ্কম্ভ অর্থাৎ বিস্তার হইবে, ইহা বিশ্বকর্মার অভিমত পরিমাণ ; সুতরাং শতাঙ্গুল দীর্ঘ রাজশয্যার বিস্তার তেতাল্লিশ অঙ্গুল ছয় যব হইবে। দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ পাদের উচ্চতা হইবে। যুবরাজ প্রভৃতির শয্যার বিস্তার ও পাদ এই অনুপাতে পরিমিত হইবে।[৩৩]

বরাহমিহিরের বচনে এবং টীকাকার প্রদর্শিত বিশ্বকর্মার বচনে পাদোচ্ছ্রায়ের অর্থাৎ পায়ার উচ্চতার যে পরিমাণ বলা হইয়াছে, তাহাতে 'সকুক্ষ্যশিরাঃ' এই একটি বিশেষণ দেখা যায়। ইহাতে কুক্ষ্য এবং শিরস্ এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকাকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'সহ কুক্ষ্যেণ শিরো বর্ততে ইতি সকুক্ষ্যশিরাঃ পাদোচ্ছ্রায় ইতি'। ইহার অর্থ—পাদের উচ্চতার যে পরিমাণ বলা হইল, উহাতে কুক্ষ্যের এবং শিরের পরিমাণও সন্নিবেশিত, এমত বুঝিতে হইবে। এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ হয়ত টীকাকারের সময় পর্যন্তও সাধারণের পরিচিত ছিল, সুতরাং উহার অর্থপ্রকটনের প্রয়াস হয় নাই। এখন ইহা একেবারেই অপরিচিত হইয়াছে। আধুনিক খাটের সংস্থান দৃষ্টে মনে হয়, পায়ার নিম্নভাগের নাম কুক্ষ্য এবং উপরিভাগে যাহা পাশী হইতে সমুন্নতরূপে দেখা যায়, তাহা শির নামে সেকালে পরিচিত ছিল।

বরাহমিহির খট্বার উপাদান কতকগুলি কাষ্ঠের গুণকীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ হইতে জানা যায় যে, যে পর্যঙ্ক কেবল শ্রীপর্ণী-কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত তাহা ধনপ্রদ, অসনকাষ্ঠকৃত রোগনাশক, তিন্দুকসারনির্মিত ধনপ্রদ, কেবল শিংশপাকাষ্ঠকৃত বহুবৃদ্ধিকর, চন্দনকাষ্ঠকৃত রিপুনাশক এবং ধর্ম-যশ-দীর্ঘায়ুঃপ্রদ, পদ্মকাষ্ঠকৃত দীর্ঘ-জীবন, সম্পদ্, বিদ্যা ও বিত্ত প্রদান করে। শালকাষ্ঠ রচিত এবং শাককাষ্ঠ রচিত পর্যঙ্ক কল্যাণ প্রদান করে। কেবল চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, স্বর্ণের দ্বারা গুপ্ত অর্থাৎ সোনার পাতের দ্বারা মোড়ন, এবং নানাপ্রকার মণির দ্বারা যুক্ত পর্যঙ্কে যে নরপতি অবস্থান করেন, তিনি দেবগণ কর্তৃকও পূজিত হইয়া থাকেন।[৩৪]

---

৩৩ অর্ধমতোঽষ্টাংশোণং বিষ্কম্ভো বিশ্বকর্মণা প্রোক্তঃ।
আয়ামত্র্যংশসমঃ পাদোচ্ছ্রায়ঃ সকুক্ষ্যশিরাঃ ॥ ৭৮।১০

৩৪ যঃ সর্ব শ্রীপর্ণ্যা পর্যঙ্কো নির্মিতঃ স ধন দাতা।
অসনকৃতো রোগহরস্তিন্দুকসারেণ বিত্তকরঃ ॥

তিন্দুকী এবং শিংশপা কাষ্ঠ অন্যের সহিত মিশ্রিত হইলে শুভফল প্রদান করে না। শ্রীপর্ণ কাষ্ঠের সহিত মিলিত দেবদারু ও অসন শুভপ্রদ নহে। শাল ও শাকবৃক্ষ পরস্পর মিশ্রিত এবং পৃথক ভাবেও শুভপ্রদ, এইরূপ হরিদ্র এবং কদম্ববৃক্ষও পরস্পর মিশ্রিত এবং অমিলিত অবস্থায় শুভপ্রদ। কেবল স্পন্দন নামক কাষ্ঠ-নির্মিত এবং অম্বকাষ্ঠ নির্মিত পর্যঙ্ক শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। অসন বৃক্ষ অন্য কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইলে শীঘ্রই অনেক প্রকার দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। অম্ব, স্পন্দন ও চন্দন এই তিন প্রকার কাষ্ঠ নির্মিত খট্বায় যদি স্পন্দন কাষ্ঠ নির্মিত পায়া সংযুক্ত হয়, তবে তাহা শুভকর হইয়া থাকে। যে সকল বৃক্ষের ফল হইয়া থাকে, সাধারণতঃ সেই সকল বৃক্ষ নির্মিত শয্যাসন শুভফল প্রদান করে।[৩৫]

যে সকল বৃক্ষ শয্যার শুভকর উপাদান রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা নির্মিত খট্বায় প্রশস্ত গজদন্তের দ্বারা অলংকার বিধান কর্তব্য।[৩৬] এই উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে, সেকালের খট্বায় গজদন্ত নির্মিত নানাপ্রকার লতা পাতা প্রভৃতি কারুকার্য নিহিত হইয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিত। অতঃপর বরাহমিহিরের গ্রন্থে গজদন্তের শুভাশুভ লক্ষণ খট্বাবয়বের সংযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, সেই অস্বরস অংশ অনাবশ্যক বোধে এই স্থলে উপেক্ষিত হইল। এক খট্বায় বিজাতীয় কাষ্ঠের সংযোগেও শুভাশুভ ফলের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—একবৃক্ষনির্মিত শয্যাসন ধন্য, দুই বৃক্ষ নির্মিত ধন্যতর,

---

যঃ কেবল শিংশপয়া বিনির্মিতো বহুবিধং স বৃদ্ধিকরঃ।
চন্দনময়ো রিপুঘ্নো ধর্মযশোদীর্ঘজীবিতকৃৎ ॥
যঃ পদ্মকপর্যঙ্কঃ স দীর্ঘমায়ুঃ শ্রিয়ং শ্রুতং বিত্তম্।
কুরুতে শালেন কৃতঃ কল্যাণং শাক-রচিতশ্চ ॥
কেবল-চন্দনরচিতং কাঞ্চনগুপ্তং বিচিত্ররত্নযুতম্।
অধ্যাসন্ পর্যঙ্কং বিবুধৈরপি পূজ্যতে নৃপতিঃ ॥ —বৃহৎসংহিতা, ৭৮

৩৫ অন্যেন সমাযুক্তা ন তিন্দুকী শিংশপা চ শুভফলদা।
ন শ্রীপর্ণেন চ দেবদারুবৃক্ষো ন চাপ্যসনঃ ॥
শুভদৌ ন শাল-শাকৌ পরস্পরং সংযুতৌ পৃথক্ চৈব।
তদ্বৎ পৃথক্ প্রশস্তৌ সহিতৌ চ হরিদ্র-কদম্বকৌ ॥
সর্বঃ স্পন্দনরচিতো ন শুভঃ প্রাণান্ হিনস্তি চাম্বকৃতঃ।
অসনোঽন্যদারুসহিতঃ ক্ষিপ্রং দোষান্ করোতি বহূন্ ॥
অম্ব-স্পন্দন-চন্দনবৃক্ষাণাং স্পন্দনাচ্ছুভাঃ পাদাঃ।
ফলতরুণা শয়নাসন মিষ্টফলং ভবতি সর্বেণ ॥

৩৬ গজদন্তঃ সর্বেষাং প্রোক্ততরূণাং প্রশস্যতে যোগে।
কার্যোঽলঙ্কার-বিধির্গজদন্তেন প্রশস্তেন।

তিনবৃক্ষনির্মিত পুত্রবৃদ্ধিকর, চারিবৃক্ষনির্মিত অর্থ ও উৎকৃষ্ট যশ এতদুভয়ের জনক। পঞ্চবৃক্ষনির্মিত শয্যায় যে শয়ন করে, সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। ছয় সাত বৃক্ষের দ্বারা নির্মিত খট্বার ব্যবহারে কুল বিনাশ হয়।[৩৭]

রামায়ণ পাঠে জানা যায়, মহাবীর হনুমান রাবণের বাড়িতে স্বর্ণময় শয়ন (খট্বা) এবং আসন দর্শন করিয়াছিলেন।[৩৮] শয্যার অঙ্গ খট্বার বিবরণ আমরা এখানেই উপসংহৃত করিলাম। শয্যার অন্যান্য বিষয়ের এখন আলোচনা করা যাউক।

নৃপতিদিগের উপভোগ্য শয্যারও নানাপ্রকার বর্ণবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। অমাত্য, রাজা ও সম্রাট— ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শয্যার ব্যবস্থা ছিল। (যুক্তিকল্পতরু দ্রষ্টব্য)।

শুক্লবর্ণ শয্যা সকলের পক্ষেই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রপাঠে জানা যায়— শয্যারচনা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম কলা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।[৩৯] কামসূত্রের টীকাকার যশোধরের ব্যাখ্যা হইতে ইহাও জানা যায় যে— ঋতুভেদে এবং অনুরক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ (যে অনুরক্তও নয়, বিরক্তও নয়) এই তিন প্রকার লোকের অভিপ্রায়ানুসারে এবং আহারের পরিণামবিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শয্যারচনার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মঋতুতে ব্যবহার্য শয্যা বর্ষাঋতুতে বা শীতঋতুতে সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, সুতরাং সমৃদ্ধ মানবের পক্ষে ঋতুভেদে সুখকর বিভিন্ন শয্যারচনার প্রণালী শিল্পীদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। রামায়ণ পাঠে ভরতের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সেকালে শয্যার উপর ঋতুভেদে সুখপ্রদ চর্ম বিস্তৃত হইত এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণ ব্যবহৃত হইত।[৪০]

অনুরক্ত-বিরক্তাদির উপযোগিনী শয্যার কিরূপ প্রভেদ ছিল, বর্তমান সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

---

৩৭ একদ্রমেণ ধন্যং বৃক্ষদ্বয়নির্মিতং চ ধন্যতরম্।
ত্রিভিরাত্মজ-বৃদ্ধিকরং চতুর্ভিরর্থং যশশ্চাগ্র্যম্॥
পঞ্চবনস্পতিরচিতে পঞ্চত্বং যাতি তত্র যঃ শেতে।
ষট্‌সপ্তাষ্টতরূণাং কাষ্ঠৈর্ঘটিতে কুলবিনাশঃ॥ ৭৯।৩৯

৩৮ জাম্বূনদমান্যেব শয়নান্যাসনানিচ।
ভাজনানিচ শুভ্রাণি দদর্শ হরিযূথপঃ॥ সুন্দরকাণ্ড ৬।৪১

৩৯ শয়নরচনম্।

৪০ অজিনোত্তর সংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে॥ অযোধ্যাকাণ্ড ৮৮।৪

কোমলতাই সাধারণতঃ শয্যার উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচনীয়। নৈষধচরিতে নলরাজার শয্যা শশাঙ্কের মত কোমল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৪১] কাদম্বরী কাব্যে শূদ্রক রাজার শয্যার বর্ণনা হইতে জানা যায়, সেকালে শয্যার আচ্ছাদন-বস্ত্র পুষ্পের সুগন্ধের দ্বারা সুরভিত হইত, বালিশগুলি পট্টবস্ত্রের দ্বারা নির্মিত হইত এবং শয্যার আধার পর্যঙ্কের পায়াগুলি মণিময় প্রতিপাদুকায় (খাটের পায়ার আধার) স্থাপিত হইত।[৪২] যুক্তিকল্পতরুতে মোটামুটি শয্যার পাঁচটি গুণ কথিত হইয়াছে। যথা— বিশীর্ণতা, কোমলতা, উচ্চতা, সমতা এবং স্বচ্ছতা। অত্রত্য বিশীর্ণতা শব্দে তোষক প্রভৃতির মধ্যবর্তী পদার্থের শিথিলতা অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে সমৃদ্ধ মানবদিগের বাসভবনে দুই প্রকার শয্যা রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। উক্ত দ্বিবিধ শয্যার মধ্যে একটি শয়নের জন্য, অপরটি স্ত্রী-সম্ভোগের জন্য ব্যবহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত শয্যা শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ অতি মনোরম হওয়া আবশ্যক। ইহার উভয় দিকে অর্থাৎ শিরোভাগে ও চরণের দিকে উপধান স্থাপিত, মধ্যভাগ বিনত অর্থাৎ বিশেষ মৃদু হওয়া আবশ্যক। উহার উত্তরচ্ছদ (চাদর) শুক্লবর্ণ হইবে।

সম্ভোগ-শয্যা প্রতিশয্যিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার আকার ক্ষুদ্র এবং উচ্চতা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবার ব্যবস্থা আছে। এই দ্বিবিধ শয্যার ব্যবস্থা কেবল সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যই কল্পিত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষে এক শয্যারই পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভোগ-শয্যা অপবিত্র, সুতরাং তাহাতে শুচি ব্যক্তির শয়ন কর্তব্য নহে; অতএব তাহার জন্য পৃথক শয্যার প্রয়োজন। শয্যার উপকরণ তোষক গদি প্রভৃতি তুলার জিনিস তূলিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে প্রসূন-তূলিকার উল্লেখ আছে। পুষ্পশয্যার বর্ণনা অন্যান্য স্থলেও দেখা যায়।

---

৪১ নিশাচ শয্যাচ শশাঙ্গকোমলা। ১।৪৯

৪২ কুসুমামোদবাসিত-প্রচ্ছদপটেন, পট্টোপাধানাধ্যাসিত শিরোভাগেন, মণিময় প্রতিপাদুকা প্রতিষ্ঠাপিত পাদেন,…শয়নেন।

ব্যজন

যুক্তিকল্পতরুতে 'ব্যজন' উপকরণশ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে রাজার অভিষেকসামগ্রীর মধ্যে উহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।[৪৩] যুক্তিকল্পতরুতে দর্পণের পরিমাণ এবং উপাদান সম্বন্ধে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুস্তকের অশুদ্ধতা নিবন্ধন এই স্থলের অর্থ নির্ণয় করা গেল না। মোটামুটি এই মাত্র বুঝা যায় যে— পক্ষ, বস্ত্রখণ্ড এবং শলাকা এই তিন প্রকার উপাদানের দ্বারা ত্রিবিধ রাজার জন্য ব্যজন প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। জাতিভেদানুসারে বিতানের ন্যায়, ব্যজনেরও বর্ণগত প্রভেদ ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল।

বীরমিত্রোদয়নিবন্ধে দেবপূজার উপচারস্বরূপ ব্যজনের উপাদান ও পরিমাণ কথিত হইয়াছে। তত্রত্য প্রমাণানুসারে ব্যজনের দণ্ড ছয়ত্রিশ অঙ্গুল অথবা ত্রিশ অঙ্গুল দীর্ঘ হইবে। উহার প্রস্থ তিন অঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। দণ্ডাগ্রভাগকে দ্বিধা করিয়া তাহাতে ময়ূরপিচ্ছের নাল অর্থাৎ গোড়ার ভাগ নিহিত করিয়া গোলাকার ব্যজন প্রস্তুত করিতে হয়। ব্যজনের পরিমাণ ষোল অঙ্গুল হওয়া আবশ্যক। উহার অগ্রে অর্থাৎ অধুনাতন ঝালরে ময়ূরপিচ্ছ নিহিত করিতে হয়; এবং সুতার দ্বারা দৃঢ়রূপে উহাকে বাঁধিতে হয়। এই প্রকার ব্যজন 'ময়ূর-ব্যজন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই রীতিতে বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারাও 'ব্যজন' নির্মিত হইয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে, দণ্ডেতে গোলাকার যে পদার্থকে বাঁধা হয়, উহা 'বৃন্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে।[৪৪]

—

৪৩ ভদ্রাসনঞ্চ ছত্রঞ্চ বাল-ব্যজনমেচব। ২।৪

৪৪ ষটত্রিংশতা ত্রিংশতা বা দৈর্ঘ্যং ত্র্যাঙ্গুলনাহকঃ।
দণ্ডো দণ্ডাগ্রভাগন্তু দ্বিধাকৃত্বাত্র যোজয়েৎ॥
ষোড়শাঙ্গুলকং বৃন্তং পিচ্ছনালসমূহকম্।
সুদৃঢ়ং তন্তুসম্বদ্ধং বৃন্তাগ্রে পুচ্ছভূষিতম্॥
মায়ূরং ব্যঞ্জনং প্রোক্তং বক্ষ্যে পটাদিসম্ভবম্।
সম্পাদ্য পূর্ববদ্দণ্ডং বৃন্তং বেণুবিবর্জিতম্॥
অষ্টাদশঙ্গুলং বাথ ষোড়শাঙ্গুল সম্মিতম্।
দেবাঙ্গ-পট্টকার্পাসবেষ্টিতং যোজয়েদ্ দৃঢ়ম্॥

দর্পণ

দর্পণ রাজাদিগের অষ্টম উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পূর্বকালে স্বর্ণ, রজত, রঙ্গ ও লৌহ, এই চারি প্রকার ধাতুর দ্বারা দর্পণ নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৫] কিন্তু সেকালে কাচ-দর্পণের উদ্ভাবন হইয়াছিল কিনা, যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। পরন্তু তদানীন্তন দর্পণেও যে পারদ সংযোগের পদ্ধতি ছিল, যুক্তিকল্পতরুতেই তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কারণ 'ভব্য' নামক এক শ্রেণীর দর্পণের 'রসাঢ্য' বিশেষণ দেখা যায়। এস্থলে রস শব্দ পারদার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। উক্ত ভব্য সংজ্ঞক দর্পণ এক বিতস্তিপরিমিত হইত এবং উহা সুখবৃদ্ধিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।[৪৬] এই পরিমাণ ক্রমে চারি অঙ্গুল করিয়া বৃদ্ধি করিলে, যথাক্রমে দর্পণের সুখ, জয় ও ক্ষেম সংজ্ঞা হইয়া থাকে।[৪৭] দীর্ঘে প্রস্থে চতুরঙ্গুল পরিমিত বিজয় নামক দর্পণ সকলেরই সুখপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী অর্থাৎ সার্বভৌম রাজা, সাধারণ রাজা ও ব্রাহ্মণ ইহাদের দর্পণের পরিমাণ যথাক্রমে পৌরুষ, পৌরুষার্ধ এবং তদর্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৪৮] একটি পুরুষ দাঁড়াইলে তাহার যে উচ্চতা অনুভূত হয়, তাহাই 'পৌরুষ' নামে অভিহিত হইয়াছে।[৪৯]

অষ্টপ্রকার ধাতুর মিশ্রণে নির্মিত দর্পণ, সকলের পক্ষেই ব্যবহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। লক্ষণানুসারে দর্পণের আবার দৈব, মানুষ ও রাক্ষস এই প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব দর্পণের ব্যবহারে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। মানুষ দর্পণের ব্যবহারে সুখসম্পদ লাভ হয়, এবং রাক্ষস দর্পণের ব্যবহারে বিপদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কার্যবিশেষে আবার সকলের পক্ষেই ত্রিবিধ দর্পণ ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভোজরাজের মতে দেবতার আরাধনকার্যে

৪৫ দর্পণঃ স্বর্ণ-রজত-ত্রপু-লৌহসমুদ্ভবঃ।

৪৬ বিতস্তিসম্মিতো ভব্যো রসাঢ্যঃ সুখবর্ধনঃ।

৪৭ ভব্যঃ সুখো জয়ঃ ক্ষেমশ্চতুরঙ্গুলিবর্ধনাৎ।

৪৮ আয়াম-পরিণাহাভ্যাং চতুরঙ্গুলিসম্মিতঃ।
সর্বে যামুপযুজ্যেত বিজয়োনাম দর্পণঃ॥
পৌরুষং পৌরুষার্ধঞ্চ তদর্ধঞ্চ যথাক্রমম্।
চক্রবর্ত্যাগুভূদেব-সামান্যানাং প্রদর্শিতম্॥

৪৯ ঊর্ধ্ববিস্তৃতমানন্তু পৌরুষং মানমুচ্যতে। (যুক্তিকল্পতরু)

দৈব দর্পণ ব্যবহার্য, বিলাসের জন্য মানুষ দর্পণ ব্যবহার্য, এবং যুদ্ধ সময়ে রাক্ষস দর্পণে মুখদর্শন কর্তব্য।

বীরমিত্রোদয়নিবন্ধে বৈখানসগ্রন্থের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দর্পণের আকৃতি সম্বন্ধে এবং উপাদান সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, আরাধ্য দেবপ্রতিমার পরিমাণানুসারে, অথবা তাহার অর্ধপরিমানুসারে দর্পণ প্রস্তুত করিবে। এই দর্পণ কাংস্যের দ্বারা নির্মাণ করিবে, ইহার আকার গোল হইবে এবং উহাতে উপযুক্তরূপ মহামূল্য রত্ন খচিত হইবে। উহা মুখের পরিমাণ যত বড় তত বড়ও হইতে পারে। উহা সপাদ এবং সনাল এই দুই প্রকার হইয়া থাকে।[৫০]

'সপাদ' শব্দে আধুনিক ফ্যাসনের ঠ্যাংওয়ালা আয়না এবং 'সনাল' শব্দে নিম্নদিকে ধরিবার ডাঁটওয়ালা আয়না অভিপ্রেত হইয়াছে। সিদ্ধান্তশেখরের মতে বিশুদ্ধ কাংস্যের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রাকার দর্পণ প্রস্তুত করিতে হয়। উহার পরিমাণ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল অথবা তাহার অর্ধেক হওয়া উচিত। উহার নালের পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল এবং পাদের পরিমাণ চারি অঙ্গুল হওয়া আবশ্যক।[৫১]

শিশুপালবধকাব্যে মণি-নির্মিত দর্পণের উল্লেখ দেখা যায়।[৫২] তত্রত্যমণি-দর্পণের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, 'মণিদর্পণ' শব্দে স্ফটিকনির্মিত মুকুর অভিপ্রেত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে অতীত যুগের চিহ্নস্বরূপ কাংস্য দর্পণ নাপিতের বাক্সে রক্ষিত হইয়া থাকে। চূড়াকরণ সংস্কারে তাম্রক্ষুরের অভাবে কাংস্য দর্পণের ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবতার মহাস্নানেও এই জিনিসটার প্রয়োজন হইয়া

---

৫০ দর্পণং প্রতিমামনং তদর্ধং বা সুশোভনম্।
বৃত্তং কাংস্যং মহারত্ন-খচিতং বা যথাবলম্॥
পাদযুক্তং সনালং বা মুখমানমথাপিবা।

৫১ দর্পণং শুদ্ধকাংস্যেন পূর্ণচন্দ্র-সমাকৃতি।
ষট্‌ত্রিংশতাঙ্গুলৈ নাহং বিদধ্যাদ্বা তদর্ধতঃ॥
নালমষ্টাঙ্গুলংতস্য পদং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্।

৫২ সাবর্ণ্যভাজাং প্রতিমাগতানাং
লক্ষ্যৈঃ স্মরাপাণ্ডুতয়াঙ্গনানাম্।
যস্যাং কপোলৈঃ কলধৌত ধাম—
স্তম্ভেষু ভেজে মণিদর্পণশ্রীঃ॥ ৩।৪৭

থাকে। দেবতার মহাস্নানেও এই জিনিসটার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অনেক স্থানে বিবাহের বরের হাতেও মঙ্গলার্থ কাংস্য দর্পণের অধিষ্ঠান হয়।

—

ভদ্রাসন

'ভদ্রাসন' নামক আর একটি রাজভোগ্য জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে রাজার অভিষেক-দ্রব্যের তালিকায় ভদ্রাসনের নাম কথিত হইয়াছে। যথা— 'ভদ্রাসনঞ্চ ছত্রঞ্চ বালব্যজনমেবচ'। এই আসন ক্ষীরবৃক্ষের দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার দৈর্ঘ্য তিন হস্ত, প্রস্থ দেড় হস্ত এবং উচ্ছ্রায় (খাড়াই) দেড় হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক। ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাজার ভদ্রাসন চতুরস্র কর্তব্য, উহাই শুভপ্রদ। অষ্টকোণ অথবা বৃত্তাকার কিম্বা দীর্ঘ ভদ্রাসন কর্তব্য নহে। এই আসনকে স্বর্ণ রূপ্য তাম্র ও প্রশস্ত রত্নের দ্বারা চিত্রিত করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে কৃত্রিম রত্নবিন্যাস কর্তব্য নহে। ইহাতে চারিটি পুরুষের প্রতিকৃতি, আটটি হংস ও ষোলটি অশ্ব প্রতিকৃতি বিন্যস্ত করিতে হয়। এই আসন ব্যাঘ্রচর্মাবৃত হইলে বরাসননামে অভিহিত হইয়া থাকে।[৫৩]

রামায়ণে স্বর্ণচিত্রিত ভদ্রাসনের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৪] ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাকালে রাজার আগে আগে একজন ভদ্রাসন বহন করিয়া গমন করিত। বলা আবশ্যক যে, বর্ণিত ভদ্রাসন ভোজদেব বর্ণিত পীঠাসনেরই প্রকারান্তর বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

—

---

৫৩ বৈয়াঘ্রচর্মাস্তরণং সুখার্থং বরাসনং তচ্চ সমামনন্তি। —বিষ্ণুধর্মোত্তর ২।১৪

৫৪ নচ কাঞ্চন-চিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন।
ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীরপুরঃসরম্॥ —অযোধ্যাকাণ্ড। ২৭। ১৭

পীঠ

যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে 'পীঠ' নামক আসনের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থে ধাতু, প্রস্তর ও কাষ্ঠ এই তিন প্রকার উপাদানের দ্বারা পীঠ নির্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়।[৫৫]

প্রথমতঃ ধাতুনির্মিত পীঠের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। পরিমাণবিশেষানুসারে পীঠের অনেক প্রকার সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই হস্ত দীর্ঘ, একহস্ত প্রস্থ এবং অর্ধহস্ত উন্নত পীঠ 'সুখপীঠ' নামে অভিহিত হইয়াছে। সুখপীঠের দ্বিগুণ পরিমাণে নির্মিত 'সিদ্ধি' এবং পঞ্চগুণ পরিমাণে নির্মিত 'শুভ' চতুর্গুণ পরিমাণে নির্মিত 'সিদ্ধি' এবং পঞ্চগুণ পরিমাণে নির্মিত পীঠ 'সম্পদ্' নামে কথিত হইয়াছে। এই পাঁচ প্রকার পীঠ যথাক্রমে পীঠারোহীর ধন, ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য ও অভিলষিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে।[৫৬] পীঠ মাত্রকেই সমান করিতে হয়, কারণ সমপীঠে উপবেশন করিলে সুখপ্রাপ্তি হয়, পক্ষান্তরে বিষম পীঠে উপবেশনে নানা প্রকার আপদ্ ঘটিয়া থাকে।[৫৭] পরিমাণাদির বৈচিত্র্যানুসারে রাজার বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার্য আরও কয়প্রকার পীঠের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, যে পীঠ দীর্ঘে প্রস্থে দুই হাত এবং যাহার উন্নতি আধ হাত সেই পীঠ 'জারক' নামে প্রসিদ্ধ।[৫৮] যাহার দৈর্ঘ্য, উন্নতি ও বিস্তার চারি হাত সেই পীঠ 'রাজপীঠ' নামে পরিচিত, উহা সকলার্থের সম্পাদক।

পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই পীঠে রাজার অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। যে পীঠের দৈর্ঘ্য উন্নতি ও বিস্তার ছয় হাত পরিমিত, রাজার চিত্ত-প্রসাদক সেই পীঠ 'কেলিপীঠ' নামে অভিহিত। যে পীঠের দৈর্ঘ্য, উন্নতি ও বিস্তার আট হাত, সেই

৫৫ ধাতু পাষাণকাষ্ঠৈশ্চ পীঠস্ত্রিবিধ উচ্যতে।
ধাতবশ্চ শিলাশ্চৈব কাষ্ঠানি বিবিধানিচ॥

৫৬ হস্তদ্বয়ন্তু দৈর্ঘ্যেণ তদর্ধং পরিণাহতঃ।
তদর্ধেনোন্নতঃ পীঠঃ সুখ ইত্যভিধীয়তে॥
হস্তদ্বয়াধিক্যাৎ তঞ্চ পীঠা ভবন্তিহি।
সুখং জয়ঃ শুভঃ সিদ্ধিঃ সম্পচ্চেতি যথাক্রমম্॥
ধন-ভোগ-সুখৈশ্বর্য-বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়কঃ।

৫৭ সমে দীর্ঘসুখাবাপ্তি বিষমে বিষমাপদঃ॥

৫৮ আয়াম-পরিণাহাভ্যাং হস্তদ্বয়মিতো হি যঃ।
অর্ধহস্তোন্নতঃ পীঠো জারকো নাম বিশ্রুতঃ

পীঠ 'অঙ্গপীঠ' নামে পরিচিত, উহা পঞ্চসুখপ্রদ (বিস্তৃত সুখদায়ী)। রাজপীঠ স্বর্ণের দ্বারা নির্মাণ করিতে হয়। জয়পীঠ ও সুখপীঠ রজতের দ্বারা নির্মিত হয়। রজত-নির্মিত পীঠ কীর্তিজনক, তাম্রপীঠ প্রতাপজনক এবং বিপক্ষনাশক। লৌহ-নির্মিত পীঠ উচ্চাটন-কার্যে ব্যবহার্য। সর্বধাতুময় পীঠ সর্বত্রই ব্যবহার্য। ত্রপু, সীস, রঙ্গ প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা নির্মিত পীঠ শত্রুক্ষয়কারী। ধাতুপীঠের এই কয়প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে।[৫৯]

শিলাপীঠ

শিলাপীঠের পরিমাণ এবং গুণ ধাতুপীঠের ন্যায় বুঝিতে হইবে। রাজপীঠ (সম্ভবতঃ হীরকময়) বজ্রপাণির ব্যবহার্য, উহা অন্যের ব্যবহার্য নহে। সূর্য-গ্রহের পীঠ পদ্মরাগমণি-নির্মিত, চন্দ্রের পীঠ চন্দ্রকান্তমণি-নির্মিত, রাহুর পীঠ মরকতমণি-নির্মিত, শনির পীঠ নীলকান্তমণি-নির্মিত, বুধের পীঠ গোমেদমণি-নির্মিত, বৃহস্পতির পীঠ স্ফটিকনির্মিত, শুক্রের পীঠ বৈদূর্যমণি-নির্মিত, এবং মঙ্গলের পীঠ প্রবালনির্মিত হওয়া আবশ্যক। যে রাজা যে গ্রহের দশায় জাত হন, তাঁহার পক্ষে তত্তৎ গ্রহের পীঠ ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহা পৌরাণিক মত।[৬০] স্ফটিক-নির্মিত পীঠ সমস্ত রাজারই অভিষেক-কার্যে, যাত্রায়, উৎসবে

৫৯ দৈর্ঘ্যোন্নতি-পরীণাহৈশ্চতুর্হস্ত-মিতো হি যঃ।
রাজপীঠ ইতিজ্ঞেয়ঃ সকলার্থ-প্রসাধকঃ॥
অত্রাভিষেকমিচ্ছন্তি ক্ষিতিপস্য পুরাবিদঃ।
দৈর্ঘ্যোন্নতি-পরীণাহৈ ষড়্ হস্তপ্রমিতো হি যঃ॥
রাজ্ঞাং চিত্তপ্রসাদার্থং কেলিপীঠাভিধানকঃ।
দৈর্ঘ্যোন্নতিপরীণাহৈরষ্টহস্তমিতো হি যঃ॥
অঙ্গপীঠোহয়ং নাম্না ভবেৎ পঞ্চসুখপ্রদঃ।
কাণকো রাজপীঠঃ স্যাজ্জয়ো বা রাজতঃ সুখঃ
রাজতঃ কীর্তিজননো ধনবৃদ্ধিকরঃ পরঃ।
তাম্রঃ প্রতাপজননো বিপক্ষক্ষয়কারকঃ॥
লৌহস্তুচ্চাটনে, সার্বঃ সর্বকর্মসু যুজ্যতে॥
ত্রপু সীসক-রঙ্গাখ্যাঃ শত্রুক্ষয়-ফলপ্রদাঃ॥
(ত্রপু ও রঙ্গের অবান্তর ভেদ আছে।)

৬০ এষাং মানং গুণাশ্চাপি বিজ্ঞেয়া ধাতুপীঠবৎ॥
রাজপীঠো বজ্রপাণেরেব নান্যস্য দৃশ্যতে।

এবং দিগ্বিজয়-কার্যে ব্যবহার্য।[৬১] অয়স্কান্ত মণি নির্মিত পীঠ যুদ্ধকার্যে ব্যবহার্য। বর্ষাকালে রাজা গারুত্মতমণিময় পীঠে উপবেশন করিবেন। মেঘের গর্জন সময়ে রাজা বিশুদ্ধ রত্নময় পীঠে উপবিষ্ট হইবেন। সাধারণ প্রস্তরনির্মিত পীঠ রাজাদিগের বিলাসের জন্য ব্যবহার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।[৬২]

—

কাষ্ঠপীঠ

অতঃপর কাষ্ঠপীঠের গুণাগুণ কথিত হইয়াছে। ইহাদেরও পরিমাণ এবং তদনুযায়ী সংজ্ঞা ধাতুপীঠেরই অনুরূপ। গাম্ভারী, পনস, চন্দন, কালেয়ক আগর-কাষ্ঠ প্রভৃতি ও বকুল, এই সকল কাষ্ঠপীঠের উপাদানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গাম্ভারীকাষ্ঠনির্মিত 'শুভ'-সংজ্ঞক পীঠ, পনসকাষ্ঠনির্মিত 'জয়পীঠ', চন্দননির্মিত 'সুখপীঠ', কালেয়কনির্মিত 'জারকপীঠ' এবং বকুলনির্মিত 'শুভপীঠ' রাজার অভিষেক-কার্যে ব্যবহার্য। অন্যান্য পীঠ কার্যান্তরে ব্যবহার্য।[৬৩] যে সকল বৃক্ষের পুষ্প সুগন্ধযুক্ত এবং যাহাদের সার আছে, তাহাদের পীঠ বকুলের তুল্য। যে সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ শুষ্ক, মৃদু এবং লঘু তাহাদের পীঠ গাম্ভারী কাষ্ঠের রীতিতে

পদ্মরাগো দিনেশস্য চান্দ্রকান্তো বিধোরপি ॥
রাহোর্মারকতঃ পীঠঃ শনেনীলসমুদ্ভবঃ।
গোমেদকস্তু সৌম্যস্য স্ফাটিকস্তু বৃহস্পতেঃ ॥
শুক্রস্য বৈদূর্যভবঃ প্রাবালো মঙ্গলস্য হি।
যো যস্যহি দশাজাতঃ পীঠস্তস্যহি তন্ময়ঃ ॥
স্ফাটিকস্তু মহীন্দ্রাণাং সর্বেষামেব যুজ্যতে।
অভিষেকে চ যাত্রায়াং উৎসবে জয়কর্মণি ॥

৬১ অয়স্কান্তোপঘটিতঃ সংগ্রামে পীঠ ইষ্যতে।
গরুড়োদ্গার-রচিতে বর্ষাসু নৃপতির্বসেৎ ॥

৬২ শুদ্ধরত্নময়ং পীঠং ভজতে ঘনগর্জিতে।
সামান্যঃ প্রাস্তরঃ পীঠো বিলাসায় মহীভুজাম্।

৬৩ সম্পত্তিসুখবৃদ্ধ্যর্থং গাম্ভারীজনিতো জয়ঃ।
শুভঃ স্যাদভিষেকে চ সম্পদ্বৈরিবিনাশনঃ ॥
পানসো রাজকঃ পীঠঃ সুখ-সম্পত্তিকারকঃ।
জয়ঃ স্যাদভিষেকেচ শুভঃ শত্রুবিনাশনঃ ॥
চান্দনস্তু সুখঃ পীঠো (?) অভিষেকে মহীভুজাম্।
কালেয়কো জারকোহি ভূভুজামভিষেচনে
পীঠানগুরুকাদীনামন্যান্ চন্দনবদ্বিদুঃ।
বাকুল স্তু শুভঃ পীঠো ভূভুজামভিষেচনে ॥

কর্তব্য, গুণও তদনুরূপ। যে সকল বৃক্ষ ফলবান, সসার এবং রক্তবর্ণ সার, তাহাদের পীঠও পনসের মত।[৬৪]

—

নিষিদ্ধ পীঠ

ধাতুনির্মিত পীঠের মধ্যে লৌহনির্মিত পীঠ নিষিদ্ধ। প্রস্তরপীঠের মধ্যে শার্কর (বেলেপাথর নির্মিত) এবং কর্কর (বেলেরই প্রকারান্তর) পীঠ বর্জনীয়। কাষ্ঠজ পীঠের মধ্যে অসার এবং অত্যন্তসারকাষ্ঠনির্মিত ও আম্র, জাম ও কদম্ব কাষ্ঠ নির্মিত পীঠ নিষিদ্ধ।[৬৫] ভোজদেবের মতে সাধারণতঃ গুরুপীঠ গৌরবজনক এবং লঘুপীঠ লাঘবজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৬৬] পরাশরের মতে একেবারে গ্রন্থিশূন্য (কাঠের গেরো রহিত) নহে, অথচ অত্যন্ত গ্রন্থিযুক্তও নহে, গুরু ও সমান, অতি দীর্ঘ নহে, এবং অতি নীচও নহে, এমন পীঠ সুখ-সম্পত্তি দায়ক।[৬৭]

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত পীঠের সদৃশ যে সমস্ত জিনিস শিল্পিগণকর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহাদের গুণ দোষ এবং পরিমাণ পীঠের মতই বুঝিতে হইবে।[৬৮]

—

৬৪ এবং সুগন্ধিকুসুমাঃ সসারা যেচ পাদপাঃ।
বাকুলেন সমঃ কার্য এবং পীঠস্য নির্ণয়ঃ ॥
যে শুষ্ককাষ্ঠা বৃক্ষাস্তু মৃদবো লঘবোঽথবা।
গাম্ভারীসদৃশঃ পীঠস্তেষাং কার্যস্তথা গুণঃ ॥
ফলিনশ্চ সসারাশ্চ রক্তসারাশ্চ যে নগাঃ।
তেষাং পানসবৎ পীঠস্তথৈব গুণমাবহেৎ ॥

৬৫ নিক্ষেয়ো নিন্দিতঃ পীঠো লৌহোত্থঃ সর্বধাতুজে।
শিলোত্থঃ শার্করো বর্জ্যঃ কর্করশ্চ বিশেষতঃ ॥
কাষ্ঠজেষুচ পীঠেষু নাসারা নাতিসারিণঃ।
তথাহি—
আম্র-জম্বু-কদম্বানামাসনং বংশনাশনম্ ॥

৬৬ গুরুঃ পীঠো গৌরবায় লঘু লাঘবকারকঃ ॥

৬৭ নাগ্রন্থির্নাতিগ্রন্থিশ্চ নাগুরুর্নাসমাকৃতিঃ।
পীঠঃ স্যাৎ সুখসম্পত্ত্যৈ নাতিদীর্ঘো ন বামনঃ ॥

৬৮ যে চান্যে পীঠ-সদৃশা দৃশ্যাঃ শিল্পিবিনির্মিতাঃ।
গুণান্ দোষাংশ্চ মানঞ্চ তেষাং পীঠবদাদিশেৎ ॥

মল্লিকা পীঠ

অতি প্রাচীনকালে 'মল্লিকা' নামক একপ্রকার পীঠের পরিচয় পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে জানা যায় যে, এই অসাধারণ পীঠের সম্পর্কেই নায়কসহায়—'পীঠমর্দ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আসনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ পীঠমর্দের লক্ষণ জানা আবশ্যক। বাৎস্যায়ন পীঠমর্দের লক্ষণে বলিয়াছেন যে, বিত্ত-রহিত শরীর মাত্র অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদিরহিত, মল্লিকা ফেণক ও কষায়মাত্র যাহার পরিচ্ছদ (সম্পত্তি) পূজ্য দেশ হইতে অর্থাৎ শাস্ত্র-কলাজ্ঞ-পণ্ডিতবহুল দেশ হইতে আগত, নৃত্যগীতাদিকলাতে অভিজ্ঞ, এবং তদুপদেশের দ্বারা নাগরিকদিগের সভায় এবং বেশ্যাদিগের আচরণে উপদেশ প্রদানের দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহার নাম 'পীঠমর্দ'। 'মল্লিকা'র ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে টীকাকার যশোধর বলিয়াছেন যে, 'মল্লিকা দণ্ডাসনিকা' অর্থাৎ মল্লিকা শব্দে দণ্ডাসনিকাকে বুঝায়। এই আসন শরীরকে ধারণ করে বলিয়া পূর্বাচার্যগণ ইহার 'মল্লিকা' নাম নির্দেশ করিয়াছেন। 'মল মল্লধারণে' ধারণার্থ 'মল্ল' ধাতু হইতে মল্লিকা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই আসনে উপবেশনের জন্য উপদেষ্টা পীঠমর্দের পৃষ্ঠের দিকে উহাকে ঘুরানো হয়। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিবার সময়ে জঙ্ঘার দ্বারা ইহাকে ঘর্ষণ করিয়া পরিচালিত করিয়া থাকেন।[৬৯]

টীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত 'পীঠমর্দ' উপদেশ কার্যে নিযুক্ত হইয়া পীঠকে মর্দন করেন, অতএব তাঁহার 'পীঠমর্দ' নাম হইয়াছে।[৭০] টীকাকারের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, যে চেয়ারের পায়াতে ক্ষুদ্র চাকা সংযুক্ত থাকায় পায়ের সাধারণ ক্রিয়াতেই ঘুরিয়া পড়ে, তাদৃশ চেয়ার পূর্বকালে 'মল্লিকা' নামে অভিহিত হইত, এবং টীকাকারের সময়ে উহাকে 'দণ্ডাসনিকা' নামেও নির্দেশ করা হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী কালে পীঠমর্দ নামের যে

৬৯ অবিভবস্তু শরীরমাত্রো মল্লিকা-ফেনক-কষায়মাত্রপরিচ্ছদঃ পূজ্যাদ্দেশাদাগতঃ কলাসু বিচক্ষণ-স্তদুপদেশেন গোষ্ঠ্যাং বেশোচিতে চ বৃত্তে সাধয়েদাত্মানমিতি পীঠমর্দঃ। —৪র্থ অধ্যায়। সাধারণ অধি। ১৫। অত্রত্য ফেনক শব্দে সাবান, এবং কষায় শব্দে শরীরে মর্দনীয় সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ অভিপ্রেত হইয়াছে।

৭০ সপীঠমর্দ উপদেশদানেঽধিকৃতঃ
তাং মল্লিকাখ্যং পীঠং মৃদ্নাতীতি কৃত্বা।

অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত বাৎস্যায়নোক্তের কিছুমাত্রই সম্পর্ক নাই। 'রথিনঃ পীঠমর্দাশ্চ হস্ত্যারোহাশ্চ নৈপগমাঃ' (বিরাট পর্ব, ২১।৩৩)—মহাভারতের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, 'পীঠমর্দাঃ রাজপ্রিয়াঃ'; নিজমত সমর্থনের জন্য তিনি মেদিনীর কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'পীঠমর্দোঽতিধৃষ্টেঽপ্যায়কস্য প্রিয়োঽপিচেতি মেদিনী'। সুতরাং টীকাকারের মতে নায়কের প্রিয়ব্যক্তি-মাত্রই পীঠমর্দ। আবার আমাদের সংস্কৃত কাব্যের ইদানীন্তন কর্ণধার সাহিত্যদর্পণ-কারের মতে নায়কের বহুব্যাপী অর্থাৎ অতিবিস্তৃত প্রসঙ্গ সঙ্গত ইতিবৃত্তে যে সহায় নায়কের সাধারণগুণ ভূয়িষ্ঠ,-সে-ই পীঠমর্দনামে অভিহিত, যেমন রামচন্দ্রের সুগ্রীব প্রভৃতি।[৭১]

—

সিংহাসন

সিংহাসন পদার্থটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বজনের নিকট সমান পরিচিত। পিতামহী কথিত গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পর্যন্ত উহার নামকীর্তনের অভাব নাই; কিন্তু উহার আকৃতি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানে আমরা নিতান্তই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। কারণ, ইহা রাজভোগ্য বস্তু। বর্তমান সময়ে লক্ষণান্বিত-সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার দর্শন আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে উহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইবে।

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে আসন যুক্তিপ্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, আসন সাধারণতঃ দুই প্রকার; এক সাধারণ ও অপর অসাধারণ সংজ্ঞায় অভিহিত। তন্মধ্যে সিংহাসন 'বিশেষ' বলিয়া ও অন্য আসন 'সামান্য' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৭২]

৭১ দূরানুবর্তিনি স্যাত্তস্য প্রাসঙ্গিকেতিবৃত্তে তু॥
কিঞ্চিত্তদ্গুণহীনঃ সহায় এবাস্য পীঠমর্দাখ্যঃ॥
অথ নায়কস্য বহুব্যাপিনি প্রসঙ্গ সঙ্গতে ইতিবৃত্তেঽনন্তরোক্তে নায়ক সামান্যগুণৈঃ কিঞ্চিদূণঃ পীঠমর্দাখ্যঃ সহায়ো ভবতি।
যথা রামচন্দ্রাদীনাং সুগ্রীবাদয়ঃ।

৭২ বিশেষশ্চাথ সামান্যমাসনং দ্বিবিধং মতম্।
সিংহাসনং বিশেষাখ্যং সামান্যং সুগজাদিকম্॥

যুগভেদেও সূর্যাদি গ্রহের দশাবিশেষে জাত নৃপতিদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিংহাসনের নির্দেশ পাওয়া যায়। সত্যযুগের সিংহাসনে পঞ্চ সোপান, ত্রেতাযুগে চারি সোপান, দ্বাপরে তিন সোপান ও কলিযুগে দুই সোপান নির্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। সিংহাসনের চরণগুলি সিংহান্বিত হইবার উপদেশ আছে। চরণের সংখ্যা সত্যাদি যুগক্রমে চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ এবং যোড়শ হইবার ব্যবস্থা আছে।[৭৩] সূর্যাদি অষ্টগ্রহের দশায় জাত ভূপতিদিগের ভোগ্য সিংহাসন যথাক্রমে পদ্ম, শঙ্খ, গজ, হংস, ভৃঙ্গ, মৃগ ও হয়—এই অষ্টনামে অভিহিত হইয়াছে।[৭৪]

সমস্ত সিংহাসনেরই 'রাজপাত্র' নামক সোপান, অর্থাৎ ভিত্তি, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে রাজার স্বহস্ত পরিমাণে অষ্টহস্তমিত হওয়া আবশ্যক। উহার উচ্চতা এক পুরুষ পরিমিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।[৭৫]

উক্ত সোপানের মধ্যে তদর্ধ পরিমিত রাজাসন, অর্থাৎ সিংহাসন স্থাপিত হইবে। কলিযুগে রাজাসন অর্ধোন্নত বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৭৬]

অষ্ট প্রকার সিংহাসনের মধ্যে পদ্ম-সংজ্ঞক আসন গাম্ভারী কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং পদ্মমালার দ্বারা চিত্রিত হইবে। উহার অবয়বগুলি পদ্মরাগমণি নিধানের দ্বারা সুশোভিত, এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা আবৃত হইবে। উহার পাদাগ্রে পদ্মকলিকা হইতে বিনির্গত আটটি পুত্রিকা (পুতুল) অষ্ট দিকে নিহিত হইবে। এই পুত্রিকাগুলি রাজার দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত, এবং পদ্মরাগমণি দ্বারা চিত্রিত হওয়া আবশ্যক। এতদুপরি নিহিত রাজাসনে চারিটি ও বারটি পুত্রিকা স্থাপিত হইবে, এবং মাঝে মাঝে নবরত্ন খচিত হইবে। রক্তবস্ত্রাবৃত এই আসন পদ্ম-সিংহাসন নামে অভিহিত হইয়াছে।

শঙ্খ-সিংহাসন দেবদারু কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং শঙ্খ-চিত্রাবলির দ্বারা

---

৭৩ বাণ বেদাগ্নি পক্ষাণি সোপানানি যুগৈঃ ক্রমাৎ ॥
চত্বারিংশত্তথা ত্রিংশৎ বিংশতিঃ ষোড়শৈবচ।
সিংহান্বিতানিজ্ঞেয়ানি চরণানি যুগৈঃ ক্রমাৎ ॥

৭৪ পদ্মঃ শঙ্খো গজো হংসঃ সিংহো ভৃঙ্গো মৃগো হয়ঃ।
অষ্টৌসিংহাসনানিচ নীতিশাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥
আদিত্যাদিদশাজানাং ভূপতীনাং যথাক্রমম্।

৭৫ রাজ্ঞঃ স্বহস্তৈরষ্টাভিরায়ামপরীণাহয়োঃ
রাজপাত্রমিদং নাম সোপানং পুরুষোন্নতম্।

৭৬ তদর্ধমানং তন্মধ্যে রাজাসনমুদাহৃতম্।
অর্ধোন্নতমিদং রম্যং প্রোক্তং কলিমহীভুজাম্।

সুশোভিত হইবে। এই সিংহাসনের পাদাগ্রে শঙ্খনাভি, এবং স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ স্ফটিক নির্মিত সাতাশটি পুত্রিকা বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক। শুক্ল বস্ত্রের দ্বারা উহার আবরণ করিতে হয়। শাস্ত্রে এইরূপ বিহিত হইয়াছে।

গজ-সিংহাসন পনস কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং হস্তী-প্রতিকৃতিসমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে। প্রবাল, বৈদূর্যমণি ও সুবর্ণের দ্বারা উহার শোভা-সম্পাদন আবশ্যক। উহার পাদাগ্রে নিহিত হস্তীর মস্তক ও পুচ্ছের প্রতিকৃতি হইতে সমুত্থিত মাণিক্য নির্মিত এক-একটি পুত্রিকা রচনা করিবার ব্যবস্থা আছে। রক্তবস্ত্র প্রভৃতি উহার ভূষণরূপে বিহিত হইয়াছে।

হংস-সিংহাসন শালকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং হংসের প্রতিকৃতিশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। পুষ্পরাগমণি, স্বর্ণ ও কুরুবিন্দ, এতত্রিতয়ের দ্বারা উহার শোভা সম্পাদন করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে হংসের প্রতিকৃতি নির্মাণ করিতে হয়, এবং উহাতে গোমেদ মণি নির্মিত একবিংশতি সংখ্যক পুত্রিকা স্থাপিত করিতে হয়। পীতবর্ণ বস্ত্র ইহার ভূষণরূপে বিহিত হইয়াছে।

সিংহ-সিংহাসন চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং সিংহের প্রতিকৃতি-শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহার অবয়বগুলি বিশুদ্ধ হীরকের দ্বারা চিত্রিত করিতে হয়, এবং উহার চরণ-নিহিত সিংহচিহ্নগুলি বিশুদ্ধ সুবর্ণের দ্বারা বিরচিত করিতে হয়। ইহাতে একবিংশতি সংখ্যক পুত্রিকা স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। মুক্তা, শুক্তি ও অন্যান্য নির্মল পদার্থের দ্বারা উহার অলঙ্করণ করিতে হয়। মুক্তার দ্বারা ইহার আবরণ বিহিত হইয়াছে।

ভৃঙ্গ-সিংহাসন বিশুদ্ধ চম্পককাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং ভ্রমরের প্রতিকৃতি-সমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহাতে বিশুদ্ধ মরকতমণি যুক্ত করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে পদ্মকোষের আকৃতি ও দ্বাবিংশতি পুত্রিকা নিধানের ব্যবস্থা আছে। নীলবস্ত্রাদি উহার ভূষণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মৃগ-সিংহাসনের উপাদান নিম্বকাষ্ঠ। মৃগের প্রতিকৃতি শ্রেণীর দ্বারা উহার শোভা সম্পাদন বিহিত হইয়াছে। ইন্দ্রনীলমণি, মহানীলমণি ও স্বর্ণ, এই তিন বস্তু দ্বারা উহাকে চিত্রিত করিতে হয়। উহার পাদাগ্রে মৃগের মস্তক-চিহ্নস্থাপন এবং চত্বারিংশৎ সংখ্যক পুত্রিকা বিন্যস্ত করিতে হয়। উহা নীল-বস্ত্রাদিযুক্ত হইয়া থাকে।

হয়-সিংহাসন বকুলকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত, এবং হয়-প্রতিকৃতি-নিচয়ের দ্বারা সুশোভিত হইবে। উহাতে সর্বপ্রকার বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা শোভিত পঞ্চ

সপ্ততি সংখ্যক পুত্রিকা বিন্যস্ত করিতে হয়। উহার চরণাগ্রে অশ্ব-মস্তক-চিহ্ন বিহিত, এবং বিচিত্র বস্ত্রাদি উহার ভূষণরূপে কথিত হইয়াছে।

এই অষ্ট প্রকার মহাসিংহাসন ভোজদেব-কর্তৃক কথিত, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সম্মত।[৭৭]

সিংহাসনের এতাদৃশ নির্মাণপদ্ধতি সত্ত্বেও অমরসিংহ স্বর্ণময় রাজাসনকেই সিংহাসননামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার রহস্য কি? তবে কি তাঁহার সময়ে কেবল স্বর্ণের দ্বারাই সিংহাসন প্রস্তুত হইত? অত্রত্য অল্পাক্ষর অমরকারিকাংশ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। উহা হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রাজভোগ্য আসনের নাম ভদ্রাসন। (নৃপাসনং যত্তদ্ ভদ্রাসনং সিংহাসনন্তু তৎ হৈমং)। যদি ঐ আসন স্বর্ণময় হয়, তবে ইহা সিংহাসন নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং ভদ্রাসন ও সিংহাসন, এই উভয়ের আকারগত কোনও প্রভেদ নাই, কেবল উপাদানের পার্থক্যানুসারেই নামান্তর বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাদম্বরী পাঠে জানা যায় যে, রাজকুমার চন্দ্রাপীড় কাঞ্চনময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। (কাঞ্চনময়ং শশীব মেরুশৃঙ্গং চন্দ্রাপীড়ঃ সিংহাসন মারুরোহ)। অতএব কবি বাণভট্টের সময়েও সিংহাসন স্বর্ণের দ্বারাই নির্মিত হইত, এমন অনুমান করা যায়। এই উক্তি হইতেও আকার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে যুক্তিকল্পতরুতে সিংহাসনের পাদদেশে সিংহ-চিহ্ন স্থাপনের যে ব্যবস্থা আছে, উক্ত চিহ্নানুসারেই 'সিংহাসন' এই যোগরূঢ় সংজ্ঞাসিদ্ধ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

কবি বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটকে সিংহাসনকে 'সিংহাঙ্কাসন' অর্থাৎ সিংহ-চিহ্নিতাসন নামেই নির্দেশ করিয়াছেন—

> সিংহাঙ্কাসনধারণাচ্চ সুচিরং সংজাতমূর্ছামিব
> ক্ষিপ্রং চন্দনবারিণা সকুসুমঃ সেকোনুগৃহ্নাতু পাং ॥

যুক্তিকল্পতরুপাঠে ইহাও জানা যায় যে—যথাবিহিত সিংহাসনের অন্যথা করিলে রাজার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজারই

৭৭ ইত্যেতৎ কথিতং সারং মহাসিংহাসনাষ্টকম্।
যথা ভোজেন লিখিতং যথা চাহৈন্যশ্চ পণ্ডিতৈঃ ॥

নিজের জন্য সিংহাসন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কারণ পরের আসনে উপবিষ্ট রাজা এবং আসনশূন্য রাজা শত্রুকর্তৃক নিহত হন, শাস্ত্রে এমত উপদেশ দেখা যায়।[৭৮]

—

৭৮ এতস্যাতিক্রমং দম্ভাদ্ যঃ কুর্যাৎ পৃথিবীপতিঃ।
অচিরাদেব বৃণুতে তস্য মৃত্যুরতিক্রমম্ ॥
পরাসনস্থো যো রাজা যো রাজাচ নিরাসনঃ।
স পরৈর্হন্যতে সিংহৈরিব মত্তগজাধিপঃ ॥

চতুর্দোল

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে 'চতুর্দোল' যানের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা রাজভোগ্য নিরতিশয় মূল্যবান যান বলিয়া কথিত হইয়াছে।[১]

বর্তমান সময়ে জাঁকজমকের বিবাহে 'চতুর্দোল' যানের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন যানের সহিত অধুনা দৃশ্যমান যানের সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয় না। শাস্ত্রে সাধারণতঃ চারিজন বাহকের দ্বারা বহনীয় যান চতুর্দোল নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ভোজদেব বলেন যে, যে যান চারিজন বাহকের দ্বারা বহনীয়, অথচ যাহার দণ্ড অর্থাৎ ডাঁট চারিটি, যাহার থাম আটটি, যাহাতে ছয়টি কুম্ভ সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট চতুর্দোল বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত চতুর্দোল আবার যথাক্রমে জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ, এই চারি নামে পরিভাষিত, এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ নৃপতিদিগের ভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য তিন হস্ত, পরীণাহ অর্থাৎ ওসার দুই হস্ত, এবং যাহা দুই হস্ত উন্নত, তাহা জয় নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য চারি হস্ত, পরীণাহ আড়াই হস্ত, এবং উন্নতি (খাড়াই) আড়াই হস্ত, তাহা 'কল্যাণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চ হস্ত, পরীণাহ তিন হস্ত, এবং উন্নতি তিন হস্ত, তাহা 'বীর' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহার দৈর্ঘ্য এবং পরীণাহ চারি হস্ত ও উন্নতি দুই হস্ত, তাহা 'সিংহ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সর্বপ্রকার চতুর্দোলই আবার সচ্ছদি (ছাদযুক্ত) ও নিশ্ছদি (ছাদরহিত) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে এবং বর্ষাকালে যে যান ব্যবহার্য, তাহা সচ্ছদি ; এবং ক্রীড়ার্থ ব্যবহার্য যান ও বর্ষা ভিন্ন ঋতুতে ব্যবহার্য যান নিশ্ছদি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বজ্রবারণ কাষ্ঠের দ্বারা চতুর্দোলের দণ্ড নির্মিত হইত, এবং অন্যান্য অংশগুলি চন্দনের দ্বারা ঘটিত হইত। ইহাতে লোমজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এবং ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ

---

১ রাজ্ঞোযদ্দিপদং যানং বিশেষাখ্যমলং (মিদং) বিদুঃ ॥
চতুর্ভিরুহ্যতে যত্তু চতুর্দোলং তদুচ্যতে ॥

পতাকা আস্তরণ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থে বস্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক, সেইগুলি লোমজ বস্ত্র দ্বারাই রচনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুম্ভ প্রভৃতি শোভা-সম্পাদক অবয়বগুলি স্বর্ণের দ্বারাই নির্মিত হইবার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অনুপাদি দেশভেদে[২] ত্রিবিধ রাজার চতুর্দোলে কুম্ভ, পদ্মকোষ, এবং পর্বত এই ত্রিবিধ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

সূর্যাদি অষ্টগ্রহের দশাতে জাত নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের অগ্রদেশে যথাক্রমে দর্পণ, অর্ধচন্দ্র, হংস, ময়ূর, শুক, গজ, অশ্ব, ও সিংহ, ইহাদিগের প্রতিকৃতি চিহ্ন স্বরূপ নিহিত হইত। ইহাতে নানা প্রকার মণিও খচিত হইত।

মণি নিধানের ব্যবস্থা দণ্ডের রীতি অনুসারে কথিত হইয়াছে। (মণি নিয়মস্তু দণ্ডবৎ)। এই স্থলে দণ্ড শব্দে কি অভিহিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে আচ্ছাদনের অবলম্বন দণ্ড বলিয়াই যেন মনে হয়। উক্ত চতুর্দোলে, রক্ত, শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ, চিত্র (নানাবর্ণ) অরুণ, নীল, ও কপিল—এই অষ্টবর্ণ পতাকা ব্যবহৃত হইত। পতাকান্বিত চতুর্দোল 'শুভযান' নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজকেশ্বরদিগের অর্থাৎ সম্রাট্‌দিগের চতুর্দোল যান দশটি মুক্তা-স্তবকের দ্বারা যুক্ত হইত। দিগ্‌বিজয়ার্থ প্রস্থিত নৃপতিদিগের চতুর্দোলে চামরান্বিত দশটি দণ্ড থাকিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।[৩] নৃপতিদিগের 'যাত্রাসিদ্ধি' নামক চতুর্দোল যানে সর্বোপরি চামপক্ষীর পুচ্ছ নিহিত হইত।[৪]

এ পর্যন্ত চতুর্দোলের যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইল, তাহা কেবল 'সচ্ছদি' চতুর্দোলের পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

'নিশ্ছদি' চতুর্দোলে স্তম্ভ থাকিবার ব্যবস্থা নাই। উহা আবার 'সধ্বজ' ও 'নিধ্বজ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ; তন্মধ্যে 'সধ্বজ' যানে চারিটি ধ্বজ, স্বামীর হস্তমানানুসারে এক হস্ত পরিমিত হইত। এই চারিটি ধ্বজ চারিকোণে নিহিত করিতে হয়, এবং হস্তদ্বয় পরিমিত দুইটি ধ্বজ অগ্রে ও পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপিত করিবার উপদেশ দেখা যায়।

---

২ অনূপ, জাঙ্গল ও সাধন্ এই তিন প্রকার দেশ।

৩ মুক্তাস্তবকৈর্দশভির্যুক্তঃ সাম্রাজকেশানাম্।
চামরদণ্ডৈর্দশভির্দিগ্‌জয়ানাং চতুর্দোলঃ।

৪ চামপক্ষ্যা পুচ্ছকেৎ সর্বোপরি পরিন্যসেৎ।
যাত্রাসিদ্ধিরয়ং নাম্না চতুর্দোলো মহীভুজাম্।

নৃপতিদিগের চতুর্দোল যানের ধ্বজে মণি, চামর, কুম্ভ ও খড়্গ চিহ্ন নিধানের ব্যবস্থা নবদণ্ড ছত্রের রীত্যনুসারে বুঝিতে হইবে।[৫] নির্ধ্বজ চতুর্দোলের অন্য প্রকার পরিমাণ কথিত হইয়াছে। যে চতুর্দোলের দৈর্ঘ্য ও পরীণাহ চারি হস্ত, সেই যান 'বিজয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত বিজয় যান এক বিতস্তি-পরিমিত বর্ধিত হইলে 'মঙ্গল' নামে এবং দুই বিতস্তি বর্ধিত হইলে 'ভব্য' নামে অভিহিত হয়।[৬] জাঙ্গলাদি ত্রিবিধ দেশবাসী ত্রিবিধ রাজার জন্য এই তিন প্রকার যান ব্যবহারের বিধান পাওয়া যায়।

—

অ ষ্ট দো ল

যে যান আটজন বাহকের দ্বারা বহনীয়, সেই যানকে পণ্ডিতগণ 'অষ্টদোল' নামে নির্দেশ করেন। এই শ্রেণীর যানে দুইটি সোপান নির্মাণের ব্যবস্থা দেখা যায়। ভোজরাজের মতে, অষ্টদোল যানের বাহক অষ্টসংখ্যক, ইহার দণ্ড ছয়টি, কুম্ভ দশটি, এবং স্তম্ভও দশটি বিহিত হইয়াছে। চতুর্দোল যানের মত ইহারও জয়, কল্যাণ, বীর ও সিংহ— এই চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ ও যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বিধ রাজার উপভোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'জয়' নামক অষ্টদোল যানের দৈর্ঘ্য ছয় হাত; পরীণাহ চারি হাত ও উন্নতি চারি হাত নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'কল্যাণ' নামক যানের দৈর্ঘ্য ও পরীণাহ পাঁচ হাত এবং চারি হাত উন্নতি বিহিত হইয়াছে। 'বীর' নামক অষ্টদোলের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি যথাক্রমে সাত হাত ও পাচ হাত বিবেচিত হইয়াছে। 'সিংহ' নামক অষ্টদোলের দৈর্ঘ্য ও পরীণাহ আট হাত পরিমিত, এবং উন্নতি ছয় হাত নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই যান ও 'সচ্ছদি' ও 'নিশ্ছদি' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। ইহার অন্যান্য অনেক নিয়মই চতুর্দোলের মত বুঝিতে হইবে। ইহাতে মণি, চামর ও পক্ষ, অর্থাৎ পাখির পালক, ইহাদের বিন্যাসনিয়ম 'নিষ্পতাক' চতুর্দোলের মত।

৫ নবদণ্ড ছত্রের বিবরণ 'ছত্র' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

৬ আয়াম পরীণাহাভ্যাং চতুর্হস্তমিতোহিবঃ।
বিজয়ো নাম বিজ্ঞাতশ্চতুর্দোলো মহীভুজাম্।
বিজয়ো মঙ্গলো ভব্যো বিতস্ত্যেকৈকবৃদ্ধিতঃ।
ত্রিবিধানাং মহীন্দ্রাণাং যানত্রয়মুদাহৃতম্

ছাদরহিত যে অষ্টদোল যানে ধ্বজ নিহিত হয় না, তাহা শিবিকা নামে অভিহিত হইয়াছে।

—

শি বি কা

অমরকোষে 'শিবিকা' ও 'যাপ্যযান' এই দুইটি শব্দের তুল্যার্থতা বিবেচিত হইয়াছে। টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত বলেন যে, শিবিকা শব্দের অর্থ— পাল্কী। রঘুনাথ চক্রবর্তীর মতে, 'শিবিকা' ও 'যাপ্যযান' শব্দ চতুর্দোলের বাচক। কিন্তু ভোজরাজ উহাকে 'অষ্টদোল' বিশেষরূপ অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ভোজসম্মত শিবিকা এবং অমরোক্ত শিবিকা এক পদার্থ কিনা, তাহা ঠিক বলা যায় না। রামায়ণে মৃত বালীর দেহ বহনোপযোগী শিবিকার যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহাও যেন ভোজবর্ণিত শিবিকা বলিয়াই মনে হয়। যথা—

দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্মভিরাচিত্রাং দ্রুম কর্মবিভূষিতাম্॥

ভদ্রাসনযুক্ত, মনোরম রথের তুল্য শিবিকা আনীত হইয়াছিল। উহা পক্ষীর চিত্রের দ্বারা চিত্রিত, এবং বৃক্ষ-প্রতিকৃতির দ্বারা শোভিত ছিল। অধুনা দৃশ্যমান পাল্কীতেও বৃক্ষ প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়। কিন্তু রথের সহিত উহার কোনরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং রামায়ণের সমসাময়িক শিবিকা অধুনাতন পাল্কী হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই মনে হয়। কারণ ইহাতে ভদ্রাসন সংস্থাপন সম্ভবপর হয় না।

ভোজবর্ণিত শিবিকাতে নবদণ্ড ছত্রের রীত্যনুসারে মণি, কুম্ভ, সুখ প্রভৃতি নিধানের ব্যবস্থা দেখা যায়।[৭] দ্বাদশদোল, ষোড়শদোল, বিংশতিদোল প্রভৃতি যানও নির্মিত হইতে পারে। ভোজের মতে, বিংশতিদোলের পরেও অর্থাৎ চতুর্বিংশতিদোল প্রভৃতি যানও হইতে পারে। ব্যাস বলেন যে, বহুবাহকাদি সমন্বিত যান বহুগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[৮]

প্রদর্শিত চতুর্দোলাদি নির্মাণ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, অতি

৭ মণিকুম্ভ-সুখাদীনাং নিয়মো নবদণ্ডবৎ।

৮ এবং দ্বাদশ-ষোড়শ-বিংশতি দোলাদিকাঃ কার্যাঃ। বিংশতি দোলাৎপরতো ভোজমতে সম্ভবেদ্ যানং। যানং বহুস্কন্ধযোজ্যং বহুগুণমেতজ্জগাদ বৈ ব্যাসঃ॥

পূর্বকালে যান প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য বস্তুতেই জাতিভেদের এবং দেশ-ভেদের চিহ্ন ব্যবহারের আবশ্যকতা বিবেচিত হইয়াছিল। স্থতরাং যানাসন দেখিয়াই কোন্ জাতীয় রাজা এবং কোন্ প্রদেশে তাঁহার বাস তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইত। হিন্দুর যাবতীয় বিষয়েই অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধ; স্থতরাং গ্রহবিশেষের দশাবিশেষে জাত নৃপতিদিগের ভেদসূচক যে চিহ্ন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কেবল শুভাদৃষ্ট দুরদৃষ্টেরই সম্ভাবনা বুঝা যায়। অর্থাৎ নিয়ম প্রতিপালন করিলে শুভাদৃষ্ট পক্ষান্তরে দুরদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

—

নৌকা

মানবজাতির ধরাধামে আবির্ভাবের পর হইতেই নৌকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় জল-প্লাবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরই প্রায় স্বীকার্য এবং নৌকায় চড়িয়া প্রাণিবর্গের আত্মরক্ষার পৌরাণিক বৃত্তান্তও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে। মৎস্যপুরাণে মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া তাহাতে জীবনিবহের রক্ষার ব্যবস্থা মৎস্যরূপী ভগবান্ নিজেই করিয়াছিলেন।[৯] প্রকারান্তরে এই কথাটা বাইবেলেও গৃহীত হইয়াছে। উণাদিক প্রক্রিয়ানুসারে নিষ্পন্ন নৌশব্দও[১০] পদার্থটির প্রাচীনতা ঘোষণা করিতেছে, স্থতরাং উহার প্রাচীনতা স্থাপনের জন্য প্রমাণান্তর প্রদর্শন অনাবশ্যক।

আমরা কেবল ইহার শ্রেণীবিভাগ এবং তদনুযায়ী আকৃতির বিবরণ প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

নৌকা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহা নদ-নদী খাল-বিল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার সাধারণ নাম নৌকা, এবং যাহা সমুদ্রে ব্যবহারের যোগ্য, তাহা মহানৌকা বা পোত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামায়ণে 'মহানৌ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[১১] মার্কণ্ডেয়পুরাণে

৯ যুগান্তবাতাভিহতা যদা ভবতি নৌর্নৃপ।
শৃঙ্গেঽস্মিন্ মম রাজেন্দ্র তদেমাং সংযমিষ্যসি। ১।৩২

১০ নুদ্ প্রেরণে গ্লানুদিভ্যাং ডৌঃ।—উণাদি ২।২৪

১১ প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে। —সুন্দরকাণ্ড ১।১৭৭

মহার্ণবে ব্যবহার্য নৌকা 'পোত' নামে অভিহিত হইয়াছে।[১২] নৈষধকাব্যেও পোতশব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়।[১৩]

দণ্ডীর দশকুমারচরিতে উহা 'প্রবহণ' নামে কথিত হইয়াছে। যাহারা পোতে অর্থাৎ জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্য করে, তাহারা পোতবণিক্ এবং সাংযাত্রিক নামে অভিহিত হইয়াছে।[১৪]

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্বেদোক্ত চারি প্রকার বৃক্ষের কাষ্ঠ নৌকার উপাদান বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত চারি প্রকার কাষ্ঠ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠ লঘু, কোমল ও সুঘট (যাহা সহজে অন্যের সহিত যোড়া লাগে) তাহা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহা দৃঢ়, লঘু ও অঘট (সহজে যোড়া মিলে না) তাহা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহা কোমল অথচ গুরু তাহা বৈশ্য জাতি। এবং যাহা দৃঢ় ও গুরু তাহা শূদ্রজাতি। যদিও কাষ্ঠের চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি নৌকা নির্মাণে ভোজের মতে কেবল ক্ষত্রিয়-জাতি কাষ্ঠ ব্যবহার্য এবং অন্যান্যের মতে লঘু ও সুদৃঢ় কাষ্ঠ ব্যবহার্য।[১৫]

বিভিন্নজাতি কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত নৌকা সুখকর এবং মঙ্গলদায়ক হয় না। উহা জলে ডুবিয়া যায়। অথবা অল্পকালমধ্যে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে ইহাও বুঝা যায়, সেকালে সমুদ্রগামিনী নৌকাকে লৌহের দ্বারা বাঁধানো হইত না, কারণ সমুদ্রস্থিত অয়স্কান্তমণির আকর্ষণে লৌহবদ্ধ নৌকা জলে মগ্ন হইয়া যায়।[১৬]

১২ আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।

১৩ ভবপোত ইবাবলম্বনং বিদিনাকস্মিকসৃষ্টসন্নিধিঃ। —২।৬০

১৪ সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্। —অমরকোষ

১৫ বৃক্ষায়ুর্বেদগদিতা বৃক্ষজাতিশ্চতুর্বিধা।
সমাসেনৈব গদিতং তেষাং কাষ্ঠং চতুর্বিধম্॥
লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্রজাতি তদুচ্যতে॥
লক্ষণ-দ্বয়-যোগেন দ্বিজাতিঃ কাষ্ঠসংগ্রহঃ।
ক্ষত্রিয়-কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদ্ নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈর্বিদধতি জলদুষ্পদে নৌকাম্॥

১৬ বিভিন্নজাতিদ্বয়কাষ্ঠজাতা না শ্রেয়সে নাপি সুখায় নৌকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে বা বিভিদ্যতে বারিণি মজ্জতে চ॥

যুক্তিকল্পতরুর মতে সামান্য ও বিশেষ— নৌকার এই দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহস্ত অর্থাৎ পরিমাণে ব্যবহার্য এক হস্ত দীর্ঘ হইলে তাহার ওসার ও খাড়াই এক হস্তের চতুর্থাংশ, এই অনুপাতে পরিমাণ গ্রহণ করিয়া নৌকা নির্মাণ করিলে 'ক্ষুদ্রা' নামক সামান্য নৌকা হইয়া থাকে।

দেড়হাত দীর্ঘ, তদর্ধ প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশ উচ্চ, এই অনুপাতে পরিমিত নৌকা মধ্যমা নামে অভিহিত। পরিমাপক রাজহস্ত এক এবং দেড় এই ক্রমে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাপক হস্তের অর্ধাংশ হারে বিস্তার ও উন্নতির বৃদ্ধি করিয়া নৌকা প্রস্তুত করিলে যথাক্রমে ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা— এই দশ প্রকার সামান্য নৌকা হয়।

ইহাদের মধ্যে ভীমা, ভয়া ও গর্ভরা এই তিন প্রকার নৌকা অশুভ ফলদায়ক। মন্থরার পূর্বে নির্দিষ্ট যে কয় প্রকার নাম কথিত হইয়াছে, সমুদ্রে সেই সকল নৌকাই যাতায়াত করিতে পারে; অর্থাৎ মন্থরা নৌকা সমুদ্রপথে গমনের অযোগ্য। সাধারণতঃ দৃঢ়তা ও প্রকীর্ণতা (?) ইহাদের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[17] বিশেষ নৌকার দীর্ঘা ও উন্নতা এই দুই প্রকার ভেদ আছে। রাজহস্তদ্বয় দৈর্ঘ্য, তাহার অষ্টমাংশ বিস্তার, এবং দৈর্ঘ্যের দশমাংশ উন্নতি, এই অনুপাতে পরিমাণানুসারে নির্মিত নৌকা দীর্ঘিকা নামে অভিহিত। উহার এক-এক হস্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে দীর্ঘিকা, তরণী, লোলা, গত্বরা,

---

ন সিন্ধু গাহ্যা-(হ্য) র্হতি লৌহবন্ধং
তল্লৌহকান্তৈর্হ্রিয়তে হি লৌহম্।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা
গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ॥

১৭ রাজহস্তমিতায়ামা তৎপাদপরীণাহিনী।
তাবদেবোন্নতা নৌকা ক্ষুদ্রেতি গদিতা বুধৈঃ॥
অতঃ সার্ধমিতায়ামা তদর্ধপরীণাহিনী।
ত্রিভাগেনোত্থিতা নৌকা মধ্যমেতি প্রচক্ষ্যতে॥
ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলা ভয়া।
দীর্ঘা পত্রপুটা চৈব গর্ভরা মন্থরা তথা॥
নৌকাদশকমিত্যুক্তং রাজহস্তৈরনুক্রমম্।
একৈকবৃদ্ধৈঃ সার্ধৈশ্চ বিজানীয়াৎ দ্বয়ং দ্বয়ম্।
উন্নতিশ্চ প্রবীণা চা হস্তাদর্ধাংশসম্মিতা।
অত্র ভীমা ভয়া চৈব গর্ভরা চাশুভপ্রদা।
মন্থরা-পরতো যাস্তু তাসামেবাম্বুধৌ গতিঃ।
তাসাং গুণস্তু সংক্ষেপাৎ দৃঢ়তা চ প্রকীর্ণতা। (!)

গামিনী, তরী, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী— দীর্ঘা নামক বিশেষ নৌকার এই দশ প্রকার নাম হইয়া থাকে। ইহাদের বিস্তার ও উন্নতি যথাক্রমে দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ এবং দশমাংশ। ইহাদের মধ্যে লোলা, গামিনী ও প্লাবিনী নৌকা দুঃখপ্রদা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

লোলার পরিমাণ হইতে গত্বরা পর্যন্ত লোলার মত গুণই বুঝিতে হইবে। বেগিনীর পূর্বে যে নৌকার নাম কথিত হইল, তাহার গুণও বেগিনীর মত শুভপ্রদ। উল্লিখিত নৌকাগুলির নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাদের গতি প্রভৃতির অনেকটা স্বরূপ প্রতিভাত হয়।[18]

ভোজদেব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নৌকার দৈর্ঘ্যের কোনও নিয়ম নাই। ইচ্ছানুসারেই পরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আট, চারি, ও নয় ইহাদের অতিরিক্ত হস্তসংখ্যা গৃহীত হইতে পারে না, অর্থাৎ দশকের পর ৪, ৮ অথবা ৯ থাকিতে পারে। যেমন চৌদ্দহাত, আঠার হাত, উনিশ হাত, চব্বিশ হাত, আঠাশ হাত, ঊনত্রিংশ হাত এইরূপ দৈর্ঘ্য হইতে পারে। পনর, যোল ইত্যাদি হইতে পারে না।

অষ্ট সংখ্যার অধিক হস্তসংখ্যা হইলে নৌকা কুল, বল ও ধন এই কয়টি বিনাশ করে। নব্বইয়ের অধিক ও চল্লিশের কম সংখ্যাও পরিত্যাজ্য। অপর দশক পর্যন্ত এই ফল বুঝিতে হইবে।[19]

---

১৮ দীর্ঘা চৈবোন্নতা চেতি বিশেষে দ্বিবিধা ভিদা।
রাজহস্তদ্বয়ায়ামা অষ্টাংশপরিণাহিনী॥
নৌকেয়ং দীর্ঘিকা নাম দশাঙ্গে (দশাংশে) নোন্নতাপি চ।
দীর্ঘিকা তরণির্লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।
জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধারিণী বেগিনী তথা॥
রাজহস্তৈকৈকবৃদ্ধ্যা নৌকা নামানি বৈ দশ।
উন্নতিঃ পরিণাহশ্চ দশাষ্টাংশমিতৌ ক্রমাৎ॥
অত্র লোলা গামিনী চ প্লাবিনী দুঃখদা ভবেৎ।
লোলায়া মানমারভ্য যাবৎ ভবতি গত্বরা॥
লোলয়াঃ ফলমাধত্তে এবং সর্বাসুনির্ণয়ঃ
বেগিন্যাঃ পরতো যা তু সা শিবায়োত্তরা মতা॥

১৯ নৌকা দীর্ঘং (দৈর্ঘ্য) যথেচ্ছং স্যাত্তত্র তানি বিবর্জয়ে
হস্তসংখ্যা পরিত্যাজ্যা বসুবেদগ্রহোত্তরে।
অষ্টাধিকমিতা নৌকা কুলং হন্তি বলং ধনম্॥
নবতেরূর্ধ্বে যাপি যা চত্বারিংশতঃ পরা॥
এতেন চত্বারিংশত্রিষষ্টি-নবতিসংখ্যা তৎপরতোঽপি
যাবদপরদশকং তাবদেব তৎফলমিতি॥

নৌকার চিত্রণ-কার্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণকর্তৃক স্ব-স্ব জাতির নৌকায় স্বর্ণ, রজত, তাম্র এবং মিলিত তিন ধাতু ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। নৌকার অঙ্কনে চারি, তিন, দুই ও এক শৃঙ্গ ব্যবহারেরও নিয়ম দেখা যায়। এই স্থলে শৃঙ্গ শব্দে শৃঙ্গাকার চিহ্ন অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির নৌকায় যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল রং ব্যবহারের উপদেশ দেখা যায়।[২০]

সূর্যাদিগ্রহের দশায় জাত নৃপতিদিগের নৌকার মুখভাগে, যথাক্রমে সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক ও মনুষ্য, ইহাদের মুখাকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে। এবং অনূপাদি ত্রিবিধ দেশবাসী রাজাদের নৌকায় কলস, দর্পণ ও চন্দ্র এতত্রিতয়ের চিহ্ন স্থাপনের উপদেশ দেখা যায়।[২১] সূর্যাদি গ্রহের দশাজাত রাজাদিগের নৌকার উপরে ক্রমে হংস, ময়ূর, শুক, সিংহ, হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র ও ভ্রমর ইহাদের আকৃতিবিন্যাসের ব্যবস্থা দেখা যায়।[২২] নবদণ্ডের রীত্যনুসারে নৌকাতে মণির বিন্যাস করিতে হয়।[২৩] মুক্তার লহরের দ্বারা ভূষিত নৌকা সর্বতোভদ্রা নামে অভিহিত হয়। নৌকাতে ন্যসনীয় স্বর্ণপ্রভৃতি ধাতুর মালা জয়মালা নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ স্বকীয় নৌকায় দুইটি করিয়া মালা নিহিত করিবেন, এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ এক একটি মালা বিন্যাস করিবেন।[২৪]

—

২০ ধাত্বাদীনা মতো বক্ষ্যে নির্ণয়ং তন্নিসংশ্রয়ম্।
কনকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ঞ্চ যথাক্রমম্॥
ব্রহ্মাদিভিঃ পরিণ্যস্তং নৌকা-চিত্রণ-কর্মণি॥
চতুঃশৃঙ্গা ত্রিশৃঙ্গাবা দ্বিশৃঙ্গা চৈকশৃঙ্গিণী॥
সিত-রক্ত পীত-নীল-বর্ণান্ দদ্যাদ্ যথাক্রমম্॥

২১ কেশরী মহিষো নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্র এব চ।
পক্ষী ভেকো মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকম্॥
নাবাং মুখে পরিণ্যস্তং আদিত্যাদিদশাভুবাম্।
কলসো দর্পণশ্চন্দ্রস্ত্রৈদেশানাং মহীভুজাম্॥

২২ হংসঃ কেকী শুকঃ সিংহো গজোঽহির্ব্যাঘ্র ষট্পদৌ।

২৩ নৌকাসু মণিবিন্যাসো বিজ্ঞেয়ো নবদণ্ডবৎ।

২৪ মুক্তাস্তবকৈর্যুক্তা নৌকা স্যাৎ সর্বতোভদ্রা॥
কনকাদীনাং মালা জয়মালেতি গদ্যতে সদ্ভিঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রে দ্বিতয়ে একৈকে বৈশ্যশূদ্রযোনৌ॥

যে নৌকার উপরে গৃহ অর্থাৎ ছৈ আছে, তাহা সগৃহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই ছাদগুলি সম্পূর্ণ গৃহাকারে সন্নিবেশিত বলিয়াই মনে হয়। নৌকার অবয়ব বিশেষে গৃহের সন্নিবেশানুসারে আবার 'সর্বমন্দিরা', 'মধ্যমন্দিরা' ও 'অগ্রমন্দিরা' এই তিন প্রকার সংজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে নৌকার সমস্তাংশ ব্যাপক গৃহ সন্নিবেশিত হয়, তাহার নাম সর্বমন্দিরা, যাহার মধ্যভাগে গৃহ থাকে তাহার নাম মধ্যমন্দিরা এবং যাহার কেবল অগ্রভাগেই গৃহ থাকে তাহার নাম অগ্রমন্দিরা। ইহাদের মধ্যে সর্ব-মন্দিরা নৌকায় রাজার ধন, অশ্ব ও রমণীদিগের গমনাগমনের ব্যবস্থা দেখা যায়। মধ্যমন্দিরা নৌকা রাজাদিগের বিলাস প্রভৃতির উপকরণরূপে এবং বর্ষাকালে ব্যবহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অগ্রমন্দিরা নৌকা চিরপ্রবাসে যুদ্ধকার্যে এবং বর্ষার অবসানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।[২৫]

নৌকার গৃহ কাষ্ঠজ ও ধাতুজ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাষ্ঠজ-গৃহ সুখসম্পত্তিপ্রদ ও ধাতুজ-গৃহ বিলাসোপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[২৬] গ্রন্থকারের উক্তি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, নৌকাস্থ গৃহমধ্যে শয্যা, আসন, চাঁদোয়া প্রভৃতির সমাবেশ ও শয্যাসনাদি প্রকরণোক্ত নিয়মই প্রতিপালিত হইত, এবং সাধারণতঃ নৌকার যে কিছু লক্ষণ কথিত হইল, উহা কেবল প্রধান নৌকার পক্ষেই বুঝিতে হইবে।[২৭] সুতরাং সাধারণ

২৫ নির্গৃহং সগৃহং বাথ তৎ সর্বং দ্বিবিধং ভবেৎ।
নির্গৃহং পূর্বমুদ্দিষ্টং সগৃহাণি যথা শৃণু॥
সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্বমধ্যাগ্রমন্দিরা।
সর্বতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া সর্বমন্দিরা॥
রাজ্ঞাং কোশাশ্বনারীণাং যানমত্র প্রশস্যতে।
মধ্যতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া মধ্যমন্দিরা॥
রাজ্ঞাং বিলাস-যাত্রাদি বর্ষাসু চ প্রশস্যতে॥
অগ্রতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া অগ্রমন্দিরা।
চিরপ্রবাস-যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাত্যয়ে॥

২৬ কাষ্ঠজং ধাতুজঞ্চেতি মন্দিরং দ্বিবিধং ভবেৎ।
কাষ্ঠজং সুখসম্পত্ত্যৈ বিলাসে ধাতুজং মতম্॥
অত্র শয্যাসনাদীনাং মঃরোল্লোচয়োরপি।
অন্যেষাঞ্চৈব মুনিভির্নির্ণয়ঃ পূর্ববন্মতঃ॥

২৭ দিঙ্মাত্রমিদমুদ্দিষ্টং নৌকালক্ষণমগ্রজম্।
প্রধানেষ্বেব নিয়মা অপ্রধানে ন নির্ণয়ঃ।

নৌকার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থান্তরে নিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ লঘুতা, শীঘ্রগামিতা, অছিদ্রতা ও সমতা— এই কয়টি নৌকার গুণ বিবেচিত হইয়াছে।[২৮] যুক্তিকল্পতরুতে নৌকাকে যুদ্ধের উপকরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণে এবং অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে সেনাঙ্গ শ্রেণীতে হস্তী অশ্ব, রথ ও পদাতিই পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতায় নৌকা যুদ্ধোপকরণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিয়াছেন যে, সমভূমিতে রথ ও অশ্ব এই উভয়ের দ্বারা যুদ্ধ করিবে, এবং অনূপে অর্থাৎ জলবহুল দেশে নৌকার দ্বারা এবং হস্তীর দ্বারা যুদ্ধ করিবে।[২৯] যদিও সাধারণত অনূপদেশ মাত্রেই নৌকার দ্বারা এবং হস্তীর দ্বারা যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি অল্পজলে হস্তিযুদ্ধ এবং অগাধ জলে নৌযুদ্ধ, এমত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার মেধাতিথি এই সমীচীন মত প্রকাশ করিয়াছেন। জলবহুল বঙ্গদেশেই মনূপদেশের এবং যুক্তিকল্পতরুর উক্তির সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মপালের তাম্রশাসনে চতুরঙ্গ সেনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথমেই নৌবাটকের সমুল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধার্থ ব্যূহাকারে সজ্জিত নৌকাশ্রেণীই 'নৌবাটক' নামে অভিহিত হইয়াছে (গৌড়-লেখমালা, ১৪ পৃ. দ্রষ্টব্য)। মহাকবি কালিদাসের লেখনীও বঙ্গদেশকেই নৌ-যুদ্ধের লীলাক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।[৩০] মহাভারতে 'যন্ত্রচালিত' নৌকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিদুর কর্তৃক প্রেরিত মানব পার্থদিগকে ক্ষিপ্রগামিনী 'যন্ত্রযুক্তা', পতাকান্বিতা ও 'সর্ববাতসহা' নৌকা দেখাইয়াছিল।[৩১]

শব্দকল্পদ্রুমে এবং তাহার পরবর্তী অভিধানে উক্ত 'যন্ত্রযুক্তা' নৌকা ইদানীন্তন ষ্টীমার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে : 'এতেন যন্ত্রবাহিতা নৌকা প্রতীয়তে। কলের নৌকা ইষ্টিম্বোট্ ইতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ।' আমরা কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ অধুনা অনেক যন্ত্র ষ্টীমের সাহায্যে পরিচালিত হয় দেখিয়া, প্রাচীনকালেও যন্ত্র মাত্রই ষ্টীমের সাহায্যে পরিচালিত

২৮ লঘুতা দৃঢ়তা চৈব গামিতাঽচ্ছিদ্রতা তথা।
সমতেতি গুণোদ্দেশো নৌকানাং সংপ্রকাশিতঃ॥

২৯ স্যন্দনাশ্বৈঃ সমেযুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।—৭।১৯২

৩০ বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ।—৪।৩৬

৩১ ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুত-গামিনীং॥
সর্ববাত সহাং নাবাং যন্ত্রযুক্তাংপতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্॥—মহাভারত ১।১১।৪।৫

হইত, এই কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন। পূর্বকালেও নানাকার্যের উপযোগী প্রভৃত যন্ত্রের উল্লেখ সাহিত্যে দেখা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে সেতুবন্ধন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বিপুল মহাবল বানরগণ হাতীর মত প্রকাণ্ড পাষাণগুলিকে, এবং পর্বতগুলিকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে বহন করিয়াছিল।[৩২] রামায়ণের স্থানান্তরেও যন্ত্রবর্ণনার অভাব নাই। কিন্তু ষ্টীমের সাহায্যে যন্ত্র পরিচালনের আভাস কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সুতরাং মহাভারত বর্ণিত এই যন্ত্র বায়ুকে নিজের অভিপ্রায়ানুসারে তাহার প্রতিকূল দিকেও চালাইবার কল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বর্ণিত নৌকার 'সর্ববাতসহা' এই বিশেষণটিও আমাদের ব্যাখ্যার সহায়তা করিতেছে। কারণ, যাহা সর্বপ্রকার বায়ুর বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় তাহাই 'সর্ববাতসহা' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বায়ুর আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়া তাৎপর্য নহে। তাহা নৌকা মাত্রের সাধারণ গুণ দৃঢ়তার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

—

নৌকা-বিমান

রঘুবংশকাব্যে কুশের জল-বিহার বর্ণন প্রসঙ্গে 'নৌবিমানের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি লিখিয়াছেন যে সেই কুশ 'নৌবিমান' হইতে অবতরণ করিয়া পূর্বোক্ত রমণীদিগের সহিত সরযূ নদীর জলমধ্যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। 'স নৌবিমানাদবতীর্য রেমে বিলোলহারঃ সহতাভিরপ্সু'। 'নৌবিমান' শব্দের অর্থ নির্দেশ করিতে যাইয়া টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন (১৬।৬৮) যে, 'নৌর্বিমানমিব' অর্থাৎ নৌকাখানা বিমানের তুল্য। প্রসিদ্ধ পদার্থই উপমানরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তাৎকালিক প্রসিদ্ধ বিমানই উপমানরূপে কবি কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে। অভিধানে এবং কাব্যাদি গ্রন্থে আমরা দুই প্রকার বিমানের পরিচয় পাই। তন্মধ্যে একটি দেবযান ব্যোমযান প্রভৃতি নামে অভিহিত, অপরটি সপ্তভূমিক ভবন অর্থাৎ সাততলা দালান। আধুনিক বিজ্ঞান ব্যোমযান বিমানকে সম্প্রতি সাধারণের পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু সাততলা দালানরূপ বিমান কেবল সাহিত্যসেবীর নিকটই নামতঃ পরিচিত। সুতরাং

৩২ হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ।—যুদ্ধকাণ্ড ২২।৫৬

কুশের জলবিহার নৌকা কোন্ বিমানের সহিত তুলনা প্রাপ্ত হইয়াছে, কবির অভিপ্রায় কি, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু কবির সময়ে জল-বিহার নৌকা বিমানের ফ্যাশানে প্রস্তুত হইত, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যদি সাততলা দালানই অত্রত্য বিমান শব্দের অর্থ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বিহার-নৌকাতে উপর্যুপরি সাতটি তলা ছিল, এবং উহাতে নানাপ্রকার চিত্রও সন্নিবেশিত ছিল। কারণ কালিদাসই উত্তর মেঘদূতে সপ্তভূমিক ভবন বিমানে চিত্রবিন্যাসের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

নেত্রানীতা সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং স্বজল-কণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।

পক্ষান্তরে যদি ব্যোমযান বিমানই নৌকার উপমানরূপে অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবেও ফলতঃ বেশি তফাৎ হইবে না। কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেবহূতির অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, মহর্ষি কর্দম কর্তৃক যোগবল-নির্মিত কামচারী বিমানের যে বর্ণনা দেখা যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সপ্তভূমিক ভবনেও ব্যোমযান বিমানের অবয়বগত সৌসাদৃশ্যের অভাব নাই। সপ্তভূমিক ভবনে যেমন এক তলার উপরে অপর তলার সন্নিবেশ, আকাশযান বিমানেও তেমনি উপর্যুপরি গৃহ-সন্নিবেশ এবং তন্মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ খাটে নানাপ্রকার শয্যা, পাখা এবং বিবিধ প্রকারের আসন বিন্যস্ত।

উপর্যুপরি বিন্যস্ত-নিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্
কৢপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্যঙ্ক-ব্যজনাসনৈঃ ॥৩।২৩।১৬

ইহাতেও বিহারস্থান (ক্রীড়াপ্রদেশ), বিশ্রামস্থান (শয়নগৃহ), উপভোগ-স্থান, প্রাঙ্গণ ও চত্বরের সমাবেশ আছে—

বিহারস্থান-বিশ্রাম-সংবেশ-প্রাঙ্গণাজিরৈঃ।৩।২৩।২১

ইহার মধ্যেও শোভা সম্পাদনার্থ নানাপ্রকার শিল্পের সমাবেশ, কতকস্থান মহামরকত মণির দ্বারা বাঁধানো, তাহাতে আবার প্রবালের বেদি। দ্বারদেশে প্রবালের দেহলী অর্থাৎ রক্। হীরকনির্মিত কপাট, ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত শিখর-ভাগে, সোনার কলস সন্নিবিষ্ট, স্বর্ণময় ভিত্তিতে বিচিত্র পদ্মরাগমণির সন্নিবেশ, স্বর্ণময় তোরণে হারের বিন্যাস, বিচিত্রবর্ণ বিতানেরও অভাব নাই। বিতানের অগ্রভাগে সন্নিবিষ্ট কৃত্রিম হংস পারাবতকে বাস্তবিক মনে করিয়া, হংস পারাবতগুলি তাহাদের কাছে যাইয়া, স্বজাতিসুলভ শব্দ করিয়া থাকে। (—৯।২৩।১৭-২০)।

সুতরাং দ্বিবিধ বিমানই নৌকার উপমান হইবার যোগ্য। অতএব নৌবিমান যে সাততলা জাহাজের ফ্যাশানে প্রস্তুত হইত, এবং তাহাতে বিলাসোপযোগী শয্যাসন প্রভৃতির বিন্যাস থাকিত, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

—

বজ্রলেপ

সংস্কৃত সাহিত্যে বজ্রলেপের নাম অতি সুপরিচিত। বজ্রলেপ শব্দটা শুনিলেই আপাতত যেন একটা দৃঢ়তর পদার্থের কথা মনে উদিত হয়। যদিও বজ্রের স্বরূপ কি, তাহা সকলের নিকটই অপরিচিত, অর্থাৎ বজ্রের স্বরূপদর্শী বর্তমান সময়ে কেহই নাই, তথাপি কোন একটা দৃঢ় পদার্থের তুলনা করিতে হইলে, সকলেই প্রায় বলিতে অভ্যস্ত যে, উহা বজ্রের মত শক্ত। বজ্রমুষ্টি ইত্যাদি শব্দও বজ্রের দৃঢ়তাই প্রকাশ করিয়া থাকে। বজ্রের মত অবিনশ্বর লেপ বজ্রলেপ শব্দের যৌগিক অর্থ বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির উত্তররাম-চরিত নাটকে সীতার মুখে অনেক বার বজ্রলেপ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ধর্ম-শাস্ত্রেও উহার অবিনশ্বরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বারাণসীতে কৃত পাপ বজ্রলেপের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।[১] অবশ্য সাহিত্যের এবং স্মৃতির বর্তমান পঠনপাঠন প্রণালীতে বজ্রলেপের স্বরূপোদ্ঘাটনের জন্য ছাত্র অধ্যাপক কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। কারণ, পরীক্ষা দিয়া দলিল হস্তগত করিতে পারিলেই ছাত্র কৃতার্থ এবং অধ্যাপকও পুরস্কৃত হন। পরীক্ষক মহোদয়গণ বজ্রলেপ-টেপের খবরও রাখেন না ; প্রশ্নেও এ সমস্ত কথার প্রসঙ্গ থাকে না, সুতরাং বজ্রলেপ নিত্যসিদ্ধ প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর কৌতূহল-নিবৃত্তির পক্ষে শিল্প-সংসৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় একান্তই প্রয়োজন। অতএব আমরা উহার স্বরূপ নির্ণয়ের যথাযোগ্য চেষ্টা করিব।

খ্যাতনাম বরাহমিহির তাঁহার গ্রন্থে চারি প্রকার বজ্রলেপের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম বজ্রলেপের উপাদান কাঁচা তিন্দুক (গাব) ফল, কাঁচা কদবেল, শিমুল ফুল, শল্লকী বৃক্ষের বীজ, ধন্বন্ বৃক্ষের ছাল, এবং বচ। এই সমস্ত পদার্থ সমভাগে গ্রহণ করিয়া এক দ্রোণ পরিমিত জলে ক্বাথ করিতে হইবে। অনন্তর অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথ নামাইয়া তাহাতে শ্রীবাসক (প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্যাস) রস, (বোল) গুগ্গুল, ভেলাগোটা, কুন্দুরুক, ধুনা, অতসী (মসীনা) এবং বেল, এই সকল পদার্থের কল্ক মিশ্রিত করিবে। অনন্তর এই পদার্থ তপ্ত অবস্থায় প্রাসাদ (দেবালয় বা রাজভবন) (হর্ম্য) (ধনীদিগের দালান) বলভি

১ বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি।—পুরাণ।

(বারেন্দা বিশেষ), শিবলিঙ্গ, প্রতিমা, ঘরের মেজে ও কূপ (ইন্দারা)— এইসকলের উপরে ঢালিয়া দিবে। এই লেপ কোটি বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।[২]

দ্বিতীয় বজ্রলেপ— লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগুল, কদবেল, বেলের মধ্যভাগ, নাগফল, নিম্বফল ,গাব, মদনফল, মৌয়াফল, মঞ্জিষ্ঠা, ধুনা, রস ও আমলা, এইসকল পদার্থের দ্বারা পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বজ্রলেপ প্রস্তুত করিলে পূর্বোক্তের মত গুণশালী হয়।[৩]

তৃতীয় বজ্রলেপ— ইহার উপাদান গোশৃঙ্গ, মহিষশৃঙ্গ ও ছাগশৃঙ্গ, গাধার লোম, মহিষচর্ম, গোচর্ম, নিম্ব, কদবেল ও রস, ইহাদের দ্বারা কল্ক প্রস্তুত করিয়া পূর্বোক্ত রীত্যনুসারে জল দ্রোণে অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথ করিলে, বজ্রতল নামক বজ্রলেপ প্রস্তুত হয়। উহারও গুণ পূর্বের মত।[৪]

চতুর্থ বজ্রলেপের উপাদান, আটভাগ সীস, কাঁসা দুই ভাগ, ও একভাগ পিত্তল। এই সমস্ত পদার্থ একত্র গালাইয়া তরল করিলে বজ্র-সংঘাত নামক বজ্রলেপ প্রস্তুত হয়। উহারও গুণ পূর্বোক্ত বজ্রলেপেরই তুল্য।[৫]

বরাহমিহিরের উক্তি হইতে কেবল উপাদানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গো-মহিষাদির শৃঙ্গ লোম প্রভৃতি কি প্রণালীতে গালাইয়া তরল করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের সাহায্য হয় না। কিন্তু এই সমস্ত পদার্থ যে গালাইয়া লেপের উপযোগী করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ময়-কথিত

২ আমং তিন্দুকমামং কপিত্থকং পুষ্পমপিচ শাল্মল্যাঃ।
বীজানি শল্লকীনাং ধন্বনবল্কো বচা চেতি ॥ ১
এতৈঃ সলিলদ্রোণঃ ক্বাথয়িতব্যোষ্টভাগ-শেষশ্চ।
অবতার্যোঽস্যচ কল্কো দ্রব্যৈরেতৈঃ সমনুযোজ্যঃ ॥২
শ্রীবাসক-রস-গুগ্গুলু-ভল্লাতক-কুন্দুরুক-সর্জরসৈঃ।
অতসী-বিল্বৈশ্চযুতঃ কল্কোঽয়ং বজ্রলেপাখ্যঃ ॥ ৩
প্রাসাদ-হর্ম্যবলভীলিঙ্গ-প্রতিমাসু কুড্যকূপেষু।
সন্তপ্তো দাতব্যো বর্ষসহস্রাযুতস্থায়ী ॥ ৪

৩ লাক্ষা-কুন্দুরু-গুগ্গুলু-গৃহধূম-কপিত্থ-বিল্বমধ্যানি।
নাগফল-নিম্ব-তিন্দুক-মদনফল-মধূক-মঞ্জিষ্ঠাঃ ॥ ৫
সর্জরস-রসামলকানি চেতি কল্কঃ কৃতো দ্বিতীয়োঽয়ম্।
বজ্রাখ্যঃ প্রথমগুণৈরয়মপি তেষ্বেব কার্যেষু ॥ ৫

৪ গোমহিষাজবিষাণৈঃ খরলোম্না মহিষচর্ম গব্যৈশ্চ।
নিম্ব কপিত্থরসৈঃ সহ বজ্রতলো কল্কোঽন্যঃ ॥৭

৫ অষ্টৌ সীসকভাগাঃ কাংসস্যদ্বৌতু রীতিকাভাগঃ।
ময়কথিতো যোগোঽয়ং বিজ্ঞেয়ো বজ্রসঙ্ঘাতঃ ॥৮—বৃহৎসংহিতা

বজ্রলেপের উপাদান কেবলই ধাতুপদার্থ। উহাদিগকেই বা কিসের দ্বারা গালাইয়া কিভাবে লেপের উপযুক্ত করিতে হয়, তাহাও কথিত হয় নাই।

বহু শতাব্দীর পূর্ববর্তী যে সমস্ত প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি বর্তমান সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে নিহিত বজ্রলেপ, বরাহমিহির বর্ণিত লেপের স্থায়িত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে মাত্র। কিন্তু কি উপাদানে কি রীতিতে উহা প্রস্তুত হইত তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আধুনিক রসায়নবিদ্যায় নিষ্ণাত বিশ্লেষণ-পটু মনীষিগণ চেষ্টা করিলে সম্ভবত অনেকটা তথ্য বাহির করিতে পারেন। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের উপদেষ্টা বহু আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্যের বাহুল্য সত্ত্বেও মোটামুটি উহা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বিশ্বকর্মা, অপরটির প্রবর্তক ময়। বিশ্বকর্মা দেব-শিল্পীরূপে এবং ময় অসুর-শিল্পীরূপে পরিচিত। বরাহমিহিরের গ্রন্থে উভয় মতই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বকর্মা-মতেরই আধিক্য লক্ষিত হয়।

—

খাদ্য শিল্প

পূর্বকালে বড় বড় ভোজে ব্যবহার্য নৈপুণ্যোদ্ভাবিত খাদ্য-বিশেষ 'খাদ্যশিল্প' নামে অভিহিত হইতে পারে, অতএব আমরা এই শ্রেণীর শিল্পকে 'খাদ্যশিল্প' নামেই নির্দেশ করিলাম। নৈষধকাব্যে নলরাজার বিবাহের বরযাত্রিকদিগের জন্য বিদর্ভদেশে যে সকল আশ্চর্য খাদ্য নির্মাণের বর্ণনা দেখা যায়, তাহা হইতে কয়টি বিশিষ্ট শিল্পের প্রদর্শন করিয়া, আমরা এই প্রসঙ্গের সমাপন করিব। অবশ্য কবির বর্ণনার দ্বারা সত্যযুগের সভ্যতার বা শিল্পনিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাতে কবির সমসাময়িক রীতিনীতির এবং শিল্পকলা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাকবি শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জ এবং গৌড় এই উভয় দেশের রাজদরবারের সহিত বিশেষ রূপে সম্বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বর্ণনায় কান্যকুব্জীয় এবং গৌড়ীয় সভ্যতার যে নিদর্শন আছে, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। বিবাহ-কালীন দময়ন্তীর হস্তে মাঙ্গলিক শঙ্খ-বলয়-ধারণের বর্ণনা দেখিয়া, টীকাকার নারায়ন উহাকে গৌড়ের আচার বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

বিরেজতুর্মাঙ্গলিকেন সঙ্গতৌ ভুজৌ সুদত্যা বলয়েন কম্বুনঃ।

গৌড়দেশে বিবাহকালে শঙ্খবলয়ধারণমাচারঃ।১০।৪৫

বরযাত্রিকদিগের ভোজনবর্ণনা হইতে জানা যায় যে—তাঁহাদের জন্য শিল্পিগণ এমন কৌশলে কতকগুলি খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়াছিল, যাহাদের আস্বাদনসময়ে ভোক্তাদিগের আকালিক বস্তু বলিয়া অর্থাৎ অন্য ঋতুর ফল শাক প্রভৃতি মনে করায় বিস্ময় হইয়াছিল। কবির উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, অনেক প্রকার পদার্থের সংযোজনের দ্বারা এবং উপাদানগুলির উত্তমরূপে কর্তনের এবং পেষণের দ্বারা আকালিক তত্তৎ বস্তুর অনুরূপ শাক ফল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিভাত হয় যে, তত্তৎ বস্তুর উপাদানের সংযোজন এবং বিশ্লেষণ বিষয়ে সেকালের শিল্পীদিগের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

অনেক সংযোজনয়া তথাকৃতে-
র্নিকৃত্য নিষ্পিষ্য চ তাদৃগর্জনাৎ।
অমীকৃতাকালিকবস্তুবিস্ময়ং
জনা বহুব্যঞ্জনমভ্যবাহরন্ ॥১৬।৮৩

সূপকার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পাচকবর্গের উদ্‌ভাবিত বিচিত্র ভোজ্যবস্তু খাইয়া, বরযাত্রিকগণ নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ— তাঁহারা পাচকদিগের শিল্প-রহস্যোদ্ঘাটনে অসামর্থ্য বশতঃ নিরামিষ খাদ্যকে আমিষ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে আমিষগুলিকে নিরামিষ মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং তদনুরূপ অভিমত প্রকাশ করার ফলে, তাঁহাদিগকে পরিবেশকবর্গের উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল।—

যথামিষে জগ্মুরনামিষ ভ্রমং
নিরামিষে চামিষমোহমূহিরে।
তথা বিদগ্ধৈঃ পরিকর্মনির্মিতং
বিচিত্রমেতে পরিহস্য ভোজিতাঃ ॥১৬।৮১

এমন কি, বর্তমান নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রীষ্মকালীন ভোজনের অঙ্গ রূপে যেমন বরফ পানের ব্যবহার দেখা যায়, তেমনই নলরাজার বিবাহে বরযাত্রিকদিগের বৃহৎ ভোজেও বরফ দানের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু ইদানীন্তন বরফের তুলনায় তদানীন্তন বরফের নিরতিশয় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ— আধুনিক বরফ গন্ধহীন, সে কালের বরফ কর্পূর-সৌরভ-ভূয়িষ্ঠ। আধুনিক বরফ চাকা চাকা, সেকালের বরফ গোলাকার।

ঘনৈরমীষাং পরিবেষকৈর্জনৈ-
রবর্ষি বর্ষোপলগোলকাবলী।
চলদ্‌ভুজা-ভূষণরত্ন-রোচিষা
ধৃতেন্দ্রচাপৈঃ শ্রিতচান্দ্রসৌরভা।

অত্রত্য 'বর্ষোপল-গোলকাবলী' শব্দে কৃত্রিম করকা অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ অত্রত্য ভোজ্যবস্তুর বর্ণনায় অনেক স্থলেই কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু ফল মূল শাক প্রভৃতির নকল করার তুলনায় করকার নকল অধিকতর কৌশলের পরিচায়ক নহে। কিন্তু টীকাকার নারায়ণ 'বর্ষোপল-গোলকাবলী'র অর্থ লিখিয়াছেন— করকাতুল্য এলাকর্পূর-শর্করা-লবঙ্গ-তণ্ডুল-পিষ্টক-রচিত অতি গোলাকার লড্ডুক-বিশেষ।

বর্ষোপলাঃ করকাস্তত্তুল্যানামেলাকর্পূরশর্করা-লবঙ্গ-তণ্ডুল-পিষ্ট-
রচিতানাং গোলকানামতীবৃত্তানাং লড্ডুক-বিশেষাণাম্।

'বর্ষোপল-গোলকাবলী' শব্দে তত্তুল্য লড্ডুক বুঝাইবার পক্ষে সাধক কিছুই দেখা যায় না; বিশেষতঃ 'শ্রিতচান্দ্র-সৌরভা' এই বিশেষণের দ্বারা চন্দ্রশব্দ-

প্রতিপাদ্য কর্পূরের সৌরভযুক্তরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। জলে কর্পূর-সৌরভের উপাদেয়তা সভ্যজনসুপরিচিত, পক্ষান্তরে লড্ডুকে কর্পূর-বাসনা প্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে মনে হয়, কবি রাজদরবারে থাকিয়া রাজভোগ্য যে সমস্ত অনন্যসুলভ বস্তুর সহিত পরিচিত ছিলেন, টীকাকারের পক্ষে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, লড্ডুকপ্রিয় সমাজের সহিত হয়ত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল; তাহারই ফলে প্রস্তাবিত স্থলে তিনি লড্ডুকের কল্পনা করিয়াছেন। কবির বর্ণনায় বিশিষ্ট ভোজে আমিষের বাহুল্য এবং তাহার পাকক্রিয়ার প্রভূত ভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

অরাধি যন্মীন-মৃগাজপত্রিজৈঃ
পলৈর্মৃদুস্বাদসুগন্ধি-তেমনং।
অশাকিলোকৈঃ কুতএব জেমিতুং
ন তত্তু সংখ্যাতুমপি স্ম শক্যতে ॥৫৫।৮৭

ইহার অর্থ— নানাপ্রকার মৎস্য হরিণ ছাগ ও পক্ষীর মাংসের দ্বারা সূক্ষ্ম সুস্বাদ এবং সুগন্ধি এত অধিক রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে, লোকে তাহা খাইয়া শেষ করা ত দূরের কথা, কেহ তাহার সংখ্যা করিতেও সমর্থ হয় নাই। এস্থলে মৎস্য-মাংস পাকের বাহুল্য এবং পারিপাট্য বর্ণনায় কবির গৌড়ীয়তা অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উপসংহারে পাঠক মহোদয়দিগের নিকট নিবেদন এই যে, এ পর্যন্ত আমরা প্রাচীন শিল্প-পরিচয়ে শুষ্ক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা কালক্ষেপ করিয়াছি। অধুনা দময়ন্তীর বিবাহভোজের গৌড়প্রিয় অপূর্ব সুপক্ব মৎস্য-মাংসের এবং কৃত্রিম ফলমূলের রসাস্বাদ করিয়া, মনোমুগ্ধকর তাম্বূলচর্বণের দ্বারা মুখশুদ্ধির পর চলুন বিশ্রাম করি। সাবধান, মসলানির্মিত নকল বিছার ভয়ে কেহ বিচলিত হইয়া সাধারণের উপহাসাস্পদ হইবেন না।[১]

---

১ মুখেনিধায় ক্রমুকং নলানুগৈ-
রথো পর্ণালিরবেক্ষ্য বৃশ্চিকম্।
দমার্পিতান্ত-মুখবাস-নির্মিতং
ভয়াবিলৈঃ স্বভ্রম-হাসিতাখিলৈঃ ॥—৫৫।৫৫

অর্থ— বরযাত্রিকগণ দময়ন্তী সহোদর-প্রদত্ত তাম্বূল মুখে অর্পণ করিয়া, তাহাতে হঠাৎ কর্পূর কস্তূরী খদিরসার প্রভৃতি নির্মিত বৃশ্চিক দেখিয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, তাড়াতাড়ি তাম্বূল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিয়াছিল।